মনে ছিল আশা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—আড়াই টাকা—

তৃতীয় সংস্করণ

১৯৪৬

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং পি, বি, প্রেস
১৮, মার্কুইস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীচণ্ডীচরণ সেন কর্ত্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস

করকমলেষু—

মনে ছিল আশা

১

বর্তমানকালের সামান্য একটু সুযোগের অভাবে আগামীকালের অনেকখানি সুবিধা মানুষের হাতছাড়া হইয়া যায়, ইহা মানব-জীবনের অতি সাধারণ ঘটনা। ঠিক এমনই একটা বিয়োগান্ত ব্যাপার ঘটিয়া গেল অমলের জীবনে, যেদিন দেশ হইতে একটা টেলিগ্রাম আসিয়া পৌঁছিল। টেলিগ্রামটি খুব সংক্ষিপ্ত, কারণ শব্দের নির্দিষ্ট সংখ্যাকে লঙ্ঘন না করিবার একটা অদম্য চেষ্টা তাহার মধ্যে ছিল, সুতরাং 'অন্নদা মরিতেছে। এস।' এইটুকু ছাড়া তাহার ভিতর হইতে আর কোন সংবাদই সংগ্রহ করা গেল না।

কিন্তু ওইটুকু সংবাদই যথেষ্ট। অন্নদা অমলের মাসী, ছেলেবেলায় তিনিই অমলকে মানুষ করিয়াছিলেন। স্নেহও যথেষ্ট করেন। তাহার মাসতুতো ভাই-এরা যে টেলিগ্রামের কয়েক আনা পয়সা খরচা করিয়াছেন, তাহা ও-পক্ষের অনেকখানি তাড়াতেই ; এবং হয়ত শেষ সময়ে উপস্থিত হইতে পারিলে কিছু পাওয়াও যাইত। কিন্তু অমল ভাবিয়া দেখিল, দেশে পৌঁছিতে গেলে দু'টাকা এগার আনা শুধু ট্রেন ভাড়াই লাগে, তাহা ছাড়া আরও অন্তত দুই-চারি আনা সঙ্গে থাকা প্রয়োজন। সে জায়গায় আছে তাহার কাছে মাত্র সতেরটি পয়সা। সুতরাং মাসীর আশা সে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত ত্যাগ করিল।

আর যাহাই হউক, অমলের অবস্থাটা ঠিক ঈর্ষার বস্তু নয়। দেশের কথা ভাবা সে ছাড়িয়া দিয়াছে, কারণ সেখানে ফিরিবার আর পথ নাই। বাবা আছেন,

মাও আছেন এবং সাধারণ বাঙালীর সংসারের মত ভাই-বোনেরও অভাব নাই। কিন্তু অভাব একটা বড় রকমের আছে, সেটা অবশ্য বলাই বাহুল্য, টাকার। বাবা গ্রামের 'মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের' তৃতীয় শিক্ষক। মাহিনা ত্রিশ বৎসরে বাইশে পৌঁছিয়াছে, অবশ্য সই করিতে হয় ত্রিশ টাকার রসিদে। জমি-জায়গা যৎসামান্য আছে, তাহার ব্যয় আয়ের অপেক্ষা বিশেষ কম নয়। সুতরাং ম্যাট্রিক পাস করার পরই অমলের বাবা যদি তাহার জন্য উক্ত 'মধ্য ইংরেজী'তেই আর একটি মাষ্টারির ব্যবস্থা করেন তো অন্যায় কিছু হয় না; বরং ভবিষ্যতের দিকে চাহিলে, ভবিষ্যৎ কেন সেটা তাহার বর্তমানই, খুব ভাল ব্যবস্থা। হয়তো এতদিনে অমল বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়া বসিতে পারিত, হয়তো বা ছেলেমেয়ের দোহাই দিয়া সেক্রেটারিবাবুকে ধরিয়া পড়িলে তাহার কুড়ি টাকা মাহিনা বাড়িয়া একুশ টাকাও হইয়া যাইত।

কিন্তু অমলের এ ব্যবস্থা ভাল লাগে নাই, যেমন ভাল কথা অনেকেরই ভাল লাগে না। তাই সে একদা বাপের অতিকষ্টে জমানো টাকার মধ্য হইতে তিয়াত্তরটি টাকা মাত্র সম্বল করিয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিল। তিয়াত্তরটি টাকা অবশ্য তিয়াত্তর পয়সায় পৌঁছিতে অনেকখানি সময় লাগে নাই, কিন্তু অমলের অদৃষ্টক্রমে দশ টাকা মাহিনার একটি টুইশন ইতিমধ্যেই সে পাইয়াছিল। পাঁচটি ছেলেমেয়ে, সকালে ঘণ্টা-দুই করিয়া পড়াইতে হয়।

তারপর বিস্তর চেষ্টা করিয়াও সে আর একটি কাজও জুটাইতে পারে নাই। টুইশন করিয়া পড়াশুনা করিবার আশা তো সে অনেককালই ছাড়িয়া দিয়াছে, এখন ভাত জুটাইবার আশাও ছাড়া ভিন্ন উপায় নাই।

ইতিমধ্যে পূর্বেকার মেসের অনেকগুলি টাকা বাকী পড়ায় সে মেস ছাড়িতে অমল বাধ্য হইয়াছে। এবারে বুদ্ধির কাজ করিয়া সুদ্ধ চার টাকা দিয়া একটি সীট ভাড়া লইয়াছিল, আহারাদি দুই পয়সার ভাত, একপয়সার দাল হিসাবে নগদ হোটেলেই সারিত। কিন্তু তাহাতে গ্রাস চলিলেও আচ্ছাদন চলে না, অথচ আচ্ছাদনটাও প্রয়োজন। সুতরাং একখানা কাপড়, একটা জামা ও

একজোড়া চটি কিনিতেই হইল, আর তাহাতে খরচও পড়িল প্রায় চার টাকা। ফলে এ মাসে সীটরেণ্ট বাবদ ম্যানেজারকে সে এক টাকার বেশী আর দিয়া উঠিতে পারে নাই। মেসের ম্যানেজার প্রকারান্তরে সীট ছাড়িয়া দিতেই বলিয়াছেন, কিন্তু উপায় নাই বলিয়াই সে চোখ-কান বুজিয়া পড়িয়া আছে, বাঁকা কথার সরল অর্থ বুঝিবার চেষ্টা মাত্র করিতেছে না।

আরও একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে অমল টেলিগ্রামের কাগজখানা গুটি পাকাইয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া অত্যন্ত ময়লা বিছানাটাতেই শুইয়া পড়িল। সাবানের অভাবে বিছানাটা বহুকাল পরিষ্কার হয় নাই, অথচ সেটা এতই ময়লা হইয়াছে যে, পাশের সীটের ভদ্রলোকটি তাহার দিকে চাহিলেই অমলের মনে হইত যে বিশেষ করিয়া তিনি তাহার বিছানাটার দিকেই চাহিতেছেন। সতেরটা পয়সা আজও হাতে আছে সত্য, কিন্তু মাহিনা পাইবার তখনও তিন দিন দেরি। ধার করিবার চেষ্টা সে অনেকদিনই ছাড়িয়াছে, মেসে কেহ কাহাকেও ধার দেয় না, চারিটি পয়সা চাহিলেও হয় খালি মনিব্যাগ দেখায়, নয়তো সে যে এইমাত্র নিজেই পাশের ঘরে পয়সা ধার করিতে গিয়াছিল, শপথ করিয়া এই সংবাদটি ঘোষণা করে।

ভাগ্যে সে যেখানে পড়ায় তাহারা নিয়মিত দু তারিখে মাহিনাটা দেয়! কিন্তু তাহাতেই বা সুবিধা কি। দশ টাকার মধ্যে অন্তত, পাঁচটি টাকা এ মাসে ম্যানেজারকে দিতেই হইবে। বাকী থাকে পাঁচ; তাহারই মধ্যে খাওয়া, তেল, সাবান, নাপিত, সব আছে। তবু ধোপার খরচা নাই। এমনই হিসাব করিলে মাথা খারাপ হইয়া যায়, অথচ আরও একখানা কাপড় না কিনিলেও লজ্জা নিবারণ হয় না।

অর্থ উপার্জ্জনের যত রকম পন্থা আছে, সবগুলিই সে ভাবিয়া দেখিয়াছে কিন্তু কোনটাতেই কিছু সুবিধা হয় নাই। এক পকেট-কাটা ছাড়া আর সব ব্যবসাতেই মূলধনের প্রয়োজন হয়, যেটার একান্ত অভাব তার। আর পকেটমার হওয়ার মত যথেষ্ট 'স্মার্ট'ও সে নয়, অন্তত এই তাহার বিশ্বাস।

টাকা কেহ দেয় না বটে, কিন্তু উপদেশ দেওয়ার লোকের অভাব নাই।

পাশের সীটের কার্তিকবাবু প্রায়ই বলেন, ওহে, একটা টাকা তুমি বিশ্বাস ক'রে আমার হাতে দিয়ে দেখ দেখি, কাল এসে পাঁচটি টাকা পকেটে ফেলে দিয়ে যাব।

কার্তিকবাবু কাজ করেন যেন কী একটা সরকারী অফিসে, কিন্তু সেটা তাঁহার গৌণ ব্যাপার। মুখ্য পেশা তাঁহার জুয়া খেলা। ঘোড়দৌড়ের মাঠের যাবতীয় সংবাদ তাঁহার কণ্ঠস্থ—কোন্ ঘোড়ার নাকের মধ্যে কবে ঘা হইয়াছিল, কোন্ ঘোড়া দৌড়ের সময় একবার নাক ঝাড়ে না, এ-সব সংবাদ তাঁহার ডায়েরিতে নোট করা আছে। কবে 'সানষ্টার' তিন পায়ে দৌড়িয়া ডার্বি জিতিয়াছিল আর কবে গৌরীশংকর কুয়াশার সুযোগে বিচারকদের চোখে ধূলা দিয়াছিল, সেই সব সরস কাহিনী প্রত্যহই আহারের সময় তিনি সকলকে শোনান। মেসের অনেককে 'সিওর টিপ'ও তিনি মধ্যে মধ্যে দিয়া থাকেন, তবে তাহাতে আজকাল কেহই প্রায় বিচলিত হয় না।

স্ত্রী পুত্র কার্তিকবাবুর আছে, কিন্তু সে তাঁহার দাদার উপর বরাত দেওয়া। মাঝে মাঝে দেখা দিতে যান বটে, তবে সে দৈবাৎ। শনিবার হইলে মাঠ আছে, মাঠের ফেরত ট্রামভাড়া পর্য্যন্ত থাকে না, দেশে যাইবার ট্রেনভাড়া তো দূরের কথা। যে-সব শনিবারে কোনও মাঠে কিছু থাকে না, কিংবা সহসা কিছু পকেটে আসিয়া যায়, সেই সব শনিবারে তিনি বাড়ী যান। যাইবার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য খাবার, স্ত্রীর জন্য সাবান এবং দাদার ছেলেমেয়েদের জন্য খেলনা—এ তাঁহার কখনও লইতে ভুল হয় না এবং প্রতিবারেই প্রতিশ্রুতি দিয়া আসেন যে, এইবার ফিরিয়াই তিনি একটি বাসা ঠিক করিবেন। এসব কথা অবশ্য শোনা কার্তিকবাবুর কাছেই।

কার্তিকবাবুর পাশে আর এক ভদ্রলোক থাকেন, অবিনাশবাবু। মাথাটি ওলের মত কামানো, গলায় কণ্ঠি, নাকে তিলক, এক-কথায় ঘোর বৈষ্ণব। কফ্ দেওয়া জামা এবং স্প্রিং-এর জুতা পরেন। খুব উঁচু বংশ, মহারাজা প্রতাপাদিত্যের আমলে তাঁহার পূর্বপুরুষরা জমিদার ছিলেন। তাহারাই কিছু অংশ লইয়া প্রায় সেই সময় হইতেই মামলা চলিতেছে, যা হ'ক একটা কিছু হেস্তনেস্ত হইয়া গেলেই

তিনি অমলকে একটা চাকরি দিবেন—একথা তিনি প্রায়ই বলেন। কিন্তু এখন কি আর তাঁহার কিছু করিবার সাধ্য আছে? তিনি যে মরমে মরিয়া আছেন।

দোতলার কোণের ঘরের নগেনবাবু বলেন, ওহে আইনটা পড়ে ফেল দেখি কোনও রকম ক'রে, তার পর নিদেন দরখাস্ত লিখেও দৈনিক দশ-গণ্ডা, বার-গণ্ডা পয়সা কামাতে পারবে।

তিনি নিজেও উকিল। কিন্তু ওই 'কোনও রকম'টা যে কি, তাহা বলিতে পারেন না। পয়সা-কড়ি সম্বন্ধে তাঁহার কথা না ভাবাই ভাল; প্রত্যহ মেসে ফিরিয়া ট্রাঙ্ক হইতে টাকার গেঁজেটা বাহির করিয়া গনিয়া দেখেন যে, কত পয়সা ইতিমধ্যে চুরি গেল। রাস্তায় বাহির হইলে সারাক্ষণ একটা হাত বুক-পকেটে দিয়া রাখিতে হয়, বলা বাহুল্য 'পার্স'টা তাঁহার ঐ পকেটেই থাকে। জবাকুসুম তেলের শিশিতে কাগজ কাটিয়া দাগ করা আছে, প্রত্যহ সকালে-বিকালে গণিয়া দেখেন যে, কেহ চুরি করিয়া মাখিল কি না। তৎসত্ত্বেও প্রায় বলেন, আর একটা ট্রাঙ্ক না কিনলে নয়, এইসব খুচরো জিনিসগুলো যেখানে-সেখানে ফেলে রাখা ঠিক নয়।

নগেনবাবুর চায়ের নেশার কথা মনে পড়িলে অতিরিক্ত দুঃখের মধ্যেও অমলের হাসি পায়। ভদ্রলোক ভোরবেলা উঠিয়াই লক্ষ্য করেন কোন্ ঘরে চা তৈয়ারী হইতেছে, কিংবা চাকরকে কে পয়সা দিয়া বাজারে পাঠাইতেছে। তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ঘরে গিয়া হাজির হন এবং অনুরোধ করিলেই বলেন, তাই তো আবার চা দেবে? আচ্ছা দাও, কম ক'রে কিন্তু। চা-টা বেশী খাওয়া ঠিক নয়।

নগেনবাবুর ঘরে অপর ভদ্রলোকটী, কী-যেন গালভরা তাঁহার নাম, অমলের কিছুতেই মনে থাকে না—একটু বেশীরকমের ভোজনপ্রিয়। কিন্তু নগেনবাবুর জন্য প্রায়ই তাঁহাকে বিপন্ন হইতে হয়। আহার্য সম্মুখে দেখিলেই নগেনবাবুর দৃষ্টি নাকি এত লোলুপ হইয়া ওঠে যে তখন তাঁহাকে ভাগ না দিয়া থাকা যায় না। নগেনবাবুর চা খাইতে যাওয়ার ফুরসুতে কোন-রকমে ষ্টোভ জ্বালিয়া ভদ্রলোক একটু হালুয়া কিংবা দু-খানা মামলেট তৈরী করিয়া লন, কিন্তু তাও এক একদিন নগেনবাবু ইতিমধ্যেই চা শেষ করিয়া চিলের মত আসিয়া পড়েন। ভদ্রলোক প্রায়ই

আফশোষ করিয়া অমলের কাছে বলেন, খেয়ে সুখ নেই মশাই, বলেন কি! এমম জায়গাতে মানুষ থাকে?

এই মেসে একটিই মাত্র লোক আছে, যাহার কাছে পয়সা ধার চাওয়ার আশা দুরাশা হইত না, যদি না তাহার অবস্থাও প্রায় অমলের সমান হইত। ছেলেটির নাম ইন্দু, স্কটিশ চার্চে পড়ে। একটা গোটাদশেক টাকার স্কলারশিপ ও আরও একটা দশ-বার টাকার টুইশন সম্বল করিয়া সে কলেজে পড়িতেছে। তেতলার চিলের ঘরটিতে সে মাথা গুঁজিয়া থাকে এবং অতি কষ্টে বাহিরের সম্ভ্রম এবং ভিতরের প্রয়োজনের তাগিদ বজায় রাখে। তবুও ইহারই মধ্যে এক-একদিন সে অমলকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মুড়ি ও ছোলার ছাতু এক জায়গায় মাখিয়া খাইতে বসে এবং লেখাপড়ার কথা আলোচনা করে। এক-একদিন দেশ হইতে আরও দরিদ্র এক মামা তাহার সংবাদ লইতে আসেন, সঙ্গে প্রায়ই নারিকেলের নাড়ু বা চন্দ্রপুলি থাকে, তাহাও কাগজে মুড়িয়া কোন এক ফাঁকে সে অমলের কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া যায়। এই একটিমাত্র ছেলের কাছেই নিজের দারিদ্র্যের স্বরূপটা প্রকাশ করিতে অমল কোনওদিন লজ্জাবোধ করে নাই, তবে যতদূর জানা আছে, এ মাসে তাহার অবস্থাও রীতিমত শোচনীয়, সুতরাং পয়সা-কড়ি চাওয়ার কথা ভাবাই চলে না।

তবুও খানিকটা চুপ করিয়া শুইয়া থাকিবার পর অমল উঠিয়া তাহারই উদ্দেশে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। একটু আগেই ইন্দু উপরে উঠিয়াছে, তাহা সে জানিত। অন্তত মিনিট-দশেক তাহার সহিত গল্প করিলেও মনটা সুস্থ হইতে পারে, এই আশায় সে বাহির হইল। উপরের সিঁড়ির কোণেই যে ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল তিনি নগেন বাবুদের পাশের ঘরে থাকেন, নাম শৈলেন বাবু। ছোট ছোট চোখ এবং বড় বড় দাঁত, মুখের দিকে চাহিলে প্রথমেই এই দুটা জিনিস চোখে পড়ে। মাথার অধিকাংশ স্থানই কেশ-বিরল তবু তাহাতেই মহা-ভৃঙ্গরাজ ঘষিতে তাঁহার পুরা এক ঘণ্টা সময় লাগে। তখনও মাথায় তিনি তেলই ঘষিতে ছিলেন, অমলকে দেখিয়া কহিলেন, "এই যে অমল বাবু, চুপ ক'রে শুয়েছিলেন বুঝি?

আমি ভেবেই পাই না মশাই, যে আপনার মত ইয়ং-ম্যান কি ক'রে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন। খাটুন মশায়, খাটুন—যা হ'ক একটা কিছু নিয়ে পরিশ্রম করুন। Time is money! অমূল্য সময়কে অর্থে রূপান্তরিত করুন, পয়সা কি আর এমনি আছে?"

এসব কথার জবাব অমল প্রথম প্রথম দিবার চেষ্টা যে করে নাই এমন নয়, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বুঝিয়াছিল যে, শৈলেনবাবু সেই শ্রেণীর লোক, যাঁহারা শুধু উপদেশ দিবার আনন্দেই উপদেশ দেন, এমন কি, না দিয়া থাকিতে পারেন না। সুতরাং এখন সে আর জবাব দেয় না। আজও সে তাই পাশ কাটাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। উঠিতে উঠিতে শুনিল যে তখনও পিছনে শৈলেন বাবু অলসতার উপর বক্তৃতা দিয়া চলিয়াছেন।

ইন্দুর ঘরে ঢুকিয়া অমল সোজা তাহার বিছানাটার উপর শুইয়া পড়িল। ইন্দু মুখ তুলিয়া চাহিল বটে, কিন্তু ভয়ে কোনও প্রশ্ন করিল না, পাছে খুব অপ্রিয়-কিছু শুনিতে হয়। একটু পরে অমলই কথা কহিল, আর তো পারি না ভাই ইন্দু বাবু। দেশে ফিরে গেলে সেই মাষ্টারিটা পাব এমন সম্ভাবনা যদি থাকত, তা হ'লে আমি পায়ে হেঁটেই দেশে চলে যেতুম, এমনই আমার অবস্থা।

ইন্দু সভয়ে কহিল, ফ্রেশ কিছু হ'ল নাকি?

অমল জবাব দিল, হ'ল না, সেইটাই তো অসহ্য। কিছুই হচ্ছে না যে।··আর একটু থামিয়া কহিল, বিছানাটার এমন অবস্থা হয়েছে যে কেবলই আমার মনে হয়, বারান্দা দিয়ে যত লোক যাচ্ছে, সকলকারই নজর আমার বিছানাটার ওপর।

ইন্দু একটু যেন অপ্রস্তুতভাবে কহিল, আমার কাছে যে কাপড়কাচা সাবানটা আছে, তাতে খুব না হ'ক, খানিকটা ফরসা হবে বোধ হয়, একবার চেষ্টা করে দেখলেন না কেন?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অমল কহিল, তা না হয় দেখব, আর দেখতেই হবে; কিন্তু এমন জোড়াতালি দিয়ে আর ক'দিন চলবে? কিছুতেই যেন আর কূল-কিনারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দু সহসা লাফাইয়া উঠিল, কহিল, আচ্ছা অমলবাবু, আসুন না একটা কাজ করা যাক।

ইন্দুর প্ল্যানগুলি সাধারণত কোন্ শ্রেণীর তাহা অমলের জানা ছিল, সুতরাং সে একটু সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কি বলুন দেখি ?

ততক্ষণে ইন্দু উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে, সে জবাব দিল, আমরা তো রোজ ভোর বেলা বেড়াতে যাই, সেই সময়টা যদি খবরের কাগজ বেচি তা হ'লে কি হয় ?

অমল কিছুক্ষণ বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, তার মানে ?······খবরের কাগজ ?

তাহার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া ইন্দু একটু দমিয়া গেল, ভয়ে ভয়ে কহিল, হ্যাঁ, তাতে দোষ কি ?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অমল কহিল, দোষ অবশ্য কিছু নেই, কিন্তু আপনি তা পারবেনই বা কেন, আর আপনার দরকারই বা কি ? তা ছাড়া, ধরুন আপনার কলেজের বন্ধুরা যদি কোন দিন দেখেই ফেলে ? তা হলে কি আপনি কলেজে আর কোনদিন মুখ দেখাতে পারবেন ?

ইন্দু জবাব দিল, তা বটে। কিন্তু কলেজের বন্ধুরা তো সবই এই দিকের, আমরা যদি একটু অন্যত্র যাই ? ধরুন, ধর্ম্মতলা, কিংবা চৌরঙ্গি কিংবা ভবানীপুর ? তা ছাড়া টাকার আমারও দরকার, সত্যি দরকার। কি কষ্টে যে আছি তা আর কি বলব। চলুন দুজনেই যাওয়া যাক।

অমল কহিল, হ্যাঁ, দু'জনে দুদিকে গেলে হয় বটে।

বাধা দিয়া তাড়াতাড়ি ইন্দু কহিল, না, না, দুদিকে নয়। একটা মোড়েই দু'জনকে থাকতে হবে। নইলে নার্ভাস হয়ে পড়ব, কাজ হবে না। এখন নতুন তো! আপনাকে দেখে আমি ভরসা পাব, আপনি আমাকে দেখে বুক বাঁধবেন, তবেই তো হবে।

অমল কহিল, কিন্তু পড়াশুনো ? আমার না হয় ও বালাই নেই, আপনার তো আছে।

ইন্দু ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, সে ঠিক হবে'খন। সকালে ঘণ্টা দুই ক'রে খাটলে এমন কি আর ক্ষতি হবে? রাত্তিরে পুষিয়ে নেব এখন।

অমল চোখ বুজিয়া খানিকক্ষণ ভাবিয়া কহিল, তা না হয় হ'ল, কিন্তু টাকাটা? অবস্থা তো আমাদের দুজনেরই সমান, টাকাটা কোথা থেকে আসবে ইন্দু বাবু? অন্তত দু-তিন টাকা মূলধনও তো চাই।

এই প্রবল ধাক্কাটা সামলাইতে ইন্দুর কিছু দেরি লাগিল। তাহার ক্যাশের অবস্থা অমলেরই মত, হয়তো সামান্য কিছু বেশী; কিন্তু আনা আষ্টেক পয়সা যাহাদের সম্বল, তাহাদের কাছে দু-তিন টাকা মূলধন লিমিটেড্ কোম্পানীর মঞ্জুরীকৃত মূলধনের মতই দুরাশা মাত্র। বেচারী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। অমলও প্রথম যখন কথাটা বলিয়াছিল, তখনও পর্য্যন্ত তাহার মনে একটা ক্ষীণ আশার আভাস ছিল যে, হয়তো এ সমস্যার মীমাংসাও একটা কিছু ইন্দু করিয়া লইতে পারিবে। কিন্তু বহুক্ষণ ওদিক হইতে কোন সাড়া-শব্দ না আসায় সে হতাশ হইয়া আবার চোখ বুজিল। অর্থাৎ অন্ধকার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই রহিল।

নীচের তলায় কয়েকটি বাবুর আস্ফালনের শব্দ শোনা যাইতেছিল। তাহার সহিত পাশের বাড়ির পোষা কোকিলটার ভাঙ্গা-ভাঙ্গা আওয়াজ মিশিয়া এক বিচিত্র আব্‌হাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল! সেইদিকে খানিকটা কান পাতিয়া থাকিবার পর সহসা ইন্দু কথা কহিল; বলিল, আচ্ছা, সন্ধানে কোনও মহাজন আছে? গহনা বাঁধা রেখে টাকা ধার দেয়?

অমল বিস্মিত হইয়া জবাব দিল, না, কিন্তু কেন?

ইন্দু একটুখানি সলজ্জভাবে হাসিয়া কহিল, আংটিটায় এখন আর কিছু নেই বটে, কিন্তু এককালে ওটা খাঁটী সোনাই ছিল। শুধু সোনার দামে বিক্রী হ'লেও অন্তত ছ-সাত টাকা দাম হবে। অবশ্য বিক্রী করার আমার ইচ্ছে নেই, কারণ মা ওটা অনেক কষ্টেই গড়িয়ে দেয়েছিলেম, তবে বাঁধা রেখে যদি গোটা-দুই টাকাও পাওয়া যেত তো মন্দ হ'ত না।

অমল কহিল, তাপ পর ? টাকাটা শোধ হবে কি ক'রে ?

ইন্দু বলিল, কেন, কাগজ বেচে কি কিছুই হবে না ? আর না হয় যেমন ক'রে হ'ক শোধ করব।

একটু ভাবিয়া অমল কহিল, কি জানি, আমার ছাত্রদের বাড়ি জিগ্‌গেস করলে হয়তো হদিস্ পাওয়া যায়।

ইন্দু বইটা মুড়িয়া রাখিয়া কহিল, তা হলে চলুন এখনই যাওয়া যাক। আমার ক্লাস সেই বারোটায়, এখনও ঢের সময় আছে।

অমলও "চলুন" বলিয়া উঠিয়া পড়িল! তাহার পর তাহার সেই অতি মলিন জামাটাই গায়ে চড়াইয়া মেস-সুদ্ধ লোকের দৃষ্টি এড়াইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিল।

২

অমল যেখানে ছেলে পড়াইত সেই বংশের অর্থের খ্যাতি এককালে খুবই ছিল। বাহিরেব বৃহদাকার থামগুলি ভগ্নপ্রায় হইলেও এখনও তাহারা সেই খ্যাতির সাক্ষ্য দিতেছে। প্রকাণ্ড বাড়ি, অনেকগুলি শরিক; এবং সকলেই কিছু কিছু উপার্জ্জন করে। কিন্তু এমন কিছু করে না যাহাতে ঐ বৃহদায়তন বাড়িটিকে সারানো চলে। হয়তো কোনও কোনও শরিকের হাতে সামান্য কিছু আছে, কিন্তু সে পয়সা তাঁহারা পাঁচ ভূতের সম্পত্তিতে খরচ করিতে প্রস্তুত নন। সুতরাং বাড়িটি আজও সেই ভঙ্গুর অবস্থায় দাঁড়াইয়া অতীতের গৌরব এবং বর্তমানের লজ্জা ঘোষণা করিতেছে।

অমলের আহ্বানে ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন একটি পাঁচহাতী ধুতি পরিয়া তেল মাখিতে মাখিতে। অফিসের সময় হইতেছে, সুতরাং ভ্রূ-কুঞ্চিত।

আরে মাষ্টার যে! কি খবর বলুন দেখি ?

অমল বিনীতভাবে কহিল, একটা সোনার আংটি রেখে গোটা দুই টাকা ধার

দিতে পারেন? আপনার কাছে সুবিধে না হ'লে যদি আর কাউকে ব'লে দেওয়াতে পারেন তা হ'লেও ভাল হয়।

ভদ্রলোক অকারণ পেটে হাত ঘষিতে ঘষিতে মুহূর্ত-কয়েক ছোট ছোট চোখ মেলিয়া অমলের দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তাহার পর কহিলেন, বেশভূষার তো ওই ছিরি, অবস্থাও শুনেছি অন্ত্য-ভক্ষ্য-ধনুর্গুণঃ, তবে আবার এত রেসের সখ কেন?

মুহূর্ত মধ্যে যেন অমলের কান হইতে আগুন ছুটিতে লাগিল; ইন্দুর অবস্থা কল্পনা না করাই ভাল। কিন্তু তবুও অমল প্রাণপণে সংযত হইয়া জবাব দিল, আজ্ঞে না, রেস নয়।

ভেংচি কাটিয়া ভদ্রলোক কহিলেন, আজ্ঞে না, রেস নয়! আজ শনিবার; আংটি বাঁধা রেখে টাকা ধার করতে এসেছেন কি জন্যে শুনি? হয় রেস, নয় শ্বশুরবাড়ী, নইলে শনিবারে গয়না বাঁধা রেখে কেউ টাকা ধার করে? শ্বশুরবাড়িও তো নেই শুনেছি,—তবে?

অমল প্রায় মরিয়া হইয়া জবাব দিল, আমার এই বন্ধুটির বিশেষ দরকার, যদি দিতে পারেন তো দিন, আমার আর অপেক্ষা করবার সময় নেই।

ভদ্রলোকের কণ্ঠস্বর হঠাৎ আশ্চর্য রকম নরম হইয়া গেল। পেটে তেল-ঘষা মিনিটখানেকের জন্য বন্ধ রাখিয়া একবার ইন্দুর আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া লইলেন, তারপর কহিলেন, তা আমি খারাপ কথাটা কি বলেছি? আজকাল ওই ক'রে সবাই উচ্ছন্ন যাচ্ছে, তাই একটু সাবধান ক'রে দিচ্ছিলুম—। টাকা আপনাকে না হয় দিচ্ছি, কিন্তু ওঁর আংটি-ফাংটিতে আমার দরকার নেই।

সামান্য একটু বিদ্রূপের সুরে অমল কহিল, না না আংটিটা নিয়েই রাখুন, যদি পালিয়ে যাই?

ভদ্রলোক আবার উষ্ণ হইয়া উঠিলেন, ওসব ঠাট্টা-তামাসা বোঝবার মত বয়স আমার হয়েছে, ওসব আমি বুঝি। টাকার দরকার থাকে তো নিয়ে যান, আংটি বাঁধা রাখতে আমি পারবো না। টাকা ধার দেওয়া আমার পেশা নয়।

তাহার পর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই প্রাণপণে চেঁচাইতে শুরু করিলেন, পচা, এই পচা, হতভাগা মরেছ ? ডাকাত পড়লেও শুনতে পাও না ?

ভিতর হইতে প্রায় সমান সুরেই জবাব আসিল, কি হয়েছে কি ? আমি কি বাতাসে উড়ে যাব নাকি ? কি চাই ?

ভদ্রলোক দাঁত কিড়মিড় করিয়া কহিলেন, দেখেছেন, আঁটকুড়ীর ব্যাটার তেজ দেখেছেন ?—ওগো নবাব পুত্তুর, শিগগির তোমার মায়ের কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে এনে মাষ্টার মশাইকে দাও ! আমার নাম করে চাইবি, বুঝেছিস ?

তারপর অমলের দিকে চাহিয়া কহিলেন, টাকাটা নিয়ে যাবেন, আমার চান করার টাইম পেরিয়ে গেল, আমি চললুম।—শালা ছোটসাহেব এবার বিলেত থেকে ফিরে এসে ইস্তক যা পেছনে লেগেছে, একটি মিনিট লেট হবার জো নেই।

অল্পক্ষণ পরেই ভিতর হইতে তাঁহার কণ্ঠস্বর শোনা যাইতে লাগিল, নিয়ে গেলি তাড়াতাড়ি ? বাবুরা আবার হয়তো এক্ষুণি রাগ করে চলেই যাবেন। এক কড়ার মুরোদ নেই, পাছাভরা ঝাল আছে খুব ! ইঃ !

ইন্দুর মুখ লাল হইতে ক্রমশঃ পাংশুবর্ণ ধারণ করিতে ছিল। অমল তাহার দিকে চাহিতেই সে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, চলুন অমলবাবু অন্য জায়গায় যাই, এখান থেকে টাকা নিয়ে দরকার নেই।

অমল একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এইতেই নার্ভাস হচ্ছেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাগজ বেচবেন কি করে ?

ইন্দু সহসা জবাব দিতে পারিল না। ইতিমধ্যে পচা আসিয়া অমলের হাতে টাকা দুইটি দিয়া গেল। রাস্তায় নামিয়া অমল আংটিটা ইন্দুর হাতে দিয়া কহিল, এটা রেখে দিন তা হ'লে, ভালই হল, আপনার মায়ের আংটিটা বাঁধা পড়ল না।

ইন্দু একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, কিন্তু আংটিটা আর কোথাও বাঁধা রেখে আর দুটো নিলে হয় না ?

আশ্চর্য হইয়া অমল কহিল, কেন ?

ইন্দু জবাব দিল, টাকা দুটো ইনি এমনই দিলেন যখন, তখন আপনার মাইনে থেকেই কেটে নেবেন তো? আপনি কি করে আপনার সব খরচ চালাবেন।

অমল একটু ভাবিয়া জবাব দিল, বোধ হয় তা করবে না ঠিক সে প্রকৃতির লোক নয়। আর যদিই করে, আমরা দু-এক দিনের মধ্যে কি আর এ দুটো টাকা তুলে নিতে পারব না?

ইন্দু চুপ করিয়া রহিল, বোধ করি তাহার উৎসাহ ইতিমধ্যেই কমিয়া আসিয়াছিল। অমল তাহা লক্ষ্য করিয়া খানিক পরে কহিল, আপনি এরই মধ্যে যেন দমে গেছেন বলে মনে হচ্ছে। দেখুন, এখনও সময়ে আছে।

ইন্দু প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না, শেষ পর্য্যন্ত আমি দেখবই।

অমল আর কোনও কথা না কহিয়া সোজা বড়বাজারের রাস্তা ধরিল। কারণ স্থির হইল যে প্রথম প্রথম এক রকমের কাগজ লইয়া চেষ্টা করাই উচিত এবং তাহা আনন্দবাজার পত্রিকা হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আনন্দবাজার অফিসে টাকা দুইটি জমা দিয়া বাহির হইয়াই ইন্দু কহিল, তা হ'লে কাল রাত তিনটেয় উঠতে হবে, কি বলুন?

অমল কহিল, না, সাড়ে চারটেয় উঠলেই হবে, এখানে তো পাঁচটার আগে কাগজ দেবে না।

ইন্দু বাধা দিয়া কহিল, না না, আপনি বুঝছেন না; ভয়ানক ভিড় হবে, শেষকালে খোট্টাদের ভিড় ঠেলে আমরা কাগজ নিতেই পারব না। তা ছাড়া এতটা পথ হেঁটে যেতে হবে তো?

আরও অনেক আলোচনার পর দুইজনে মেসে ফিরিল; উত্তেজনায় সেদিন রাত্রের মধ্যে ইন্দু একবারও বই খুলিতে পারিল না। সারারাত অমলেরও ঘুম হইল না। দুইজনেই রাত্রি সাড়ে চারটার সময় বাহির হইয়া পড়িল এবং কম্পিত বক্ষে আনন্দবাজার অফিসে উপস্থিত হইল। পথে কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিল না, দুজনেরই মনের বোধ করি এমন অবস্থা যে টাকা দুইটির আশায় জলাঞ্জলি দিয়া যেন পলাইতে পারিলেই তাহারা বাঁচে।

কাগজের অফিসে গিয়াও দেখে সে এক বিশ্রী কাণ্ড। ঠেলাঠেলি, মারামারি, যত হিন্দুস্থানীর গোলমাল। তাহার মধ্যে শার্টপরা বাঙালী যুবকের অগ্রসর হওয়াই মুশকিল। প্রায় আধ ঘণ্টা তাহাদের একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল, কেহ যে বক্র কটাক্ষ বা পরিহাস করিল না এময় নয়, কিন্তু তখন আর উপায় কি! অবশেষে একটি হিন্দুস্থানীরই দয়া হইল, সে কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল, কি চাহি বাবু আপনাদের ?

অমল ঢোঁক গিলিয়া শুষ্ককণ্ঠ পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিতে করিতে কথাটার জবাব দিল। লোকটি একটু হাসিয়া কহিল, কাগজ কি আপনারা বিচতে পারেন বাবুজী, কেন মিছিমিছি তকলিফ করেন ?

অমল বলিল, তবুও একটু চেষ্টা না করলে তো চলবে না।

সে কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, আপনি দাঁড়ান, হামি দেখছি।

সে ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই অমলদের কাগজ বাহির করিয়া দিল। অমল ও ইন্দু তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া তাড়াতাড়ি রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু ততক্ষণেই আকাশ বেশ ফরসা হইয়া গিয়াছে, এমন কি কাগজ বিক্রীও শুরু হইয়াছে। সেই দিবালোকের মধ্য দিয়া প্রথমত কাগজ বহিয়া লইয়া যাওয়াই কঠিন, তাহার উপর গন্তব্যস্থানে পৌছিতে বেলা হইলে কাগজ বিক্রীই বা হইবে কখন? দুজনে যথাসম্ভব সত্বর পা চালাইয়া চলিল। অতগুলি কাগজ ঢাকিয়া লইয়া যাওয়া অসম্ভব সুতরাং কোনও মতে ঘাড় নীচু করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল।

চৌরঙ্গি পার হইয়া যখন তাহারা ভবানীপুরে পড়িল, তখন প্রায় সাতটা। লোকজন রীতিমত রাস্তা চলিতে শুরু করিয়াছে; হিন্দুস্থানী কাগজওয়ালারা ছুটাছুটি করিয়া কাগজ বেচিতেছে, ট্রাম ও বাসের সঙ্গে সঙ্গেই ছুটিতেছে, যাত্রীদের পিছনে পিছনে তাড়া করিতেছে, কেহ বা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে।

প্রথম দুটি তিনটি মোড় তাহারা ফেলিয়া চলিয়া গেল এই ভরসায় যে

হয়তো আগে কাগজওয়ালা অপেক্ষাকৃত কম; কিন্তু কিছু দূর গিয়াই বুঝিল সর্বত্রই সমান।

তখন অমল কহিল, আর গিয়ে লাভ নেই ইন্দুবাবু, আসুন এখানেই আরম্ভ করি।

কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া ইন্দুর মুখ শুকাইয়া উঠিয়াছে, সে যেন আর কোনও মতেই ঘাড় তুলিতে পারে না। শুষ্ককণ্ঠে কি বলিতে গেল তাহাও স্পষ্ট বোঝা গেল না। তাহার কপালে ঘাম দেখা দিল।

এধারে অমলের অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়। সে কিছুতেই ট্রাম বা বাসের কাছে গিয়া কাগজ দেখাইতে পারিল না। এ শহর তাহার জন্মভূমি নয়, এখানে পরিচিতের সংখ্যা অতি অল্প, তাহাকে কাগজ বেচিতে দেখিয়া বিস্মিত হইবে এমন লোক কেহই নাই বলিলেও চলে, তথাপি বিশ্বের সমস্ত লজ্জা যেন আজ তাহার মাথায় চাপিয়া বসিতে লাগিল। সে কিছুক্ষণ একটা থামের পাশে কাগজগুলি উঁচু করিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল; কিন্তু কোনও ক্রেতাই তাহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিল না।

মিনিট পনের পরে অমলই কহিল, ইন্দুবাবু বেলা বেড়ে যাচ্ছে, আসুন দুজনেই একসঙ্গে বাসগুলোতে কাগজ দেখাই।

ইন্দু একবার ভয়ার্ত দৃষ্টি মেলিয়া রাস্তার দিকে চাহিল, তার পর কোনও মতে বুকে সাহস সঞ্চয় করিয়া অমলের সহিত নামিয়া আসিল। কিন্তু ঠিক যে মুহূর্তে একটা বাস আসিয়া দাঁড়াইবার জন্য গতি মন্থর করিল, সেই মুহূর্তেই সে পিছাইয়া যতটা সম্ভব অমলের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সব সহপাঠী ও তাহাদের আত্মীয়-স্বজনের মুখগুলি মানসচক্ষে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল এবং তাহাদের ভবানীপুরের দিকে বাসে চড়িয়া আসিবার সহস্র সম্ভাবনার কথা তাহার মাথার মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। ফলে তাহার বুক ঢিপঢিপ করিতে লাগিল, ঘামে কাপড়-চোপড় ভিজিয়া গেল।

অমল বাসের কাছে গেল বটে, কিন্তু ঘাড় নীচু করিয়া একখানা কাগজ একটা

জানালার দিকে মেলিয়া ধরা ছাড়া আর কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। ভদ্রসন্তান দেখিয়া এক ভদ্রলোক দুইটী হিন্দুস্থানী কাগজওয়ালার প্রসারিত হস্ত ঠেলিয়া দিয়া তাহারই হাত হইতে কাগজখানি টানিয়া লইলেন এবং একটি দু আনি বাহির করিয়া কহিলেন, ফেরত দাও শিগগির।

অমল বিশম বিব্রত হইয়া মূঢ়-দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। তাহার পকেটে একটি পয়সা নাই। বাসও ততক্ষণে ছাড়িয়া দিয়াছে। ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া কহিলেন, পয়সা নেই? তা হ'লে আর কি হবে, কাগজ নিয়ে নাও তোমার।

এই বলিয়া চলন্ত বাস হইতে কাগজখানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। কাগজটা ফুটপাথের ধারে নরদমার উপরে গিয়া পড়িল। অমল লজ্জায় মুখ-চোখ লাল করিয়া কাগজখানা তুলিয়া লইল; কিন্তু মানসিক ধিক্কারে তাহার দেহ তখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, আর একখানি বাস সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া পড়া সত্ত্বেও সে কাগজ বেচিবার চেষ্টা মাত্র করিল না।

একটি হিন্দুস্থানী কাগজওয়ালা মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, বাবু, ইয়ে আপলোগ্‌কা কাম নেহি; হামকো সব দে দিজিয়ে, হম এক এক পয়সা করকে দাম দে দেগা।

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মাথা না তুলিয়াই কহিল, অমলবাবু চলুন বাসায় ফিরি, এ আমি কিছুতেই পারব না।

তাহার গলায় কান্নার স্বর!

অমলের কথা কহিবার মত অবস্থা ছিল না। সে তখন অশিক্ষিত কাগজওয়ালা ও সমবেত দুই চারিজন পথিকের দৃষ্টি হইতে কোনও মতে ছুটিয়া পালাইয়া যাইতে পারিলে বাঁচে। পয়সা উপার্জ্জন না হয়, আত্মহত্যার পথতো কেহ ঘোচায় নাই। তাহার দুই কান দিয়া তখন যেন আগুন বাহির হইতেছিল।

কাগজওয়ালাটা নিজেই কাগজ গনিয়া পয়সা হিসাব করিয়া দিল, সেগুলি দেখিবার বা মিলাইবার চেষ্টা না করিয়া অমল ও ইন্দু প্রায় উর্দ্ধশ্বাসেই মেসের পথ ধরিল।

৩

পথে কেহ কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিল না। দৈহিক ক্লান্তি, পরাজয়ের গ্লানি, নৈরাশ্য ও লোকসানের চিন্তা দুজনকেই রীতিমত মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছিল।

মেসের সামনে আসিয়া ইন্দুই প্রথমে কথা কহিল। বলিল, আপনার বিশেষ দরকার বলছিলেন, ওই খুচরো পয়সাগুলো আপনিই রেখে দিন, পরে যখন আপনার সুসময় আসবে দেবেন। আর ও দুটো টাকা আমি যেমন করে পারি শোধ করে দেব।

তাহার পর উত্তরের অবসর মাত্র না দিয়া সে নিজের ঘরে উঠিয়া গেল। অমলেরও তখন উত্তর দিবার মত অবস্থা নয়। এই পয়সাগুলি কিছুতেই তাহার এভাবে লওয়া উচিত নয় তাহা সে অনুভব করিলেও সেগুলি সে ছাড়িতেও পারিল না। কোনও মতে ক্লান্ত পা দুইটা টানিয়া লইয়া নিজের বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িল। কাল ইন্দুর উৎসাহে এবং প্ররোচনায় যেটুকু আশার আলো মনে দেখা দিয়াছিল, আজ তাহা আরও অন্ধকার করিয়া দিয়া নিবিয়া গেল। ভদ্রসন্তানের এই মুখোশটা না খুলিয়া ফেলিলে তাহাদের দ্বারা ওসব কাজ হইবে না, কাজেই অনর্থক চেষ্টা করিয়া কোন লাভ নাই তাহা সে আজ পরিষ্কার বুঝিল।

মেসের ঠাকুর কি একটা কাজে উপরে উঠিতেছিল। অমলের ঘরের সামনে আসিয়া তাহার অতিশয় শুষ্ক ও মলিন মুখ দেখিয়া সহসা থমকিয়া দাঁড়াইল। তখন মেসের প্রায় সকলেই বাহিরে চলিয়া গিয়াছে; নীচে শুধু ঝি ও চাকরের কলহের একটা শব্দ হইতেছে, তা ছাড়া সমস্ত বাড়িটাই নির্জন। ঠাকুর মিনিটখানেক ইতস্তত করিয়া ডাকিল, বাবু।

অমল চোখ মেলিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া রীতিমত বিস্মিত হইয়া গেল। কহিল, কি গো, ঠাকুর?

ঠাকুর একবার মাথাটা চুলকাইয়া লইয়া কহিল, ভাত-তরকারি অনেক বেঁচেছে

বাবু, আপনি যদি বাইরে থেকে খেযে না এসে থাকেন তো এখানেই খেয়ে নিন না। ফেলা যাবে বই তো না।

অন্তত ছয়টি পয়সা বাঁচিযা যায় বটে। কিন্তু অমলের ভিতরকার ভদ্রসন্তান ধিক্কার দিয়া উঠিল। সে যথাসাধ্য লজ্জা গোপন করিয়া স্বাভাবিক স্বরে কহিল, ঠাকুর আজ যে আমার শনিবারের উপোষ, আজ তো খাবার জো নেই।

ঠাকুর কহিল, ওঃ, তাই মুখ অত শুকনো দেখাচ্ছে। তা বাবু, গ্রহ ফাঁড়াকে তুষ্ট রাখা ভাল। ওঁয়ারাই দুঃখু দেবার মূল কিনা।

ঠাকুর নামিয়া গেল। অমলের দুই কান অপমানে তখনও জ্বালা করিতেছে। এই লোকটি যে নিতান্ত দয়া করিয়াই ভাত-তরকারির প্রাচুর্যের কাহিনী তাহাকে শুনাইল, তাহাতে সংশয়মাত্র ছিল না। এত দিন এই মেসে আছে, প্রথম সহানুভূতির কথা সে শুনিল অশিক্ষিত পাচকের কাছে! ভদ্রলোকের চেয়ে ইহারা ভাল।

অনেক দিক দিয়াই ভাল! খাওয়া ও দশ টাকা মাহিনা তো এই ঠাকুরই পায়। ইহা ছাড়া গামছা, জলখাবার, তামাকের খরচা, ধোপা নাপিত সমস্তই মেসের। নীচেব ঘরে শুইতে হয় বটে, কিন্তু তাহাতে ক্ষতিই বা কি? সীটরেণ্ট দিয়াই বা সে কি সুখে আছে?

অমল অকস্মাৎ সোজা হইযা বসিল। তাহার নিমীলিত চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল। যে পথে সে চলিয়াছে সে পথে তো কোথাও কোন আশার আলো দেখা যায় না। এই দীর্ঘ দিনের চেষ্টার পরে সে আজ ক্লান্ত, অবসন্ন। বেশ তো, এই ভদ্রসন্তানের মুখোশ ঘুচাইয়া দিয়াই দেখা যাক না, ফল কি হয়।

বাল্যকালে অমল বেশী সময় মায়ের কাছে-কাছেই থাকিত, অনেক দিন তাঁহাকে রন্ধনে সাহায্যও করিতে হইয়াছে; মোটামুটি রান্নার ব্যাপার সে খানিকটা জানে, ছেলে ঠ্যাঙ্গানোর অপেক্ষা এ কাজ অনেক বেশী আরাম-দায়ক।

অমল নূতন প্ল্যানের উত্তেজনায় আর বিছানায় শুইয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল। এখান হইতে অনেক দূরে, পরিচিত সমস্ত গণ্ডীর

বাহিরে সে নূতন করিয়া জীবনযাত্রা শুরু করিবে; অদৃষ্টের কাছে সে মাথা নোয়াইবে না, কোনমতেই না!……

তিন দিনের দিন সে মাহিনা পাইল। মাহিনার টাকা হইতে সে দুইটি টাকা কাটাইয়া দিতে গেল, কিন্তু ভদ্রলোক কিছুতেই রাজী হইলেন না। কহিলেন, মাষ্টার, সবইতো বুঝি, মাইনে তো এই দশ টাকা। এক সঙ্গে দুটো কাটিয়ে দিতে গেলে গায়ে লাগবে। দেবেন'খন পরে পশ্চাতে, সুবিধে মত।

অগত্যা অমলকে কথাটা ভাঙ্গিতে হইল। সে মাথা নীচু করিয়া কহিল, হয়তো আমি কলকাতা থেকে চ'লে যেতে পারি।

ভদ্রলোক একরকম ঠেলিয়াই তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিলেন, বেশ, বেশ, তাই হবে। আমার ওই অকালকুষ্মাণ্ড ছেলেকে পড়াতে যে কী মেহনত্ তা তো আমি জানি। বুঝব যে ওই দুটো টাকা আপনাকে সন্দেশ খেতে দিলুম। এখন টাকাটা পাচ্ছেন, নিয়ে বাড়ি যান—অত সাধুপনা-কেন?

অমল আর দ্বিরুক্তি করিল না। সাধুপনা দেখাইবার শক্তি বা প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। সে মেসে ফিরিয়া আসিল। ইতিমধ্যেই কাগজ বিক্রির ফেরত পয়সা হইতে অত্যাবশ্যক কাপড় জামা সে কাচাইয়া লইয়াছিল। অবশ্য সে বেশীও নয়। পাশের সীটের ভদ্রলোক কাগজ কিনিতেন, তাঁহারই শেল্‌ফ হইতে একখানা পুরাতন কাগজ টানিয়া লইয়া খান তিন-চার কাপড়-জামা জড়াইয়া লইল, তাহার পর ইন্দুকে একখানা চিঠি লিখিতে বসিল। কাগজ ও খাম সে আগেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল।

লিখিল—

ইন্দুবাবু, এভাবে আর কিছুতেই চলল না; নতুন চেষ্টায় চললুম। ব'লে যাওয়া সম্ভব হ'ল না, কারণ মেসের অনেক পাওনা রইল। সে টাকা দিতে গেলে এখনই ভিক্ষায় বেরুতে হবে, নইলে উপবাস। যদি সম্ভব হয় তো এর পরে পাঠিয়ে দেব। আপনার সে টাকা দুটো আমি শোধ ক'রে এসেছি; তার জন্য কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করবেন না। তবে যদি আপনার কিছু দেয় আছে ব'লে মনে করেন তো রাঘব ঠাকুরকে চার আনা পয়সা আমার নাম ক'রে দেবেন। ইতি—

খামের মধ্যে কাগজখানি আঁটিয়া ঠিকানা লিখিয়া চুপি-চুপি মেসের লেটার-বক্সে ফেলিয়া দিল। খুব সম্ভব ইন্দু এখন তাহার ঘরেই আছে, হয়তো পড়িতেছে; কিন্তু তাহার সহিত মুখোমুখি দেখা না করাই ভাল।

তখন আটটা বাজিয়াছে। দুই একজন ফিরিয়াছেন বটে কিন্তু বহু লোকেই এখনও বাহিরে। ঠাকুর-চাকররা রান্না ঘরে ব্যস্ত! খবরের কাগজে জড়ানো প্যাকেটটি হাতে করিয়া সকলের অজ্ঞাতসারে সে চুপি চুপি বাহির হইয়া পড়িল। একবার বাহিরে দাঁড়াইয়া মেসের দিকে চাহিয়া লইল, তাহার পর ধরিল সোজা হাওড়ার পথ।

ইচ্ছা করিয়াই সে ময়লা কাপড়-জামা পরিয়াছিল; কারণ ভদ্রসন্তান বলিয়া পরিচয় সে আর দিবে না। উচ্চবংশ এবং শিক্ষায় সম্মান রাখিবার জন্য এই তো সে প্রাণান্ত করিল, আর ও পরিচয়ে কাজ নাই!

৪

হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছিয়া অমল কিন্তু রীতিমত দ্বিধায় পড়িল। পশ্চিমে যেখানে হউক্ চলিয়া যাইবে এবং সেখানকার বাঙালী অধিবাসীদের কাছে বাঙালী পাচক বলিয়া পরিচয় দিবে এই ছিল তাহার ইচ্ছা; কিন্তু সে পশ্চিমটি যে ঠিক কোথায় হইবে তাহা এখনও সে ভাবিয়া দেখে নাই। খুব বেশী শহরের নামও তাহার জানা নাই; পাটনা কাশী এলাহাবাদ এইগুলিরই নাম সে সচরাচর শুনিয়া থাকে। কোথায় বেশী বাঙালী, তাহাও ভাল জানা নাই। তবে মনে হয় কাশী যাওয়াই ভাল।

তাহার মনে পড়িল যে পকেটে তাহার মাত্র দশটী টাকা আছে। সে দিকটাও বিবেচনা করা কর্তব্য। একেবারে হাত খালি করা উচিত্ নয়। কারণ যাওয়া মাত্রই যে কাজ পাওয়া যাইবে তাহারই বা ঠিক কি? এই সব ভাবিতে ভাবিতে সে ব্যাকুলভাবে এদিক-ওদিক চাহিতেছে, এমন সময় নজর

পড়িল একদিকে বড় করিয়া Enquiry Office লেখা রহিয়াছে। সে আস্তে আস্তে সেইখানেই উপস্থিত হইল।

তিন-চারিটি লোক তখন যথেষ্ট হুড়াহুড়ি করিতেছে—

ও মশাই, আন্দুলের গাড়ি কটায় ?

পুরুলিয়ার গাড়ি ক নম্বর প্ল্যাটফর্ম মশাই ?

আচ্ছা, নাগপুরের গাড়ির কটায় arrivel বলতে পারেন ?

তাহারই মধ্যে কষ্টে মাথা লাগাইয়া সে প্রশ্ন করিল, পাটনার ভাড়া কত বলতে পারেন মশাই ?

বার-তিনেক প্রশ্নটি আবৃত্তি করার পর জবাব আসিল, পাটনা সিটি না জংশন ?

কী বিপদ ! অমল কতকটা ইতস্তত করিয়া কহিল, আজ্ঞে বাঁকিপুর।

বাঁকিপুরের নামটা সহসা মনে পড়িয়া গেল ; কোথায় যেন শুনিয়াছিল বাঁকিপুর জায়গাটাই পাটনার মধ্যে বড়।

বাঁকিপুর, ও, পাট্না জংশন ! চার টাকা তের আনা।—হাঁ, মেচাদা লোকাল ? দশ নম্বর। বর্দ্ধমাম যাবার গাড়ি ? এগার নম্বরে,—যাও না, হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ?

বলা বাহুল্য শেষোক্ত ধমকটি অমলকেই দেওয়া হইল ! তখন সে ভয়ে ভয়ে ঢোঁক গিলিয়া কহিল, কাশীর ভাড়া কত ?

লোকটি যেন এক পাক নাচিয়া লইল, তার পর কহিল, কোথায় যাবে তাই এখনও ঠিক কর নি, খামকা ভাড়া জিগ্‌গেস করতে এসেছ ? এতগুলো লোক জবাব পাচ্ছে না, তুমি মিছি মিছি ভিড় বাড়াচ্ছ কেন বাপু, সরে যাও—আমাদের এখন রসিকতা করবার সময় নেই।

সেইখানেই এক বৃদ্ধ ছিলেন, তিনি কহিলেন, বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝি হে ! কই এসোত এদিকে, দেখি !

ভয়ে অমলের কপালে ঘাম দেখা দিল। সে মৃদুস্বরে "আজ্ঞে না" বলিয়াই

ভিড়ের মধ্যে সরিয়া পড়িল। তাহার পর মরিয়া হইয়া তিন-চারিটি মেমসাহেবের মুখ-নাড়া খাইয়া এবং বহু হিন্দুস্থানী বেয়ারার কনুইএর গুঁতা খাইয়া পাটনা জংশনের টিকিটই একখানা কিনিয়া ফেলিল। কিন্তু গাড়ি কোথায় এবং কটায়? সে প্রশ্ন করিতে গেলেও আবার ঐ রগ-চটা বাবুগুলির কাছে যাইতে হয়; কিন্তু তাহাতে সে একান্ত নারাজ। অগত্যা সে রেল কোম্পানির জামা পরা লোক দেখিয়া দেখিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম জনতিনেক লোকের কাছে জবাব পাওয়া গেল না বটে কিন্তু তাহার পরই একজন দয়া করিয়া বলিয়া দিল, চার নম্বরে যে গাড়ি আছে, সেটি পাটনা জংশন পর্যন্তই যাইবে এবং ছাড়িবারও মাত্র আর আধ ঘণ্টা দেরি আছে।

এই প্রথম অমল হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়াছে। এই বিপুল জনতা এবং বিরাট কোলাহলে তাহার মাথার মধ্যে যেন সব গোলমাল হইয়া যাইতেছিল! এতবড় ষ্টেশন যে এই কলিকাতায় আছে তাহা এতদিন কলিকাতাতে থাকিয়াও সে কখনও অনুমান করিতে পারে নাই। খানিকটা বৃথা ঘুরিয়া আর একজনকে প্রশ্ন করিল, মশাই, চার নম্বর প্ল্যাটফর্মটা কোথায় বলতে পারেন?

সে একবার তাহার আপাদমস্তক চোখ বুলাইয়া লইল, তাহার পর কহিল, ওই ওদিকে। টিকিট কিনতে হবে না? দিন না কেটে এনে দিই। এই ভিড়ের মধ্যে আপনি কি কিনতে পারবেন? আমিও পাটনা যাব কিনা।

এই আত্মীয়তার অর্থ অমল বুঝিল। এরূপ জুয়াচুরির বহু বিবরণই সে শুনিয়াছে। সে মুচ্‌কি হাসিয়া কহিল, না টিকিট আমার কেনা আছে; আপনি অন্য লোক দেখুন।

সে কি ভাবিল কে জানে, হাসি চাপিতে চাপিতে চলিয়া গেল। অমল ভিড় ঠেলিয়া কোনও মতে চার নম্বরের গেট পর্যন্ত পৌছিল, কিন্তু খাঁচার মত দ্বারের মধ্য দিয়া পার হইতে গিয়া ভয়ংকর গোলমাল বাধিল। পিছন হইতে একটি অর্বাচীন হিন্দুস্থানী ধাক্কা দিয়া তাহাকে সামনে ঠেলিয়া দিল।

ফলে সামনের বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। খিঁচাইয়া উঠিয়া কহিলেন, চোখে দেখতে পাওনা ছোকরা? মানুষের গায়ের ওপর এসে পড় কেন? তুমি টিকিট কিনেছ, আমরা কিনি নি?

ভদ্রলোক ফটকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন, ফলে পিছন হইতে আরও ধাক্কা আসিতে লাগিল অমলের উপর, সে কোনওমতে তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া এক ফাঁক দিয়া গলিয়া ভিতরে গেল বটে, কিন্তু কিছুদূর গিয়াই বুক পকেটে হাত দিয়া দেখিল, যে টাকা কয়টি নাই, ইতিমধ্যেই কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে।

তাহার মুখ শুকাইয়া উঠিল, ললাটে ঘাম দেখা দিল। ভাল করিয়া সব পকেটগুলি দেখিল। পাশের পকেটে খুচরা পয়সাগুলি ছিল, গুনিয়া দেখিল সেই তের আনা পয়সাই আছে। কিন্তু টাকাগুলির কোনও চিহ্ন নাই। হাতের মধ্যে টিকিটটা ধরা ছিল বলিয়া সেইটি বাঁচিয়া গিয়াছে।

যে পথে সে প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়াছিল সেই পথটি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, যদি কোথাও পড়িয়া গিয়া থাকে। ফটকের কাছে গিয়াও ভিড়ের মধ্যে যতটা সম্ভব পায়ের ফাঁক দিয়া দেখিবার চেষ্ট করিল। তাহার পর ব্যাকুলভাবে ঠিক পাশেই যে টিকিট কলেক্টারটি ছিল, তাহাকে কহিল, আমার পকেট মারা গেছে, এইমাত্র।

সে একটুও বিচলিত না হইয়া প্রশ্ন করিল, কত ছিল?

অমল জবাব দিল, পাঁচ টাকা।

সে তাচ্ছিল্যের সুরে কহিল, ও, সরি! সাবধান করে রাখতে না পারলেই যায়।

আর একটি টিকিট কলেক্টার ইতিমধ্যে আসিয়া জুটিল। তার পর আর একটি।

কি হয়েছে হে সাণ্ডেল?

আগেকার টিকেট বাবুটি জবাব দিল, এঁর পকেট মারা গেছে।

কত টাকা?

পাঁচ টাকা।

প্রশ্নকর্তা একবার অমলের আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া কহিল, নতুন বুঝি কলকাতায় ?

অমল কতকটা ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, আজ্ঞে হাঁ।

তা হ'লে ত হবেই। ওরকম হামেশাই হচ্ছে, একটু সাবধানে রাখতে হয়, টাকাকড়ি।

তৃতীয় ব্যক্তিটি চুপ করিয়া ছিল এতক্ষণ, এইবার আড়চোখে চাহিয়া বলিয়া বসিল, টাকা ছিল তো পকেটে ?

সাণ্ডেল কৃত্রিম ভৎ'সনার স্বরে জবাব দিল, ওয়েল, ওয়েল, দ্যাট্‌স্ ব্যাড।

ভদ্রলোক টিকিট কিনেছেন দেখছ, টাকা ছিল না বলতে চাও ? যাই হোক, ইফ ইউ লাইক, পুলিশে ইনফর্ম করতে পারেন, তবে তাতে যে ফল হবে, এমন কোনও অ্যাশুর‍্যান্স দিতে পারি না।

অমল সেখান হইতে সরিয়া পড়িল। পুলিসে সংবাদ দিলে ফল যে কি হইবে তা তাহার জানাই ছিল, মিছামিছি পাটনার ট্রেনটিও হয়তো চলিয়া যাইবে। ইহারই মধ্যে ফিরিয়া যাওয়ার সম্ভাবনাটা সে মনে মনে ভাবিয়া লইল ; কিন্তু মেসের ম্যানেজারের ক্রুদ্ধ মুখ, অন্যান্য অধিবাসীদের বিদ্রূপের দৃষ্টি মনে পড়িয়া যাওয়ায় সে চিন্তা সে একেবারেই ত্যাগ করিল। তা ছাড়া খাইবেই বা কি ? আরও এক মাস কাটিবার পূর্বে মাহিনা পাইবার সম্ভাবনা নাই ! ভিক্ষা যদি করিতে হয় বিদেশে গিয়া করাই ভাল।

অগত্যা সে অবসন্ন মনে ট্রেনের দিকেই অগ্রসর হইল। কিন্তু ট্রেনের অবস্থা দেখিয়া তাহার মুখ আবারও শুকাইয়া উঠিল। থার্ড ক্লাশ কামরাগুলি মানুষে ও মালে বালিসে তুলা ঠাসার মত বোঝাই হইয়া আছে ; এবং প্রত্যেক গাড়ির দ্বারের সামনে তখনও রীতিমত মারামারি চলিতেছে ! সে এদিকের ট্রেনে কখনও আসে নাই, নহিলে বুঝিত যে যতগুলি লোক যাইবে, ঠিক ততগুলি কিংবা আরও বেশী লোক তাহাদের তুলিয়া দিতে আসিয়াছে, সুতরাং

কোনও রকমে পথের গণ্ডীটা ছাড়াইতে পারিলে ভিতরে বসিবার স্থান মিলিতে পারে।

অবশ্য সে যে কোথাও উঠিবার চেষ্টা করিল না তাহা নয়, কিন্তু কোথাও বিপুলদেহ পাঞ্জাবী, কোথাও ষণ্ডামার্ক হিন্দুস্থানী, কোথাও বা হাফপ্যাণ্ট পরিহিত বাঙ্গালীরা পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কোনও অর্বাচীন উঠিবার চেষ্টা-মাত্র করিলেই তাঁহারা চক্ষু রক্ত-বর্ণ করিয়া বলিতেছেন, আরে, কাঁহা উঠতা হ্যায়, দেখতা নেই হামলোক খাড়া হোকে যাতা হ্যায় ?

কেহ হয়তো বিনয় করিয়া বলিতেছে, থোড়া উঠনে দিজিয়ে, হামলোক খাড়া হোকে যায়গা—

তাহার জবাবে ধাক্কা দিয়া তাহাদের সরাইয়া দিয়া জানানো হইতেছে যে, খাড়া হোনেকো ভি জায়গা নেহি, কেয়া বাউরা আদমী হ্যায় ই সব! বাত মানতা নেহি।

যাহারা কোনও গতিকে নিজেরা ঢুকিতে পারিতেছে, তাহারা গাড়িতে উঠিবা-মাত্র ওই দলে মিশিয়া যাইতেছে এবং প্রবেশ পথ রোধ করিবার চার্জটা তাহাদের হাত হইতে বুঝিয়া লইয়া কিছুক্ষণ পূর্বেকার সমধর্মীদের চক্ষু দ্বিগুণ রক্তবর্ণ করিয়া তাড়না করিতেছে।

যাহাই হউক, বার চারেক সমস্ত ট্রেনের সামনেটা ঘুরিয়া আসিয়া প্রায় ট্রেন ছাড়িবার পূর্ব মুহূর্তে একটা গাড়িতে সে মরিয়া হইয়া উঠিয়া পড়িল।

সামনের লোকগুলি যথারীতি হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল। কেহ কহিল, দরজাটা খুলতে দিলে কেন? কেহ কহিল, ওধারে দেদার গাড়ি খালি পড়ে আছে, সেখানে কেউ যাবে না! কেহবা বলিল, চড়ছেন কোথায় মশাই, মাথার ওপর বসে যাবেন নাকি? কেহ বিশুদ্ধ হিন্দী বাত ছাড়িল, নিকাল দেও না উসকো—

কিন্তু অমল তখন উঠিয়া পড়িয়াছে। কোনও রকমে কনুই-এর গুঁতা দিয়া উঠিয়া ঠেলিয়া-ঠুলিয়া একটু জায়গা করিয়া লইয়া সে দাঁড়াইল। ততক্ষণে ট্রেনও

ছাড়িয়া দিয়াছে। কামরাটি বড়, সেই অনুপাতে লোকও কম নয়। ওধারের দুটি বেঞ্চের মাঝে খানিকটা জায়গা মাল বোঝাই করিয়া তাহার উপর বিছানা বিছাইয়া জনকতক মাড়োয়ারী মহিলা পুত্র-কন্যা লইয়া বসিয়াছেন। সকলেরই মুখে ঘোমটা কিন্তু বুক ও পেটের অনেকখানেই অনাবৃত। তাঁহাদের পুরুষগুলি বেঞ্চি-দুইটির সামনের দিকে বসিয়া মহড়া সামলাইতেছেন, অর্থাৎ ভিতরের স্থানে কেহ যাহাতে নজর না দেয় সে সম্বন্ধে নানা প্রচেষ্টা করিতেছেন। তিন চারিটিতে মিলিয়া বৃদ্ধ যুবা নির্বিশেষে গাঁজা খাইতেছে এবং অবিরাম বকিতেছে। কামরার মধ্যে অন্য অধিবাসী আছে কি না এবং কি তাহাদের অবস্থা সে সম্বন্ধে কোন দুশ্চিন্তা তাহাদের নাই, প্রত্যেকেই অপরকে নিজের বক্তব্য দ্রুত কণ্ঠে বলিয়া যাইতেছে।

তাহাদের পাশের বেঞ্চ-জোড়াটিতে কয়েকটি গুজরাটি মালপত্র লইয়া বহু আগে হইতে দখল করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি কয়েকটি কাবুলী হুড়মুড় করিয়া তাহাদের ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। ফলে একজনের রসগোল্লার হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে এবং আর একজনের ফাইবারের স্যুটকেশটা যে আকৃতি ধারণ করিয়াছে তাহার বর্ণনা না করাই ভাল। উভয়পক্ষই হিন্দীতে ঝগড়া চালাইতে গিয়া বিপন্ন হওয়ায় বিবাদটা প্রায় হাতাহাতির কাছে আসিয়া পৌছিয়াছে। এধারের ছোট বেঞ্চগুলির দুইটিতে কয়েকটি পশ্চিমা মুসলমান প্রচুর মালপত্র এবং অত্যন্ত দুর্গন্ধময় মলিন কাপড়-চোপড় লইয়া উঠিয়াছে এবং ইতিমধ্যেই একটা ন্যাকড়া বিছাইয়া খবরের কাগজে জড়ানো মোটা রুটি কাঁচা রশুন সহযোগে খাইতে শুরু করিয়াছে। আর দুটিমাত্র বেঞ্চির একটিতে গুটি-দুই শিখ ও জন-দুই সাঁওতাল অতিকষ্টে ঠাসাঠাসি করিয়া কোনও মতে বসিয়াছে এবং আর একটি একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক স্ত্রী ও কন্যা লইয়া দখল করিয়াছেন। মধ্যের গমনাগমনের স্থানটি, একে মাল বোঝাই তাহার উপর পাচ ছয়জন বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ভিতরের আবহাওয়াকে অন্ধকূপ করিয়া তুলিয়াছেন।

বলা বাহুল্য গাড়িতে উঠিয়া তাহার অভ্যন্তর ভাগের অবস্থাটা দেখিয়া লইতে অমলের বেশী দেরি লাগিল না। কাবুলীদের গাত্রবাসের সৌরভ, গাঁজার ধোঁয়া এবং রসুনের গন্ধ সমস্তটা মিলিয়া ভিতরের হাওয়াটাকে এমনই জঘন্য করিয়া তুলিয়াছে যে, মিনিটখানেকের মধ্যেই তাহার গা বমি বমি করিতে লাগিল; সে বারকতক এদিক ওদিক চাহিয়া নড়িবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া ঠিক দ্বারের পাশেই বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির বেঞ্চে যে ইঞ্চি তিনেক স্থান ছিল, সেইখানে কোন-মতে অঙ্গ ঠেকাইয়া বসিয়া পড়িল।

ভদ্রলোক গৃহিণীকে কোণ দিয়া, মেয়েটিকে মধ্যে শোয়াইয়া নিজে শেষের দিকে বসিয়া বেঞ্চটাকে একরকম রিজার্ভ করিয়াই লইয়াছিলেন; সহসা এই উপদ্রবে তিনি দারুণ চটিয়া গেলেন! মুখ চোখ রক্তবর্ণ করিয়া কহিলেন, কি রকম অসভ্য লোক হে তুমি ছোকরা? বলা-কওয়া নেই, ভদ্রলোকের মেয়েছেলেদের ঘাড়ের উপর এসে বস?

অমল যদিও হাওড়া ষ্টেশন এবং পশ্চিমের গাড়ি ইতিপূর্বে কখনও চোখে দেখে নাই, তাহার হতভম্ভ হইয়া যাওয়ারই কথা, কিন্তু গত এক ঘণ্টাকাল উপর্যুপরি লাঞ্ছনায় সে মরিয়া হইয়া গিয়াছিল, ইতিমধ্যেই বুঝিয়াছিল যে, এই কঠিন স্থানে বিনয়ের অবসর নাই, এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় চোখ-রাঙানির জোরে!

সে জবাব দিল, আপনি কি মেয়েছেলে? কই, সে রকম তো মনে হয় না!

ভদ্রলোক প্রায় ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন, উচ্চৈস্বরে জবাব দিলেন, কী, আমাকে আবার ঠাট্টা? ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইতে জান না? এ বেঞ্চে মেয়েছেলে নেই?

অমল এবার রীতিমত ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল, মেয়েছেলে আছে তো কি হয়েছে? তাকে আড়াল করে আপনি তো বসে আছেন! তাতেও কি ছোঁয়াচ লাগে? অতই যদি সম্ভ্রম-বোধ তো মেয়ে-গাড়িতে দেন নি কেন?

ভদ্রলোক রাগের চোটে এবার তোৎলা হইয়া গেলেন, কহিলেন, তু—তুমি কার স—সঙ্গে ক—কথা কইছ, জানো? অসভ্য, জানোয়ার কোথাকার!

অমল জবাব দিল, তা জানিনে, তবে ভদ্রলোক নিশ্চয়ই নন! আপনি আমাকে 'তুমি' বলেন কোন্ সাহসে? আমিও থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনেছি, আপনিও তাই। আমি আপনার কাছে ভিক্ষেও চাই নি, চাকরিও করি না, তবে কোন্ অধিকারে আমায় 'তুমি' বললেন শুনি?

গাড়ির লোকেরা মজার গন্ধ পাইয়া ঝুঁকিয়া পড়িল। এমন কি ওধারের গুজরাটী ও কাবুলীর বিবাদও যেন এই গোলমালে দ্রুত মিটিয়া আসিল। ভদ্রলোক কিন্তু এইবার কিছু দমিয়া গেলেন। সহসা তাঁহার মুখে কথা জোগাইল না, প্রায় মিনিট-খানেক অমলের দিকে চাহিয়া থাকিয়া তিনি অন্য পথ ধরিলেন, কহিলেন, জান আমি বঙ্গবাসী কলেজের প্রফেসর?

অমল কখনও বঙ্গবাসী কলেজের অঙ্গনে পর্যন্ত পা দেয় নাই, কিন্তু কি রকম তাহার মাথায় রোখ চাপিয়া গেল কে জানে, সে জোর করিয়া কহিল মিছে কথা। আমি নিজে বঙ্গবাসী কলেজে পড়ি, আপনাকে সেখানে কখনও দেখি নি।

সে ভদ্রলোক এতটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না, ভাবিয়াছিলেন যে, একথার পরে আর ছোঁড়াটা কথা কহিতে পারিবে না। এইবার তিনি রীতিমত নরম হইয়া গেলেন। একটু পরে ঢোঁক গিলিয়া কহিলেন, আমি ঠিক নই, তবে আমার দাদার ভায়রা ভাই যে ও কলেজে পড়ায় এটা তো সত্যি কথা!

অমল অতিকষ্টে হাসি দমন করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তিনিও আর কথা কহিলেন না।

গাড়ি হু-হু করিয়া একটির পর একটি ষ্টেশন ফেলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই মধ্য দিয়া বাঙলার বাঁশঝাড়, কুটীর ও পানাপুকুরের যেটুকু ছবি চোখে পড়িতেছিল, অমল একদৃষ্টে যেন তাহা পান করিতেছিল। দেশ ছাড়িবার পর বহু দিন এ দৃশ্য আর তাহার নজরে পড়ে নাই, আজ এতদিন পরে যদিবা তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল, নিজের অবস্থার কথা। সহায়-সম্বলহীন হইয়া সে অকূলে ভাসিল, বহুদিন—হয়তো বা চিরকালের জন্য—সে চিরপরিচিত বাঙলাদেশকে ছাড়িয়া চলিল; হয়তো আর কখনই এই সবুজ

কলাগাছের পাতা, এই নারিকেল বন, এই নিবিড় শ্যামলতা সে এমন করিয়া দেখিতে পাইবে না।

৫

বাহিরের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে বোধ করি তন্দ্রাই আসিয়াছিল, সহসা চমক ভাঙিল পাশের ভদ্রলোকটির ডাকে—

ও মশাই, শুনছেন ?

মশাই ? তবে কি সে ভুল শুনিতেছে ? অমল বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, জবাব দিতে পারিল না।

তিনি পুনশ্চ কহিলেন, রাগের মাথায় কি বলতে কি ব'লে ফেলেছি ভাই, রাগ করবেন না যেন।

অমলের বিস্ময়ের পরীসীমা রহিল না। কিন্তু তবুও সে যতদূর সম্ভব মনোভাব দমন করিয়া সৌজন্য দেখাইয়া কহিল, না না সে কি কথা। ও-সব মনে ক'রে সঙ্কোচ বোধ করবেন না।

তিনি গলার স্বর অকারণে খাটো করিয়া কহিলেন, আমার নাম শ্রীভবেশচন্দ্র দাস ঘোষ, মহাশয়ের নাম ?

অমল নাম বলিল। তিনি কহিলেন, ব্রাহ্মণ ? প্রাতঃপ্রণাম। আপনার বসতে বোধ হয় খুবই কষ্ট হচ্ছে, একটু স'রে এসে ভাল ক'রে বসুন !

বলা বাহুল্য, অমল এ সুযোগের অসদ্ব্যবহার করিল না। সে যতটা স্থান অধিকার করিয়া বসা সম্ভব, ততটাই দখল করিল। একটু পরে ভবেশবাবু কহিলেন, কতদূর যাওয়া হবে ?

পাটনা। আপনি ?

আমি যাব দারভাঙ্গা। মোকামাঘাটে নামব। সেখানে আমার মামাশ্বশুর থাকেন, মহারাজের দপ্তরের বড় চাকুরে।

অমল বুঝিল এইদিকে তাঁহার একটু দুর্বলতা আছে ; সে চুপ করিয়া রহিল এবং মনে মনে প্রাণপণে ভবেশবাবুর ভাব পরিবর্তনের কারণ চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু বেশীক্ষণ তাহাকে ভাবিতে হইল না, একটু পরে ভদ্রলোক নিজেই কারণটা ব্যক্ত করিলেন। গলা নীচু করিয়া চুপিচুপি কহিলেন, আচ্ছা, ওই কাবলীগুলো কি-রকম করে চাইছে দেখছেন আমার দিকে ? ওরা ডাকাত নয়তো ?

অমল বিস্মিত হইয়া জবাব দিল, ডাকাত ? ডাকাত কেন হবে ? আর হ'লেই বা আপনার দিকে বিশেষ করে চাইবে কেন ?

তিনি আরও ফিস ফিস করিয়া কহিলেন, কারণ আছে ; আমার কাছে অনেকগুলো টাকা রয়েছে, প্রায় চারশ' টাকা !

অমল মৃদু হাসিয়া কহিল, চার শ' টাকার জন্যে কেউ ডাকাতি করে না, অন্ততঃ ট্রেনে।

না, করে না ! জানেন পঁচিশটা টাকার জন্যে ডাকাতি করে।

আর কথা না বাড়াইয়া অমল কহিল, তা ছাড়া আমরা একগাড়ি লোক রয়েছি, ডাকাতি অমনি করলেই হ'ল ?

ভবেশবাবু অগত্যা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু একটু পরেই আবার কহিলেন, এক্সারসাইজ করেন ? ব্যায়াম ?

অমল কহিল, না। কিন্তু এমনিই গায়ে যথেষ্ট জোর আছে।

ছাই আছে ! ও জোরে কিছু হয় না। পারবেন কাব্‌লের সঙ্গে লড়াই করতে ? ঐ ক'রেই তো বাঙালী জাতটা মরতে বসেছে।

আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ ! তার পর সহসা বাহুমূলে সজোর চিমটি খাইয়া অমল সচকিত হইয়া উঠিল ভবেশবাবু ফিসফিস করিয়া কহিলেন, মশাই সামনের বেঞ্চির মোচলমানগুলো কি করে চাইছে এদিকে দেখছেন ? নিশ্চয় ওদের সঙ্গে ওই কাব্‌লেগুলোর ষড় আছে।

ওপাশের বেঞ্চির মুসলমানগুলি সত্যই এদিকে চাহিতেছিল, কিন্তু সে

ভবেশবাবুর জন্য নয়। ভবেশবাবুর দিকেই বর্ধমান ষ্টেশনের প্লাটফর্ম পড়িয়াছিল, তাহাদের দৃষ্টি ছিল প্লাটফর্মের উপর অসংখ্য ফেরিওয়ালার খাদ্যসম্ভারের দিকে।

অমল সেই কথাই ভবেশবাবুকে বুঝাইতে গেল। কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন সত্যসত্যই তাহারা জন-তিনেক একটা মিঠাইওয়ালা ডাকিয়া অন্য যাত্রী মারফৎ মিহিদানা কিনিল, তখন তিনি অগত্যা চুপ করিলেন।

ক্রমশঃ রাত্রি গভীর হইল, গাড়ি সুদ্ধ সব ঢুলিতে শুরু করিয়াছে, অমলও বসিয়া বসিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; তাই গাড়ি কখন যে আসনসোলের কাছাকাছি আসিয়াছিল, তাহা সে টের পায় নাই, সহসা এক প্রবল ঝাঁকুনিতে সে উঠিয়া বসিল; এবারেও ভবেশবাবু!

মশাই দেখছেন একবার কাণ্ডখানা! সবাই ঘুমুচ্ছে, আর ও ব্যাটা ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। তবু আপনি বলবেন ও ব্যাটারা ডাকাত নয়?

অমল চারিদিকে চাহিয়া দেখিল যে, একটি কাবুলীর বোধ করি ঘুম আসে নাই; সে তাহাদেরই দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। এবার সে বিরক্ত হইয়া কহিল, কেন মিছিমিছি ব্যস্ত হচ্ছেন আপনি; বলছি তো যে ডাকাতি করা অত সহজ নয়!

ভবেশবাবু তাহার ঝাঁজ লক্ষ্য করিয়া আর কিছু বলিলেন না, কিন্তু সে শান্তি যে ক্ষণিক, তাহা অল্পক্ষণ পরেই বোঝা গেল। ততক্ষণে আসনসোল ষ্টেশনে গাড়ি আসিয়াছে, ভবেশবাবু প্লাটফর্মের দিকে মুখ বাহির করিয়া একাগ্রদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন এবং একটু পরেই একজন টিকিট কলেক্টারকে দেখিয়া রীতিমত চেঁচামেচি করিয়া উঠিলেন, ও মশাই শুনছেন, ও মশাই—

টিকিট কলেক্টারটি কাছে আসিতে কহিলেন, মশাই এ গাড়িতে একদল ডাকাত যাচ্ছে, পুলিশে ইনফর্ম করুন।

টিকিট কলেক্টার ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কিছু নিয়েছে?

ভবেশবাবু কহিলেন, নেয় নি কিছু, কিন্তু নেবার চেষ্টা করেছ। আমার কাছে অনেকগুলো টাকা আছে, সেইজন্য ওরা দল পাকিয়ে এই গাড়িতেই উঠেছে; বার বার আমাদের দিকে চাইছে, আর নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে।

টিকিট কলেক্টার জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে অমলের দিকে চাহিতে সে ভবেশবাবুর অলক্ষ্যে নিজের মাথাটা দেখাইয়া দিল। তিনি ইঙ্গিতটা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন, থাক, এখনও কিছু নেয়নি তো? আপনি চুপচাপ শুয়ে থাকুন, ডাকিতে যখন করবে, তখন গার্ডকে জানাবেন কিংবা পরের ষ্টেশনের মাষ্টারকে—চাইকি চেন ধরেও টানতে পারেন।

তিনি চলিয়া গেলেন। ভবেশবাবু কিছুক্ষণ গুম্ হইয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, সব ব্যাটাদের নামে রিপোর্ট ক'রে দেব। তা নইলে জব্দ হবে না। পাবলিকের টাকা খেয়ে পাবলিককেই হেনস্তা— ?

অমল তাঁহার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া পুনরায় তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। এবার ঘুম ভাঙ্গিল একেবারে মোকাগাঘাটে। তখন সকাল হইয়াছে, ভবেশবাবু মালপত্র বারবার গুনিয়া মুটের মাথায় চাপাইতেছেন। চারিদিকে কোলাহল, বহু লোক নামিতেছে, উঠিতেছে। ভবেশবাবুরও রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে যেন ভয়-ডর সব চলিয়া গিয়াছে; তিনি প্রচুর হাঁক ডাক করিতেছেন। অমল চোখ মেলিয়া চাহিতেই একেবারে আত্মীয়তার স্বরে কহিলেন, তুমি এবার বেশ হাত-পা মেলে ব'স ভাই, সারা রাত কষ্ট হয়েছে।

তাহার পর সহসা ফিরিয়া কহিলেন, পাটনায় কি জন্যে যাচ্ছ, বললে না তো?

অমল একটুখানি ইতস্তত করিল, তাহার পর কথাটা বলিয়াই ফেলিল, আজ্ঞে কাজকর্মের চেষ্টায়।

তখন ভবেশবাবু নামিয়াই পড়িয়াছেন। তিনি মুখ ফিরাইয়া কহিলেন, বাঁকিপুরের কদমকুঁয়ায় আমার এক ভায়রা থাকেন, কোন ইস্কুলের হেডমাষ্টার, তার সঙ্গে দেখা করতে পার, ভুবনবাবু তাঁর নাম।

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। ততক্ষণে তাহার কামরা অনেক খালি হইয়া গিয়াছে; হাত-পা মেলিয়া সে শুইয়া পড়িল। বহুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া তাহার মেরুদণ্ডে যন্ত্রণা শুরু হইয়াছে, হাত-পা কনকন করিতেছে; শুইয়া একটু আরাম হইল বটে, কিন্তু ঘুম আর আসিল না। গত রাত্রের সামান্য খাদ্য বহুক্ষণ পরিপাক হইয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় এখন যে তাহার নাড়ীতে পাক দিতেছে। কিন্তু পকেটে সামান্য কয়েক আনা পয়সা সম্বল, খাবার কিনিয়া খাইতে তাহার সাহস হইল না। পাটনায় গিয়া কোথায় আশ্রয় পাইবে, কত দিনে পাইবে কিছুই জানা নাই, কোনও পরিচিত লোক পর্য্যন্ত সেখানে নাই। কাজ যদি না জোটে তো সত্য-সত্যই ভিক্ষা করিতে হইবে, কিংবা শেষ পর্য্যন্ত নাটকীয়ভাবে আত্মহত্যা।

এমনিই সব এলোমেলো কথা ভাবিতে ভাবিতে কোন এক সময়ে দেখা গেল গাড়ি পাটনা জংশনে আসিয়া থামিয়াছে। অমলের এই প্রথম বিদেশে আসা নয়, কলিকাতায় যেদিন প্রথম আসে, সেদিনই সে অভিজ্ঞতা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তবুও সে খানিকটা বিহ্বলভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। চারিদিকের এই অপরিচিত জনতা আজ তাহার চোখে একান্ত নির্মম বলিয়া বোধ হইল। ইহাদের কাছ হইতে কোনও প্রকার দয়ামায়া পাইবার আশা তাহার নাই।

মিনিট পাঁচেক পরে সে অবশিষ্ট যাত্রীদের পিছনে পিছনে পুল পার হইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিল। তার পর এক্কাওয়ালা ও বাসওয়ালাদের ভিড় ঠেলিয়া শেষ পর্য্যন্ত শহরেও পৌঁছিল। জন তিন-চার লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া কদমকুঁয়ার পথ ঠিক করিয়া জানিয়া লইল। সেখানে গিয়াই যে কি করিবে, কোথায় কাহার কাছে কী সাহায্য চাহিবে, সে ধারণা তাহার মাথার মধ্যে ছিল না—কিন্তু তবুও এই সম্পূর্ণ অপরিচিত স্থানে যাহা হউক একটি মাত্র লোকের সন্ধান যখন পাওয়া গিয়াছে, তখন সেইটিকেই সে প্রাণপণে অবলম্বন করিল।

কদমকুঁয়ার ভুবনবাবুর বাসা খুব অপরিচিত নহে, একটি ভদ্রলোককে প্রশ্ন করিবামাত্র তিনি বলিয়া দিলেন। সে কম্পিতবক্ষে বাড়িটির বাহিরে আসিয়া

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল। সাধারণ একটি দোতলা বাড়ি, সম্মুখে একটুখানি মাত্র হাতা। কিন্তু ইতস্তত করা তাহার সেজন্য নয়, বাগানের সামনেই বারান্দায় খুব সম্ভব গৃহস্বামী নিজে বসিয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিয়াই সে চুপ করিয়া দাঁড়াইল। প্রথমে গিয়াই কি বলিবে, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিল না। অন্য কোনও সাহায্যের কথা বলিবে, না সোজাসুজি চাকুরির কথা পাড়িবে, মিনিট খানেক সেই কথা চিন্তা করিয়া শেষে একপ্রকার মরিয়া হইয়াই ঢুকিয়া পড়িল।

অত্যন্ত ক্ষীণজীবী একটি ভদ্রলোক, দেখিলেই মনে হয়, বছর ত্রিশেকের ডিস্‌পেপসিয়া তাঁহার দেহে পোষা আছে, নাকে চশমা লাগাইয়া একটা বেতের চেয়ারে বসিয়া কাগজ পড়িতেছেন। অমল শুষ্কমুখে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইবামাত্র তিনি কাগজ হইতে মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন, কোন্ সাবজেক্টে ফেল করেছ? এত দেরিই বা কেন?

অমল প্রথমটা কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া চাহিয়া থাকিয়া কহিল, আজ্ঞে ফেল তো করি নি!

ভুবনবাবু অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। কহিলেন, ফেল কর নি কি রকম? একজামিনাররা সব অমনি অমনি ফেল করিয়ে দিলে বুঝি? হিংসে ক'রে?

অমল আরও আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বার-কতক ঢোঁক গিলিয়া বলিল, তারাও ফেল করান নি তো!

ভুবনবাবু ধমক দিয়া বলিলেন, ইডিয়ট! তুমিও ফেল করনি, একজামিনাররাও ফেল করিয়ে দেন নি, তবে তুমি আবার ভরতি হ'তে এসেছ কেন শুনি?

অমল ঘামিয়া নাহিয়া উঠিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তাহার সৌভাগ্যক্রমে ওধারের চিকের পর্দাটা সরাইয়া দালানে প্রবেশ করিলেন, ভুবনবাবুর স্ত্রী। মাষ্টার মহাশয় যেমন রোগা, তাঁহার গৃহিণী তেমনি মোটা। অমল মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, অন্তত সাড়ে তিন মনের কম হইবে না। গৌরবর্ণ, মুখশ্রী ভাল, চশমার মধ্য দিয়া চোখ দুটি ডাগরই দেখায়, কিন্তু বিপুল মেদভারে তাঁহার

সমস্ত শ্রী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ভদ্রমহিলার ধোপদস্ত শাড়ির দিকে চাহিলে মনে হয় না যে, কখনও তিনি নড়িয়া কোনও কাজ করেন, কিন্তু গলার স্বর তাঁহার সর্ব্বদাই ক্লান্ত, কথা শুনিলে বোধ হয় সারাদিন ধরিয়া বিশ্বের সমস্ত কাজ করিবার ভার দেওয়া হইয়াছে ওই একটিমাত্র মানুষকে!

তিনি কহিলেন তোমার যত বয়স বাড়ছে, তত ভীমরতি ধরছে নাকি? দুনিয়ার সব মানুষ কি তোমার কাছে আসে শুধু ইস্কুলের কাজে? খামকা একটা লোককে ধমকাচ্ছ কেন? কি কাজে, কেন এসেছে খোঁজ কর আগে!···খালি ইস্কুল, আর ইস্কুল! তোমার ইস্কুলের জ্বালায় আমায় একদিন আত্মহত্যা করতে হবে, এ আমি বেশ জানি!

আঘাত পাইবামাত্র মুহূর্ত মধ্যে কচ্ছপ যেমন হাত-পা গুটাইয়া খোলার মধ্যে প্রবেশ করে, স্ত্রী বাহির হওয়া মাত্র মাষ্টার মহাশয়ের সমস্ত বিক্রম তেমনি করিয়া হাত-পা গুটাইয়া তাঁহাকে বেতের চেয়ারের মধ্যে যেন আরও কুণ্ডলী পাকাইয়া দিল। ভয়ে ভয়ে মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, তা, তা, তবে ও কি জন্যে এসেছে?

মাষ্টার-পত্নীর ক্লান্ত স্বর আবার ফিরিয়া আসিল; কহিলেন, কি জন্যে এসেছেন, খোঁজ কর না?

তার পর তিনি নিজেই একটা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িয়া প্রশ্ন করিলেন, কি চান আপনি?

অমল ততক্ষণে প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়াছে; সে কোনমতে মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, আমি কাজের জন্য এসেছিলুম।

কাজ!

মাষ্টার পত্নীর নাসিকা কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। ভুবনবাবুও এতক্ষণে আবার সোজা হইয়া বসিলেন, কহিলেন, কাজ? কাজ কি আর বাঙালীর পাবার জো আছে? ইন্সপেক্টারের হুকুম, সমস্ত কাজেই বিহারীকে রাখতে হবে। এমন-কি, মাষ্টার পর্যন্ত বাঙালী রাখতে গেলে, অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয়। তা নইলে—

ভুবনবাবুর স্ত্রী আবার ধমক দিলেন, ফের ইস্কুল !···তা কি চাও ?

তিনি অমলের দীন বেশভূষা ও শুষ্কমুখ দেখিয়া এবং কাজের কথা শুনিয়া 'আপনি' হইতে 'তুমি' করিয়া ফেলিলেন।

অমল ঘাড় হেঁট করিয়া সহসা জবাব দিল, আজ্ঞে, আমি রান্নার কাজ কিছু কিছু জানি।

সহসা ভুবনবাবুর স্ত্রী সোজা হইয়া বসিলেন, জান রান্নার কাজ ? সত্যিই জান ? কি জাত তুমি ?

অমল পৈতাটা জামার মধ্য হইতে বাহির করিয়া দেখাইল ; তার পর কহিল, খুব ভাল জানি না, তবে আপনারা দেখিয়ে শুনিয়ে দিলে পারি হয়তো।

ভুবনবাবুর স্ত্রী একটা আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, বাঁচালে বাবা তুমি ! বাবাজীটা কাল হঠাৎ অসুখ ক'রে বাড়ি চ'লে গেল, কি বিপদে যে পড়েছিলুম বলবার কথা নয়। ছেলেমেয়ে নিয়ে আটজন লোক, দুবেলা রান্না কি সোজা কথা ? আজই তো হাঁপিয়ে উঠেছিলুম। তাহ'লে তুমি যাও, স্নান-টান ক'রে নাও, আজ রবিবার ব'লে এখনও রান্না চাপেনি, তুমিই চাপিয়ে দাওগে। পান্নুকে ডাকছি, সব দেখিয়ে দিক।

ভুবনবাবু বহুক্ষণ চুপ করিয়াছিলেন, এইবার ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিলেন, কোথায় ওর বাড়ি, কি বৃত্তান্ত কিছুই খোঁজ নিলে না, এখানে কেউ চেনে কি না—

পাছে ঠাকুরটি হাতছাড়া হইয়া যায় এই ভয়ে মাষ্টারপত্নী রাজবালার ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল কিন্তু ভুবনবাবুর কথাগুলি নাকি অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত তাই তিনি কথা কহিতে পারিলেন না ; অমলের মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে খানিকটা মাথা চুলকাইয়া জবাব দিল, বাড়ি আমার বাংলা দেশেই। কলকাতায় অনেক দিন ছিলুম।

রাজবালা কহিলেন, এখানে সংবাদ দিলে কে ?

ভুবনবাবু কহিলেন, কোনও ইস্কুলের মাষ্টার-টাষ্টার বোধ হয়, কিংবা কোনও ছাত্র।

আবার ইস্কুল !

ভুবনবাবু ভয়ে চুপ করিয়া গেলেন। অমল কহিল, ভবেশবাবু আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে চেনেন।

রাজবালা যেন ধড়ে প্রাণ পাইলেন। কহিলেন, হ'ল তো? জামাইবাবু চেনেন, তিনিই পাঠিয়েছেন। তোমার সব তাতেই—

৬

অর্থাৎ অমল বাহাল হইল।

চাকর পান্নু কলঘর দেখাইয়া দিল, তার পর রান্নাঘর। উনানে সকালেই আগুন পড়িয়াছিল, খুব সম্ভব চায়ের জন্য; কিন্তু গৃহিণীর অত্যধিক আলস্যবশত তাহাতে বার-দুই-তিন শুধু কয়লাই পড়িয়াছে, রান্না এখনও চাপে নাই।

একে অচেনা ঘর, তাহাতে ঠিক রান্না করা বলিতে যাহা বোঝায় রীতিমতভাবে তাহা অমল কখনও করে নাই। সুতরাং সে অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। ব্যাপার যতটা সহজ বলিয়া পূর্বে বোধ হইয়াছিল এখন আর ততটা সহজ লাগিল না। কিন্তু একটু পরেই স্বয়ং রাজবালা আসিয়া রান্নাঘরের রোয়াকে বসিয়া তাহাকে রক্ষা করিলেন। তিনি মিনিটখানেক এটা-ওটা নির্দেশ দিয়াই বলিয়া উঠিলেন, ও হরি, তুমি যে কিছুই জাননা দেখছি !

কিন্তু তিনি তাহাতে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল না, বরং তাঁহাকে যে উনানের ধারে গিয়া আগুন-তাত সহ্য করিতে হইল না, এই কৃতজ্ঞতায় তিনি ধৈর্য সহকারে বসিয়া বসিয়া সমস্তই দেখাইয়া দিলেন। এমন কি ছেলেমেয়েদের ও স্বামীর খাওয়ার সময়ও বসিয়া থাকিয়া কিভাবে পরিবেশন করিতে হয় তাহা বলিয়া দিলেন। অমল কোনও মতে সমস্ত কাজ সারিয়া বেলা তিনটার সময় আর একবার স্নান করিয়া নিজে দুইটি মুখে দিল। তার পর নিজের নির্দিষ্ট স্থানটিতে একটা মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল।

গত তিন-চার ঘণ্টার পরিশ্রমেই যেন তাহার দম বন্ধ হইয়া আসিয়াছিল, কি করিয়া যে এইখানে দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি কাটাইবে তাহা সে ভাবিয়া পাইল না। অথচ কপর্দক-শূন্য অবস্থায় এই আশ্রয় ও নিশ্চিন্ত আহার্য ছাড়িয়া অপর কোথাও যাইবার কথা পর্য্যন্ত সে কল্পনা করিতে পারিল না। এমনি একটা নিদারুণ মানসিক অবসাদের মধ্যেই তাহার চক্ষু দুইটি বুজিয়া আসিল।

বেলা পাঁচটা না বাজিতে বাজিতেই আবার তাহার ডাক পড়িল। চা করিতে হইবে, তৎসহ হালুয়া ও পাঁপর ভাজা; তার পর রাত্রির খাবার। একদিন সে ভাবিত যে তাহার বাবা মাসিক পঁচিশ টাকা মাহিনাতে গ্রামের মাইনর স্কুলে সারাজীবন কাটাইলেন কি করিয়া, আজ সে পাঁপর ভাজিতে ভাজিতে ভাবিতে লাগিল যে গ্রামের স্কুলের সে মাষ্টারিটা এখনও খালি আছে কি না, এবং কোনও মতে এখনও দেশে ফিরিয়া যাওয়া যায় কি না।

কিন্তু সে দুরাশা! এখনকার এই জীবনই তাহাকে যাপন করিতে হইবে। হউক তাহা কষ্টসাধ্য, কিন্তু নিরাপদ এবং নিশ্চিন্ত তো বটে।

দিন-দুই কাজ করিবার পরই অমল পরিবারটিকে চিনিয়া লইল। ভুবনবাবু বেচারী স্কুলের বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে পরিচিত হইবার কোনও সুযোগ জীবনে কখনও পান নাই, আর কিছুই তিনি জানেন না। তাঁহার নিজের অত্যাবশ্যক জিনিসগুলি সম্বন্ধেও তাঁহার ধারণা অস্পষ্ট। পরিধেয় পেণ্টুলুনটা ময়লা হইয়াছে, কি আরও একদিন তাহা পরিয়া স্কুলে যাওয়া যাইবে তাহা রাজবালাকে দেখাইয়া লইতে হইত, কবে তাঁহার শরীর খারাপ বোধ হইতে পারে এ কথাটা পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট হইতে না জানিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন না। কিন্তু পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যাপারে তিনি যতই দুর্বল হউন, স্কুলের ব্যাপারে তিনি অতিশয় দৃঢ় ছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে একটি দিনও যদি তিনি স্কুলে অনুপস্থিত থাকেন তো স্কুলটি সেই দিনই অচল হইয়া যাইবে এবং সেইটিই হইবে পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ঘটনা। সুতরাং তিনি রাজবালার সমস্ত অনুজ্ঞাই নির্বিচারে

পালন করিতেন, কেবল স্কুল কামাই করিবার কথা ছাড়া। ভদ্রলোক সংসার ও পৃথিবীর কোনও খবর রাখিতেন না। বাড়িতে যখন থাকিতেন, স্কুলের কাজেই ব্যস্ত থাকিতেন এবং কোনও লোক আসিলে তাহার বক্তব্য প্রায় জোর করিয়া থামাইয়া দিয়া স্কুলের উন্নতিকল্পে সম্প্রতি তিনি যে সব নূতন পরিকল্পনা করিয়াছেন, তাহাই শুনাইতে বসিতেন।

সুতরাং সংসার ও সাংসারিক যাহা কিছু, সে সকলেরই সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন রাজবালা। তিনি সত্য সত্যই অলস নন, স্বামী ও পুত্রকন্যার স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত ব্যবস্থাই সুচারুরূপে করিবার ক্ষমতা তাঁহার আছে। কিন্তু একটি মাত্র দুর্বলতাকে তিনি কিছুতেই ছাড়িতে পারেন না। সেটা তাঁহার আভিজাত্য প্রদর্শন। কদমকুঁয়ার অতি আধুনিকা অ্যাড্‌ভোকেট-পত্নীদের সহিত তাই সমানভাবে গলা মিলাইয়া ক্লান্ত স্বরে তাঁহাকে কথা কহিতে হয় এবং কিছুতেই তিনি রান্না ঘরে যাইতে চান না। শুধু তাহাই নয়, তাঁহার ছেলেমেয়েদের মানুষ করিবার যে প্রণালী তিনি অনুসরণ করেন তাহার মধ্যেও ওই শ্রেণীর আভিজাত্যের সুরই হইতেছে প্রধান।

ছেলেমেয়েদের সংখ্যা তাঁহার খুব কম নয়, সর্বশুদ্ধ সাতটি। বড় মেয়েটি ক্লাস নাইনে পড়ে, বয়স পনের-যোল, তাহার পরে তিনটি ছেলে ও তিনটি মেয়ে। সর্বকনিষ্ঠাটি দুগ্ধপোষ্য।

লোক বেশী হইলেও ঝঞ্ঝাট খুব বেশী নয়। কিন্তু আমাদের দেশে সাধারণ পারিবারিক যত্নের মধ্যে মানুষ হইয়াছে যে ছেলে এবং লেখাপড়া শিখিয়াছে, তাহার পক্ষে আগুনের তাতে গিয়া প্রত্যহ দুইবেলা রান্না, দশ-বারটি লোককে খাওয়ানো, অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তাহাও হয়তো সহ্য হইত কিন্তু তাহার সহিত রাজবালার আভিজাত্যের ঠেলা একেবারেই অসহ্য। কিন্তু দিন-পনের কাজ করিবার পরে, একমাসের মাহিনা হস্তগত হইবা-মাত্র কাজ ছাড়িবার একটা কল্পনা যখন মাথায় আনাগোনা করিতেছে, তখন সহসা এক অঘটন ঘটিয়া গেল। ব্যাপারটা বলি—

ভুবনবাবুর বড় মেয়ে জ্যোৎস্না একদিন ভিতরের উঠানে একটা টেবিলে বসিয়া পড়াশুনা করিতেছিল। সেই সময় একটা রান্না চাপাইয়া অমলও সেখানে পায়চারি করিতেছে হঠাৎ তাহার নজরে পড়িল জ্যোৎস্না অ্যাল্‌জেবরার সামান্য একটা প্রবলেম লইয়া হিমসিম খাইতেছে। অঙ্কশাস্ত্রটা অমলের কাছে চিরদিনই সহজ এবং প্রিয়। সুতরাং ঐ উত্তরটা বলিয়া দিবার জন্য সে যে চঞ্চল হইয়া উঠিবে, ইহা স্বাভাবিক। সে বহুক্ষণ নিজেকে সামলাইয়া রাখিয়া শেষ পর্যন্ত একসময়ে ভুলিয়া গেল যে সে পাচক-ব্রাহ্মণ মাত্র এবং জ্যোৎস্না বারে বারে যে ভুলটা করিতেছিল টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া এক সময় সেই ভুলটা আঙ্গুল দিয়া সে দেখাইয়া দিল।

জ্যোৎস্না কিছুক্ষণ হতভম্ব হইয়া অমলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল! তার পরই মুখে একটা অস্ফুট শব্দ করিয়া উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া বাহিরের ঘরে গেল। তখন ভুবনবাবু বসিয়া পরীক্ষার খাতা দেখিতেছিলেন এবং রাজবালা স্কুলেরই অপর একটি মাষ্টারের সহিত যতদূর সম্ভব ক্লান্তভাবে কথাবার্তা চালাইতেছিলেন। জ্যোৎস্না ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়াই কহিল, বাবা, আমাদের বামুনঠাকুর লেখা পড়া জানে।

রাজবালা কহিলেন, তা কি হয়েছে তাতে? তুমি অত হাঁপাচ্ছ কেন? আজকালকার দিনে একটু লেখাপড়া জানে না কে? মেথর মুদ্দোফরাশ পর্যন্ত আজকাল নাম সই করছে!

জ্যোৎস্না কহিল, একটু লেখাপড়ার কথা বলছি নাকি আমি! আমি একটা অ্যালজেবরার প্রবলেম কিছুতেই করতে পারছিলুম না, ঠাকুর মুখে মুখে বলে দিলে।

এবার সকলেই রীতিমত বিস্মিত হইলেন। এমন কি ভুবনবাবু পর্যন্ত তাঁহার পরীক্ষার খাতা হইতে মুখ তুলিয়া জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

রাজবালাই কিছুক্ষণ পরে কথা কহিলেন। বলিলেন, এখনি ওকে বিদেয় করে দাও?

ভুবনবাবু আরও বিস্মিত হইয়া কহিলেন, কেন গো? রান্না তো আর খারাপ করে না!

রাজবালা অগ্নিস্রাবী দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিলেন, তুমি থাম।··· পলিটিক্যাল সাসপেক্ট, বুঝতে পারছ না? বোমা।

যে শিক্ষকটি বসিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী-স্থানেই প্রতিষ্ঠা, তিনি বিজ্ঞের মত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, নিশ্চয়ই, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

ভুবনবাবু বোধ করি জীবনে এই দ্বিতীয়বার কি তৃতীয়বার স্ত্রীর কথার প্রতিবাদ করিলেন। কহিলেন, না না, বোমার চেহারা আলাদা। এর পলিটিক্স্-এ যাবার মত চেহারাই নয়।

রাজবালা জবাব দিলেন, হ্যাঁ, নয়! তুমি তো সবই জান, আচ্ছা কই ডাক দেখি ওকে, জিগ্‌গেস করেই দেখা যাক্!

সেদিনটা কী একটা ছুটির দিন, রান্নার খুব বেশী তাড়া ছিল না। পান্নুকে দিয়া বলিয়া পাঠানো হইল, হাতের রান্নাটা নামাইয়া রাখিয়া উনানে কয়লা দিয়া অমল যেন একটু বাহিরের ঘরে আসে।

অমলের পক্ষে কারণটা অনুমান করা অসম্ভব নয়, এমন কি সে ঠিক এইটিই আশা করিতেছিল বলিলেও ভুল করা হইবে না। সে প্রস্তুত হইয়াই দেখা দিল।

আমাকে ডাকছিলেন?

কথাবার্তা রাজবালাই চালাইবেন, ইহা পূর্বাহ্ণেই স্থির ছিল, বা বহুপূর্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে। কারণ যাহা কিছু কথাবার্তার ভার স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারই উপর ছাড়িয়া দিয়া ভুবনবাবু নিশ্চিন্ত আছেন। সুতরাং রাজবালাই কথা কহিলেন—

খুকী বলছিল, তুমি নাকি তাকে পড়া বলে দিয়েছ?

অমল বিনীত ভাবে কহিল, আজ্ঞে না, পড়া ঠিক নয়, একটা প্রবলেম পারছিল না, তাই।

তুমি অ্যালজেবরা জান?

কিছু কিছু জানি।

তুমি কত দূর পড়াশুনো করেছ?

ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম।

কই, এতদিন সে কথা বলনি তো!

আপনারা তো কোনও দিন পড়াশুনার কথা জিজ্ঞাসা করেন নি!

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ করিয়া রহিলেন, সহসা যে এভাবে অমল জবাব দিবে তাহা বোধ হয় কেহই আশা করেন নাই। একটু পরে ভুবনবাবু প্রশ্ন করিলেন, কোন ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাস করেছিলে?

ফার্স্ট ডিভিসনে। তিনটে লেটার ছিল।

কোন্ ইস্কুল থেকে দিয়েছিলে?

রাজবালা এইবার পুনরায় নিজের হাতে রশ্মি তুলিয়া লইলেন, স্বামীকে ধমক দিয়া কহিলেন, ফের ইস্কুল? কাজের কথার সময় যদি তুমি আবার ইস্কুলের কথা তোল, আমি মাথা খুঁড়ে মরব!···তা তুমি লেখাপড়া শিখে এ কাজ করতে এলে কেন?

অমল বিনীতভাবেই জবাব দিল, কি কাজ করব বলুন? অন্য কোনও কাজের জন্য এলে কি আপনারা অত সহজে দিতেন? না লেখাপড়া কোনও কাজে আসত? ম্যাট্রিক পাস ক'রে দেশ থেকে এসেছি প্রায় বছর দুই তিন হ'ল। কলকাতায় থেকে টিউশিনি করে বা অন্য কোনও কাজ ক'রে পড়াশুনো করব এমনিই ইচ্ছে ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু করতে পারলুম না। শেষে যখন দু-মুঠো ভাতও বন্ধ হ'ল তখনই বাধ্য হয়ে এই চেষ্টা করলুম। কলকাতায় থেকে এ কাজ করতে গেলে লজ্জা করত ব'লে এখানে চলে এলুম।

ভবেশবাবুর সঙ্গে কোথায় আলাপ হ'ল?

ট্রেনে। কাজ খুঁজছি শুনে তিনিই এই সন্ধান দিলেন।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া রাজবালা পুনশ্চ প্রশ্ন করিলেন, পলিটিক্যাল ব্যাপারে কোনও দিন মাতামাতি করেছ? মানে বোমা, বোমা তৈরি করেছ?

আজ্ঞে না।

তুমি যে সত্য কথাই বলছ তার প্রমাণ কি? কি করে জানব আমরা?

কলকাতায় যেখানে-যেখানে পড়াতুম তাঁদের ঠিকানা দিচ্ছি, চিঠি লিখে দেখুন। মেসের ঠিকানাও দিতে পারি, তবে সেখানে একটা বিপদ আছে, তাঁরা কিছু টাকা পাবেন আমার কাছ থেকে, আমার ঠিকানাটা তাঁদের না জানানোই ভাল।

রাজবালা আরও খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া আদেশ করিলেন, আচ্ছা তুমি যাও?

তাহার পর প্রশ্ন উঠিল, এখন কর্তব্য কি।

অমল এই সকল জবাবদিহির জন্য পূর্বেই প্রস্তুত হইয়া মনে মনে রিহর্স্যাল দিয়া আসিয়াছিল বলিয়া কথাগুলি ঠিক বিশ্বাসের উপযোগী করিয়াই বলিয়াছিল! সুতরাং অল্প একটু বাদানুবাদের পরই স্থির হইল যে, আর যাহাই হউক, ছোকরার কথাবার্তা শুনিয়া সে সত্য কথা বলিতেছে বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহাকে দিয়া রান্না করানোই বা চলে কি করিয়া?

ভুবনবাবু তখন কহিলেন, আমাদের ছেলেমেয়েগুলোকে পড়ানোর জন্য তো একজন মাষ্টার রাখব ভাবছিলুম, সেই কাজটাই ওকে দিলে কি হয়;

যে শিক্ষকটি বসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখ কালি হইয়া উঠিল, কারণ তিনি ওই উদ্দেশ্যেই কিছুকাল যাবৎ রাজবালার কাছে হাঁটাহাটি করিতেছিলেন। কিন্তু রাজবালা খুশী হইয়া কহিলেন, সেই বেশ কথা। সকাল বিকেল পড়াতেও পারবে, ছেলেমেয়েগুলোকে চোখে চোখেও রাখবে এখন। খাওয়া থাকা, আর সামান্য কিছু দিলেই চলবে।

সেই ব্যবস্থাই স্থির হইয়া গেল। সেইদিনই পূর্বেকার 'বাবাজী'কে ডাকিয়া পাঠানো হইল এবং অপরাহ্ণকালে অমলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, আগামীকল্য হইতে সে যেন ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার ভার গ্রহণ করে এবং সেজন্য তাহাকে আহার ও বাসস্থান ছাড়াও মাসিক দশটি করিয়া টাকা দেওয়া হইবে।

নূতন ব্যবস্থায় অমলের দিন ভালই কাটিতে লাগিল। আহার ও জলযোগের ব্যবস্থা ভাল। ছেলেমেয়েগুলি খুব গাধা নয়, সুতরাং পরিশ্রম করিতে হয়

কম। পড়ানো ছাড়া অবশ্য আর একটি কাজ তাহার বাড়িয়াছে, সেটি রাজবালার জন্য কিছু কিছু সৌখিন বাজার করা। তাহার পছন্দ ভাল এবং দরদস্তুর করিতে পারে, এই দুইটি মহৎগুনের পরিচয় পাইয়া রাজবালা এই কাজের ভারটি সম্পূর্ণরূপে তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়েছেন এবং তাহাকে সত্য-সত্যই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করিয়াছেন।

প্রথম প্রথম দুই-চারি দিন অসুবিধা হইয়াছিল পাড়ার মেয়েদের জন্য; রাজবালার মারফৎ এমন রসাল সংবাদটা প্রচার হইবামাত্র প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে অসংখ্য নারী-সমাগম হইতে লাগিল। পাটনা সিটি হইতে শুরু করিয়া গর্দানিবাগ পর্যন্ত বোধ হয় কোনও মহিলাই বাকী রহিলেন না এবং রাজবালার অনুরোধে প্রত্যহই তাহাকে মিনিট কতকের জন্য 'কিউরিও' হিসাবে তাঁহাদের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। লজ্জায় অমলের মাথা কাটা যাইত বটে, কিন্তু এতদিনে সে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের মর্ম বুঝিয়াছিল সুতরাং নীরবে সহিয়া যাইত।

যাক, সে অল্প কয়েকটা দিন; তার পর যতদূর সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়াই তাহার দিন কাটিতেছিল। কিন্তু মাস দুই পরে আবার তাহার দুশ্চিন্তার কারণ দেখা দিল। সহসা সে একদিন লক্ষ্য করিল যে জ্যোৎস্না তাহার দিকে একটু বেশী মনোযোগ দিতে শুরু করিয়াছে।

সন্দেহ জিনিসটা এমনই যে, প্রথমটা আসিতেই যা একটু দেরী কিন্তু মনে একবার দেখা দিলে অচিরেই তাহা মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়, তাহার প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক হয় না। অমলেরও প্রায় সেই ব্যাপার ঘটিল। প্রথম সন্দেহের পর এক সপ্তাহ কাটিতে না কাটিতে অমলের মনে সুনিশ্চিত বিশ্বাস দেখা দিল যে, জ্যোৎস্না দস্তুরমত তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িতেছে।

অবশ্য সে বিশ্বাসের কারণও ছিল। জ্যোৎস্না পড়ার সময় অন্য ভাইবোনদের সহিত বিবাদ করিয়া অমলের পাশে বসিত এবং জলখাবারের থালা কিছুতেই সে পান্নু কিংবা মথুরাকে লইয়া আসিতে দিত না। তাহাতেও আপত্তির কোনও কারণ ছিল না, কিন্তু সহসা একদিন সে ফস্ করিয়া নিজের আঁচল দিয়া তাহার

কপালের ঘাম মুছাইয়া দিল এবং মায়ে অসাক্ষাতে আহারের সময় তাহাকে বাতাস করিতে শুরু করিল।

কুড়ি-বাইশ বছরের তরুণের পক্ষে এই ধরণের রোম্যান্স বিস্ময়কর, বিশেষত, আধুনিক বাঙালী তরুণদের। কিন্তু অমলের বয়সটা বাইশ হইলেও, মনটা আরও অনেকখানি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। (যে তরুণ প্রেমে পড়িতে চায়, যে তরুণ দিন রাত স্বপ্ন দেখে, কিশোরীর আঁচলের হাওয়ায় যে তরুণের মনের পাপড়িগুলি বিকশিত হইয়া ওঠে, অমলের মনের মধ্যে সে তরুণ বহুকাল মরিয়া গিয়াছিল।) অভাব, নৈরাশ্য এবং আর একটি অত্যন্ত স্থূল অথচ অত্যাবশ্যক জিনিস, ক্ষুধা, তাহার বয়সকে পুরা দশটি বৎসর বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। তাই যে কিশোরীর প্রেমের আভাসে তাহার মন লঘু দখিনা হাওয়ার মত চঞ্চল হইয়া ওঠার কথা সেই প্রেমেরই অস্ফুট ইঙ্গিত পাইয়া সে রীতিমত ভীত হইয়া উঠিল।

কিন্তু ইঙ্গিতটা চিরকালই অস্ফুট রহিল না। সহসা একদিন সকলে স্কুলে চলিয়া যাইবার পর দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করিতে আসিয়া সে বালিশের তলায় একটা চিঠি পাইল। স্কুলের রুলটানা খাতা হইতে একটি পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া দুই-পৃষ্ঠায় সুদীর্ঘ চিঠি লেখা হইয়াছে। (জ্যোৎস্নার হাতের কদর্য লেখা চিনিতে অমলের বিলম্ব হইল না। কিন্তু এ যে রীতিমত প্রেমপত্র! নভেলী ঢং-এ নভেলী ভাষাতেই প্রেম নিবেদন করা হইয়াছে, যদিও বানান ও ব্যাকরণের ভুলে তাহা কণ্টকিত।)

চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পড়িয়া তাহার গা জ্বলিয়া গেল। এত দিন পরে যদি-বা ভাল আশ্রয় একটা মিলিয়াছে, এই হতভাগা মেয়েটার অকালপক্কতার জন্যই বুঝিবা তাহা যায়। সে অসহ্য ক্রোধে মনে মনে তাহাকে গালি দিতে লাগিল। কেন রে বাপু, এই তো সবে পনের-ষোল বছর বয়স, ইহারই মধ্যে এত বাড়াবাড়ি কেন? সে ব্রাহ্মণ, ভুবনবাবুরা কায়স্থ, বিবাহের কোনও সম্ভাবনা নাই। তাহা ছাড়া ভুবনবাবু তাহার মত পাত্রকে দিবার জন্য নিশ্চয়ই মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতেছেন না, সুতরাং এ পথে আর অগ্রসর হইলেই একদিন মার খাইয়া এ বাড়ি হইতে বাহির হইতে হইবে।

সে চিঠিখানা কুঁচিকুঁচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া শুইয়া পড়িল। কিছু টাকা হাতে জমাইতে পারিলে সে এ স্থান ত্যাগ করিত, কিন্তু পাইয়াছে আজ অবধি মাত্র কুড়িটি টাকা। তাহার মধ্য হইতে জামাকাপড় ও শতরঞ্চি, চাদর প্রভৃতিতে প্রায় আটটি টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে। বারো টাকা সম্বল করিয়া কোথায় যাওয়া যায়? আর তিনটি দিন কাটাইতে পারিলেও আর দশটি টাকা পাওনা হয় বটে। কিন্তু তাহাতেই বা কয় দিন?

সে দিন অপরাহ্নে পড়াইতে বসিয়া নিজে ডাকিয়া সে দুটি ছোট ছেলেকে দুপাশে বসাইল এবং সামান্য একটা ছুতা করিয়া জ্যোৎস্নাকে কঠিন তিরস্কার করিল। জ্যোৎস্নাও, চিঠি দিবার লজ্জাতেই হউক, অথবা জবাব বা উৎসাহ না পাইবার গ্লানিতেই হউক, একবারও চোখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিল না, কিংবা গায়ে পড়িয়া ভালবাসা দেখাইতে চেষ্টা করিল না। অমল ভাবিল, যাক বাঁচা গেছে।

কিন্তু তিন-চারিটি দিন যাইতে না যাইতে বোঝা গেল মেয়েটিকে এখনও সে চিনিতে পারে নাই।

সে দিন গভীর রাত্রে শয়নের জন্য ঘরে ঢুকিয়া সহসা সে অনুভব করিল কে তাহার বিছানায় বসিয়া রাছে। তাড়াতাড়ি সুইচ টিপিতে যাইবে কিন্তু তাহার পূর্বেই জ্যোৎস্না আসিয়া হাত চাপিয়া ধরিল, ফিস্‌ফিস্ করিয়া কহিল, চুপ! ভালয় ভালয় এসে ব'স বলছি, নইলে ভাল হবে না। গোটাকতক কথা আছে, তোমার সঙ্গে।

তাহার স্পর্ধা ও অসমসাহসিকতায় অমল স্তম্ভিত হইয়া গেল। ভয়ে তাহার সারা অঙ্গ ঘামে ভিজিয়া গেল, কিন্তু প্রতিবাদ করিতেও ভরসায় কুলাইল না। আস্তে আস্তে তাহার সহিত বিছানাতেই একাধারে বসিয়া পড়িল।

জ্যোৎস্না কহিল, আমার চিঠির জবাব দাও নি কেন?

রাগে অমলের আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল, কহিল, আমার-ত মাথা খারাপ হয় নি।

জ্যোৎস্না জবাব দিল, তার মানে আমার হয়েছে? কিন্তু কেন তাই শুনতে পারি সাধুপুরুষ? আজকালকার ছেলেদের চিনতে আমার বাকী নেই! তার মানে আমি

কালো, কুচ্ছিত, আমাকে দেখলে তোমার ঘেন্না হয়, এই তো? নিজে কি? আয়নায় একবার চেহারা দেখেছ?

এইবার অমলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল, সে কহিল, সে-জমাখরচের তোমার তো দরকার নেই? একরত্তি মেয়ে, এত ডেঁপোমি কেন? লুকিয়ে লুকিয়ে নভেল পড় আর এইসব কর। (প্রেম বানান করতে শেখবার আগেই প্রেম করতে চাও।) এখনও ঢের বয়স পড়ে আছে, এর পর যত পার প্রেম ক'রো। এখন পড়াশুনায় মন দাও গে!

কোনও কথার জবাব না দিয়া জ্যোৎস্না উঠিয়া দাঁড়াইল। অমল তখনও রাগে ফুলিতেছিল, সে পুনশ্চ কহিল, ফের যদি এসব মতলব দেখি, তোমার বাপ-মা কিছু বলুন আর না বলুল, আমিই চাবকে তোমায় লাল ক'রে দেব।

রাগে এবং অপমানে জ্যোৎস্নার মুখের চেহারাটা কি রকম দাঁড়াইয়াছিল, তাহা অন্ধকারে বোঝা গেল না, কিন্তু গলার আওয়াজটা সাপের মতই হিশ হিশ করিয়া উঠিল। সে বাহির হইয়া যাইবার আগে দাঁতে দাঁত চাপিয়া শুধু বলিয়া গেল, আচ্ছা, দেখা যাক!

সে চলিয়া যাইবার পর অমল বহুক্ষণ চুপ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ এইভাবে বসিয়া থাকিবার পর উপরের ঘড়িতে ঢং করিয়া একটা বাজার শব্দ শুনিয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুম আসিল না। এই মেয়েটির যে অসমসাহসের পরিচয় সে এইমাত্র পাইল, তাহাতে সে নিশ্চিত বুঝিতে পারিল যে, ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। তাহার উপর শেষের কথাগুলি যতই মনে পড়িতে লাগিল ততই তাহার বুকের রক্ত হিম হইয়া যাইতে লাগিল। সে যে আরও কি করিবে, প্রতিহিংসা সাধনের জন্য আরও কত আয়োজন করিবে, তাহার স্থির কি? এসব ক্ষেত্রে মেয়েদের দোষ কেহই দেখেনা, যাহা কিছু অপমান, লাঞ্ছনা ও দুর্নাম সব পুরুষদের। এই অপরিচিত স্থানে শেষ পর্যন্ত কি মার খাইয়া যাইতে হইবে?

তাহার গায়ে ঘাম দেখা দিল। সে আতঙ্কে ও দুশ্চিন্তায় বহুক্ষণ ছটফট

করিয়া রাত্রি আড়াইটা নাগাদ উঠিয়া পড়িল। না, এ স্থানে থাকা আর চলিবে না, চলিয়া যাইতে হইবে এবং আজই। সেই দিনই মাহিনার দশটি টাকা হাতে আসিয়াছে; তের আনা পয়সা সম্বল করিয়া সে যখন পাটনায় আসিতে পারিয়াছিল, তখন কুড়ি বাইশ টাকা লইয়া সে যে-কোনও স্থানে যাইতে পারিবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে থাকা কোনও মতেই সমীচীন নহে। জ্যোৎস্নার সহিত গোপনে সন্ধি করিয়া লইলে সে এখনও অনেকদিন স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু যে ভদ্রলোক তাহাকে একান্ত দুঃসময়ে আশ্রয় ও আহার দিয়াছিলেন তাঁহার অনিষ্টসাধন করিতে সে কিছুতেই পারিবে না। তাহার চেয়ে এতদিন যে-ভাবে কাটিয়াছে আরও কিছুদিন সেইভাবেই কাটুক।

সামান্য বিছানা ও তাহার নিজের অল্প দুই-একখানি জামা-কাপড়ের একটি পুঁটুলি বাঁধিয়া লইয়া ভুবনবাবুর নামে দুই-ছত্র চিঠি লিখিতে বসিল। তারপর বাহিরে তাঁহার লেখাপড়ার টেবিলের উপর চিঠিখানি রাখিয়া সে অন্ধকারেই বাহির হইয়া পড়িল।

তখনও রাস্তায় লোক চলাচল শুরু হয় নাই বটে, কিন্তু ময়দানের কাছাকাছি যাইতে ততরাত্রেই দুই-একখানি টমটম নজরে পড়িল। সে একটি টমটম ডাকিয়া তাহাকে চারিটি পয়সা কবুল করিয়া উঠিয়া বসিল। কারণ জনহীন পথে পুঁটুলি হাতে করিয়া গেলে অকারণে গোলমাল বা জবাবদিহিব মধ্যে পড়িবার সম্ভাবনা।

ষ্টেশনে পৌছিবার সময়ও সে কোথায় যাইবে কিছুই স্থির করিতে পারে নাই। সেখানে টমটম হইতে নামিয়া একটা কুলীকে ডাকিয়া আন্দাজে ঢিল মারিল, কহিল, আভি যো গাড়ি আতা হয়, উ কাঁহা যায়গা ?

সে জবাব দিল, দিল্লি যায়গা, দিল্লি।

দিল্লি, ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিল্লি, ভারতবর্ষের রাজধানী দিল্লি! তাহাই হউক। সে টিকিটঘরের কাছে গিয়া দিল্লিরই একখানি টিকিট কিনিয়া ফেলিল। ততক্ষণে গাড়িও প্ল্যাটফর্মের মধ্যে আসিয়া ঢুকিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি একটা খালি

গাড়ির মধ্যে উঠিয়া পড়িয়া টিকিট দেখিয়া হিসাব করিতে বসিল যে সে জ্যোৎস্নার নিকট হইতে কতটা দূরে চলিয়া যাইতেছে।

পরদিন সকালে চিঠিখানা ভুবনবাবুর নজরেই আগে পড়িল; চিঠিতে লেখা ছিল,

সবিনয় নিবেদন,

কোনও বিশেষ কারণে আপনার আশ্রয় ছাড়িয়া আমাকে চলিয়া যাইতে হইল। ইহাতে আমিই সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম; কিন্তু আমি থাকিলে হয়তো আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হইতেন। আমার নমস্কার জানিবেন। ইতি,—

ভুবনবাবু রাজাবালাকে চিঠিটা পড়িয়া শুনাইয়া বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, তার মানে? এ আমি তো কিছুই বুঝলাম না।

রাজবালা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া কহিলেন, আমি সন্দেহ করেছিলুম, কিন্তু এতটা বুঝতে পারি নি!

ভুবনবাবু কহিলেন, কি সন্দেহ, ব্যাপার কি?

কিছু না। দেখ, আজ জ্যোৎস্নার ইস্কুলের গাড়ি এলে তুমি ফিরিয়ে দিও। ওকে আমি আর ইস্কুলে পাঠাব না।

৭

ট্রেন ষ্টেশন ছাড়িয়া যাইবার পর অমল নিশ্চিন্ত হইয়া কামরার ভিতর দিকটায় দৃষ্টিপাত করিল। গাড়ীতে আর তুটিমাত্র আরোহী ছিল; তাহাদের একজন মাড়োয়ারী, সারা বেঞ্চ জুড়িয়া বিছানা পাতিয়া আরামে নিদ্রা যাইতেছে। যতক্ষণ ঘরে থাকে, ততক্ষণই ইহারা অর্থ চিন্তা করে বলিয়া ঘুমাইবার অবসর পায় না। সেইটা পুষাইয়া লয় ট্রেনে। যেখান হইতেই উঠুক এবং যতটুকুই যাক না কেন, গাড়িতে উঠিলেই ঘুমাইতে শুরু করে। আর একটি বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন, তিনি ভোরবেলা উঠিয়াই একটি পকেট গীতা পাঠ করিয়া প্রাতঃকৃত্য বোধ করি সারিয়া লইলেন। এইবার বেঞ্চির নীচে হইতে তামাকের

সরঞ্জাম বাহির হইল! ভদ্রলোকের দীর্ঘ দেহ, রং হয়তো এককালে গৌরবর্ণই ছিল, এখন পুড়িয়া গিয়াছে; ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি, তাহার অধিকাংশই পাকা; পরনে উকিলদের মত চোগা-চাপকান। অমল মনে মনে ভাবিল যে হয়তো ভদ্রলোক উকিলই হবেন।

কলিকাতে ফুঁ দিতে দিতে সহসা মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কি দেখছেন, তামাক খাচ্ছি তাই? বড় বদ অভ্যোস হয়ে গেছে, বিঁড়ি সিগারেট আর চলে না।

তারপর স্মিত প্রসন্ন মুখে হুঁকার মাথায় কলিকাটি বসাইয়া দুই চারিটি টান দিয়া কহিলেন, কত দূর যাবে বাবা তুমি? তুমিই বলি, তুমি আমার নাতির বয়সী।

অমল জবাব দিল, আজ্ঞে টিকিট কেটেছি তো দিল্লির, তার পর এখন কোথায় গিয়ে পৌঁছিই, কে জানে।

ভদ্রলোক মুখ হইতে হুঁকাটা নামাইয়া একবার অমলের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া লইলেন, তারপর কহিলেন, বাড়ি থেকে পালিয়ে আসছি বুঝি বাবা? কিন্তু এ পথ তো ভাল নয়, ওতে শুধু কষ্ট পাওয়াই সার হয়।

অমল লজ্জিতভাবে কহিল, আজ্ঞে এখন পালিয়ে আসছি না, এসেছি অনেক দিন আগে, সেই থেকেই পথে আছি।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া তামাক টানিবার পর পুনশ্চ কহিলেন, দিল্লীতে যাচ্ছ কাজকর্মের চেষ্টায় না কি?

অমল ঘাড় নাড়িয়া জবার দিল, হাঁ।

সুবিধে হবে?

কি ক'রে বলব বলুন। তবে শুনেছি অনেক বাঙালী আছেন, হয়তো কিছু হ'লেও হ'তে পারে।

কিচ্ছু হবে না। এ কি মাড়োয়ারী পেয়েছ যে মাড়োয়ারী দেখলেই একটা ব্যবস্থা ক'রে দেবে? তা ছাড়া তোমার বাড়ি পূর্ববঙ্গে হ'লেও বরং কথা ছিল, তবু বাঙালদের আশ্রয় পেতে, ওদের ওই গুণটা আছে।

আরও কিছুক্ষণ তামাক টানিবার পর কহিলেন, আর ওদের দোষই বা কি। কত বাঙালীর ছেলে যে নিত্য এইভাবে যাচ্ছে তার ঠিক নেই। সকলেরই আবদার—চাকরি ক'রে দাও, নিদেন ভাল টিউশনি দাও। ব্যবসা কেউ করবে না; যদি বা ধ'রে বেঁধে ব্যবসাতে নামিয়ে দেওয়া হ'ল, তো কিছু দিন থেকে, পাঁচজনকে ডুবিয়ে, বাঙালীর মুখ পুড়িয়ে একদিন ডুব মারবে। তুমি জান না বাবা, কিন্তু আমি জানি, সকাল-সন্ধ্যায়, অফিসে প্রত্যহ কত বাঙালীর ছেলেকে তাড়াতে হয়। তার ওপর দুপুরবেলায় মেয়েদের কাছেও এক দফা আবেদন-নিবেদন আছে। কারুর পথ খরচা হারিয়ে গেছে, কোন বিধবা মেয়ের বিয়ে দিতে পারছেন না, কেউ বা রুগ্ন স্বামীর ওষুধ-পথ্যের জন্য বেরিয়ে পড়েছে ভদ্রভাবে ভিক্ষে করতে! তার পরেও আর কি ক'রে সহানুভূতি থাকে লোকের বলো?

অমল রীতিমত দমিয়া গেল। শুষ্কমুখে একবার মনে মনে স্মরণ করিয়া দেখিল তাহার কয়েকটি মাত্র টাকা সম্বল আছে। এই সামান্য অর্থের উপর নির্ভর করিয়া দূর বিদেশে কত দিন চলিবে কে জানে। তাহার পর?

অনেকক্ষণ ভাবিয়াও যখন কোনও হদিস পাওয়া গেল না, তখন সে জোর করিয়া প্রসঙ্গান্তরে যাইবার চেষ্টা করিল। প্রশ্ন করিল, আপনি কি করেন?

ততক্ষণে তাঁহার তামাক খাওয়া শেষ হইয়াছে। তিনি কলিকার ছাইটা ফেলিয়া দিয়া হুঁকাটি নামাইয়া রাখিলেন, তাহার পর অল্প কিছুক্ষণ স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিলেন, জচ্চুরি।

কথাটা এতই অপ্রত্যাশিত যে তাহার মুখের ভাবটা কিরূপ হওয়া উচিত, অর্থাৎ কথাটা পরিহাস কিংবা তাহার প্রশ্নের ধৃষ্টতার জন্য তিরস্কার, কিংবা সত্য, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত অমল হাসিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত তিনিই বাঁচাইলেন, কহিলেন, এতে তোমার অপ্রতিভ হবার কিছুই নেই বাবা, আমার পেশা জুচ্চুরি।

অমল কহিল, তার মানে?

তিনি যেন একটু করুণভাবে হাসিলেন, কহিলেন, ষোল বছর বয়স থেকে

ওই পথই ধরেছি, আর ছাড়তে পারি নি। টাকা আসে বটে, কিন্তু দুশ্চিন্তাও কম নয় বাবা। কিন্তু এখন উপায় কি! যে জাল নিজে বুনেছি, তার মধ্যে নিজেই এমনভাবে জড়িয়ে গেছি যে আর বেরুবার উপায় নেই। আমার বাবা ছিলেন নাম করা উকিল, দাদাও তাই হলেন, কিন্তু আমি গেলুম অন্য পথে। মায়ের অত্যধিক আদরে পড়াশুনো হ'ল না বটে, কিন্তু তাই ব'লে আহাম্মক ছিলুম না, শুরু করলুম লোকজনকে ঠকাতে। মাকে আর ভাইকে দিয়ে আরম্ভ করলুম; তারপর বাইরের লোককে।

কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, বছর ত্রিশেক বয়সের সময়—তখন আমি দাদারই মুহুরীগিরি করি, আইনেও একটু একটু দখল হয়েছে—একদিন দাদার এক মফঃস্বলের কেস এল। মোটা টাকা, কিন্তু দাদা বললেন, লিখে, আমি যেতে পারব না, অন্য কাজ আছে। আমি দাদাকে কিছু না ব'লে চ'লে গেলুম দাদারই পোষাকে আর দাদারই নাম লেখা এক পুরনো ব্যাগ নিয়ে। কেস করলুম। শুধু তাই নয় মক্কেলের মামলা জিতলুম। মোটা টাকা নিয়ে ফিরছি এমন সময় যে পক্ষ হেরেছে তারা কোথা থেকে খবর পেয়ে পুলিসে খবর দিলে। ধরা প'ড়ে একেবারে শ্রীঘর!

উপন্যাসেব মত এই বিচিত্র কাহিনী অমল রুদ্ধঃনিশ্বাসে শুনিতেছিল, সে প্রশ্ন করিল, তার পর?

ভদ্রলোক জবাব দিলেন, বছরে দুজন ক'রে কয়েদীকে ছেড়ে দেওয়া হয় মিশনারী সাহেবদের অনুরোধে। অর্থাৎ কেউ পাপের জন্য সত্যিই অনুতপ্ত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে স্বর্গীয় প্রভুর শরণাপন্ন হ'তে চায় এমন কোনও লোক দেখে তাঁরা অনুরোধ করলে সরকার খৃষ্টধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেন। সে খবরটা আমি জানতুম. কিছুদিন ধ'রে এমন নিটোল অভিনয় শুরু করলুম যে মাস ছয়েক যেতে না যেতে আলেকজাণ্ডার বিভাস রায় জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। বলা বাহুল্য ঘরে স্ত্রী ছিল, পুত্রকন্যাও দেখা দিয়াছে, কিন্তু তাঁরা আর আমার সঙ্গে বাস করতে রাজী হলেন না। আমারও শাপে বর হ'ল, এক খ্রীষ্টানী বিধবার একমাত্র কন্যাকে

বিবাহ ক'রে বুড়ীর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার মালিক হয়ে বসলুম। তারপরও যে সৎপথে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার চেষ্টা করি নি তা নয়, কিন্তু হ'ল না। তিন চার রকম ব্যবসা করতে গেলুম কিছুই হ'ল না, শাশুড়ী ঠাকরুণের যে কটি টাকা ছিল, সেই কটিই শুধু গেল। তখন আবার জুচ্চুরি ধরলুম। খুলেছি দেশে একটা ইস্কুল, 'সমস্ত রকম শিল্প ও ও সাধারণ লেখাপড়া' শেখাবার জন্য। এখন কাজ শুধু তারই নাম ক'রে সাহেব-সুবোদের কাছ থেকে মোটা চাঁদা আদায় করা।

অমল এতক্ষণ পরে কথা কহিল, প্রশ্ন করিল, চাঁদা পাচ্ছেন ?

পাচ্ছি বই কি। দেখ বাপু, নিজের জন্য ভিক্ষে করতে গেলে মাথা হেঁট ক'রে যেতে হয়, সেখানে মেলেও কচু। কিন্তু পরের জন্য ভিক্ষে করতে নিজের তো কোনও লজ্জাই নেই, বরং যে দিতে না পারে, সেই লজ্জিত হয়। বেশ আছি, আমি রেক্টর আর আমার স্ত্রী লেডি সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট। মোটা মাইনে দুজনের নামে। চীফ জাষ্টিস ম্যাকগ্রেগর সাহেব বলতেন, পরোপকারের নামে জুচ্চুরি করাও ভাল ; তবু যারা দেয় তাদের উপকার হয়।

ভদ্রলোক আবার তামাক ধরাইলেন। তার পর পাঁচটা এ-কথা সে-কথা কহিবার পর কহিলেন, তুমি লেখাপড়া কতদূর শিখেছো বাবা ?

অমল একটু লজ্জিতভাবে কহিল, ম্যাট্রিক পাস করেছিলুম, তারপর আর অর্থাভাবে পড়া হয় নি। তবে দিনকতক দুপুরবেলা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়ে ইংরেজী সাহিত্য আর ইতিহাস একটু আধটু নাড়াচাড়া করেছিলুম।

ভদ্রলোক সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, ইংরেজী চিঠি পড়তে বা জবাব লিখতে পারবে ? অবিশ্যি আমি বলে দেব—

অমল কহিল, কেন পারব না! প্রেসিরাইটিং আর ড্রাফটিং, দুটোই আমি শিখেছিলুম যে।

ব্যস্। তুমি এক কাজ কর। দিল্লিতে আমি মাসখানেক থাকব। হোটেলে একটা বড় ঘর নিয়েই থাকব। ইচ্ছেই ছিল ওখানে গিয়ে চাকর আর সেক্রেটারি

রাখব এক মাসের জন্যে—মিছিমিছি দেশ থেকে নিয়ে এলে খরচা বাড়ত—তা তুমিই ঐ সেক্রেটারির কাজটা নাও না! কাজ আমার সামান্য, ওটা শুধু লোক দেখানো রাখা, অথচ এক মাস তোমার খাবার আর থাকবার ভাবনা থাকবে না, সেই এক মাসে তুমি কাজকর্ম খুঁজে নিতে পারবে। দেখ, রাজী আছ?

রাজী! অমল কহিল, তা হ'লে তো আমি বেঁচে যাই।

বিভাসবাবু খুশি হইয়া কহিলেন, তা হলে ওই কথাই থাক। একটা চাকর শুধু খুঁজে নেওয়ার মামলা, তা চাকর ঢের পাব, কি বল?

একটু থামিয়া কহিলেন, এখানে এই অবস্থা দেখছ, তামাক নিজেই সেজে খাচ্ছি আর যাচ্ছি থার্ড ক্লাসে, দিল্লিতে পৌঁছে কিন্তু চিনতে পারবে না। ওই যে দেখছ আমার ট্রাঙ্ক, ওতে যা পোশাক আছে তা আধাদামে বেচলেও তোমার এক বছরের খরচ চলে যাবে। ওটা চাই, বুঝলে? ভেক না হলে ভিক্ষে মিলে না। সোনার বোতাম আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরে যারা চার পয়সা চাঁদা নিতে আসে, তাদের ফিরতে হয় না কারও কাছ থেকেই।

বেলা যত বাড়িতে লাগিল, ততই ভুবনবাবুদের কথা মনে পড়িয়া অমলের মন খারাপ হইতে লাগিল। শুধু নিরাপদ আশ্রয় নয়, একটু স্নেহও সেখানে পাইয়াছিল বই কি। এমনিভাবে অকৃতজ্ঞের মত তাঁহাদের ছাড়িয়া আসা বোধ হয় উচিত হইল না। এই কথাটাই ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল! শুধু কি তাহাই! আবার এই যে সে অকূলে ভাসিল, এ ভাসার শেষ যে কবে হইবে, কোথায় হইবে তারই বা ঠিক কি। স্রোতের মুখে কুটার মত ভাসিয়া বেড়ানো জীবন আর ভাল লাগে না।

বিভাসবাবু মোগলসরাই-এ খাবার কিনিলেন, শুধু তাঁহার মত নয়, অমলের মতও। আশ্চর্য তাঁহার দৃষ্টি, খাইতে খাইতে কহিলেন, মন খারাপ লাগছে, না? বাড়ির জন্যে, না এখন যেখান থেকে আসছ তাঁদের জন্যে?

লজ্জিতভাবে হাসিয়া অমল কহিল, দুইই বোধ হয়!

বিভাসবাবু কহিলেন, উঁহু, ওটা ভাল নয়। এ পৃথিবীর মুসাফিরিতে পিছনের দিকে ফিরে কখনও চাইবে না, বুঝলে? তা হলেই দুঃখ পেতে হবে। মহাভারত পড়েছ তো? যুধিষ্ঠিরের যাত্রা মনে আছে? তিনি পিছনে ফিরে চান নি ব'লেই নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে স্বর্গে গিয়ে পৌঁছলেন, বাকী সকলের পতন হ'ল। এই দেখছ তোমার জন্য খাবার কিনলুম, তোমাকে আশ্রয় দেব বললুম, কিন্তু এই মুহূর্তে রেলে কলিশন হয়ে যদি তোমার মৃত্যু হয় আর আমি বেঁচে থাকি, তা হ'লে তোমার জন্য একটুও দুঃখিত হব না, নিজের জন্যই অদৃষ্টকে ধন্যবাদ দেব।

অমল কথাটা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তাহার বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া বিভাসবাবু হাসিলেন মাত্র। প্রশান্ত মুখে তাঁহার লজ্জা বা দুঃখের কোন স্থান নাই, কহিলেন, দুঃখ পাবে বাবা তুমি। ঘর ছেড়ে যখন বেরিয়েছ তখন পথকেই তোমার আপন বলে চিনে নিতে হবে। পথে তো আত্মীয় নেই!

৮

দিল্লিতে পৌঁছিয়া বিভাসবাবু হাঁক ডাক করিয়া কুলি ডাকিলেন। কুলির সঙ্গে হোটেলের প্রতিনিধিরা চারিদিক হইতে আসিয়া ঘিরিয়া ধরিল। তিনি কিন্তু কোনরূপ ইতস্তত না করিয়া একটা হোটেলকে বাছিয়া লইলেন এবং দৈনিক চার টাকা ভাড়ায় একটা ঘর লইবেন জানাইলেন। ট্যাক্সিতে চাপিয়া হোটেলে যাইতে যাইতে পক্ষপাতের কারণটা খুলিয়া বলিলেন, প্রথম যখন দিল্লিতে আসি তখন এই ব্যাটারা ভয়ানক ঠকিয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ টাকা ফাঁকি দিয়ে নিয়েছিল। আমিও তার পরের বছর এসে এদের প্রায় দেড়শ' টাকার বিল্ ক'রে দিয়ে স'রে পড়েছিলুম। সেইজন্যই এবার যাচ্ছি, আহা—বেচারাদের কিছু পাওয়া উচিত নয় কি?

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, কিন্তু এখন যদি সেবারের টাকা চেয়ে বসে?

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া বিভাসবাবু কহিলেন, তারপর বছর সাতেক কেটেছে, সে এতদিনে তামাদি হয়ে গেছে।

দিল্লির সর্বপ্রধান বাজার চাঁদনী চকের উপরেই হোটেল। রাস্তার দিকে বাথরুম সুদ্ধ প্রকাণ্ড একটা ঘর বিভাসবাবুকে দেওয়া হইল। তাহারই মধ্যে দুটি খাট, একটিতে বিভাসবাবু থাকিবেন ও একটি অমলের। আলো, পাখা সুদ্ধ দৈনিক চার টাকা ভাড়া—আহারাদি স্বতন্ত্র।

বিভাসবাবু স্নানের পর যখন পোশাকের বাক্স খুলিলেন তখন অমল রীতিমত বিস্মিত হইল। বহুমূল্য শালের চোগা-চাপকান, দামী সাহেব বাড়ির স্যুট হইতে আরম্ভ করিয়া গরদের ধুতি-পাঞ্জাবী পর্যন্ত সবই তাহাতে ছিল! ইহাদের মূল্য সম্বন্ধে তাহার স্পষ্ট কোনও ধারণা নাই সত্য কথা, কিন্তু সেগুলির দাম যে কম নয় একথাটা সেদিকে একবার মাত্র চাহিলেই বোঝা যায়।

অনেকক্ষণ ভাবিয়া তিনি একটা সাহেবি পোশাকই পরিলেন। তারপর কতকগুলি ছাপানো আবেদনপত্র বাহির করিয়া ছোট্ট একটি চামড়ার হ্যাণ্ডব্যাগের মধ্যে ভরিয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন! আবেদনপত্র বিশেষ কিছুই নয়, বিভাসবাবুর স্কুল যেখানে, সেখানে একটি গির্জা প্রস্তুত করা বিশেষ দরকার এবং সেই মহৎ উদ্দেশ্যে সামান্য কিছু সাহায্য প্রার্থনা করা হইয়াছে মাত্র।

ঘণ্টা হিসাবে একটা গাড়ী ঠিক করিয়া বিভাসবাবু বাহির হইয়া পড়িলেন, যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, তুমি এখন ঘণ্টা দু-তিন বিশ্রাম কর, নয়ত ঘুরে ফিরে শহরটা দেখে এস; আমি সেই বেলা একটা নাগাদ ফিরব।

অমল তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে নীচে পর্যন্ত নামিয়া আসিল। এবং সবিস্ময়ে দেখিল যে তিনি গাড়িতে বসিয়া পকেট হইতে পূর্বদিনকার গীতাটি বাহির করিয়া নিবিষ্ট-চিত্তে পড়িতে পড়িতে চলিলেন, গির্জা নির্মাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে!

ইহার পরও অমলের বিশেষ কোনও কাজ রহিল না। কোনদিন হয়ত কোথাও চিঠি লিখিয়া পাঠাইবার দরকার হইলে কিম্বা একই সময়ে দুই জায়গায় 'ইনটারভিউ' থাকিলে বিভাসবাবু অমলকে ডাকিতেন; নচেৎ সে সমস্ত সময়টা নিজের ভাগ্যান্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইত। কিন্তু একমাস সময় দ্রুত শেষ হইয়া আসিল, অমলের কোনও উপায়ই হইল না।

ম্যাট্রিক-পাশ বাঙালী যুবককে সরকারী অফিসে চাকুরী দেওয়া সাধ্যাতীত, এই কথাই সবিনয়ে সকলে জানাইলেন। অনেকেই পরামর্শ দিলেন, ব্যবসা কর। কিন্তু তাহার মূলধন কোথা হইতে আসিবে এ সন্ধান কেহই দিতে পারিলেন না। কেহ কেহ বলিলেন যে, তাঁহারা অল্প-সল্প মূলধন দিয়াও বহুলোককে সাহায্য করিয়াছেন কিন্তু প্রত্যেকেই তাঁহাদের ঠকাইয়াছে, সুতরাং—ইত্যাদি! নিউ দিল্লির জনহীন, মরুভূমিতুল্য রাজপথে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অমল প্রথম বুঝিল, কেন তাহার বাবা সামান্য পঁচিশ টাকা বেতনেই সারা জীবন কাটাইয়া দিলেন, তবু বড়-কিছু করিবার চেষ্টা করিলেন না।

শেষ পর্য্যন্ত সে ট্যুইশনের চেষ্টা দেখিল, কিন্তু তাহাতেও বিশেষ কিছু সুবিধা হইল না। প্রায় প্রত্যেক কেরাণীর গৃহেই দুই-একজন বেকার যুবক আছে, যাহারা লাইফ ইন্‌সিওরেন্স ও ছেলে পড়ানোর দ্বারা সিনেমার খরচা চালাইতে চায়। হয়ত গান জানা থাকিলে (তা হউক্ না কেন তৃতীয় শ্রেণীর রেকর্ডের বেসুরা পুনরাবৃত্তি) কিছু সুবিধা হইত, কিন্তু সে কথা ভাবিয়া ফল কি।

অমল মন স্থির করিবার পূর্বেই কিন্তু বিভাসবাবুর ফিরিবার সময় হইল। তিনি কোনও দিনই কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া ফলটা অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। যাত্রার আগের দিন রাত্রে তাহাকে ডাকিয়া কহিলেন, হোটেল-ওয়ালাদের বলে দিয়েছি যে আমার সেক্রেটারি আরও দু-চার দিন এখানে থাকবেন, দৈনিক এক টাকার একটা ঘর দেখে দেবে তাঁকে। এক সপ্তাহের ভাড়া ব'লে সাতটা টাকাও দিয়েছি, বলেছি বাকীটা কিছুদিন পরে মনি-অর্ডার করে পাঠাব। সুতরাং মাসখানেক তুমি আরও সময় পাবে; তার আগে তোমাকে এরা উত্যক্ত করবে না। আমার ঠিকানা দিও. না, তবে যদি তার মধ্যে কিছু সুবিধা না হয়, একদিন স'রে প'ড়। মালপত্র ত নেই বিশেষ, কোনও অসুবিধা হবে না! না, না, ওসব উচিত-অনুচিতের কথা তোমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে লাভ নেই, যা বললুম মনে রেখো। আর

এই সাহেবটা অনেকদিন ধরে ঘোরাচ্ছে, যদি ডোনেশন কিছু সত্যিই দেয় ত ওটা আদায় করে নিতে পার, ওটা তোমারই রইল।

তারপর কিছুক্ষণ থামিয়া কহিলেন, যদি কোনদিকে কিছু না হয়, আর আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় ত আমার কাছে যেতে পার, মাষ্টারী একটা দিতে পারব। থাকবার বাসা পাবে আর খাবার মত যৎসামান্য কিছু পাবে। মাইনে আমি দিই না—লিখিায় নিই বটে ত্রিশ চল্লিশ টাকা! যাক্—

অমল কথা কহিল না, সে এই একমাসেও মানুষটিকে চিনিয়া উঠিতে পারে নাই। লোকটির কথাবার্তায় এবং কোন কোন কার্যে ঘোরতর পাষণ্ড বলিয়াই বোধ হয়—অথচ তাহাকে যে তিনি দয়াই করিয়াছেন তাহাতে-ত সন্দেহ নাই! শুধু তাকেই নয়, রাস্তার ভিখারীদেরও কখন বিমুখ করেন নাই, সে নিজেই তাহার সাক্ষী আছে। এই একমাসে লোকটা কি অজস্র মিথ্যা কথাই না বলিয়াছে, কতরকম মিথ্যা বলিয়া, কতরকম মুখোশ পরিয়া অজস্র অর্থ লুটিয়াছে, তাহার বোধ করি হিসাব-নিকাশ নাই; কোন-রকম ন্যায় অন্যায়েব বোধ আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু তবু অমলের মনে হইল, কোথায় ইহার কিছু একটা গোলমাল আছে, যাহা বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে এখনও—

যাক্ গে সে সব কথা—

বহুদিনের হতাশায় অমলের মন যেন কেমন পাথর হইয়া গিয়াছে, কোন কথাই সে তলাইয়া ভাবিতে পারে না, অধিকাংশ সময় সে ভাবেই না কোন কিছু, মন সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অলস স্বপ্নের জাল বুনিয়া যায়। বাল্যকালের কথা এলোমেলোভাবে মনে পড়ে, জীবনে যে সব আশা ছিল, সেই সব স্বপ্নের মথা মনে হয়—এই মাত্র।

দিল্লিতে আর কিছু সুরাহা হইবার সম্ভাবনা নাই তাহা সে বুঝিয়াছে, কিন্তু তবু কীই বা করিবে? অভ্যাসের বশে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় বাহির হয়, কোনও কোনও দিন কাহাকেও খুঁজিয়া বাহির করে, চাকুরী কিম্বা ট্যুইশনের আবেদন

জানায়, কোনও দিন বা এমনি লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় কোনও আশা নাই, আশঙ্কাও যেন সে ছাড়িয়া দিয়াছে—

হোটেলের বিল বাড়িতে লাগিল। থাকা এবং খাওয়া—সে বিভাসবাবুর পরামর্শ অনুসারে খাওয়াটাও হোটেলেই চালাইত—দুই টাকার কম হয় না। এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ, তিন সপ্তাহ পড়িতে হোটেলওয়ালারা কিছু চঞ্চল হইয়া পড়িল; তখনও অমল ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই কি করিবে, সেই মানসিক নিষ্ক্রিয়তার মধ্যেই সহসা এক কাণ্ড করিয়া বসিল। ভুবনবাবুর দরুণ যে টাকাগুলি কাছে ছিল তাহার বিশেষ কিছু খরচা হয় নাই, তাহারই মধ্য হইতে পনেরটি টাকা হোটেলের অফিসে জমা দিয়া জানাইল যে সে দেশে জরুরী চিঠি দিয়াছে টাকার জন্য, দুইএকদিনের মধ্যেই আসিয়া যাইবে। আরও কিছুদিন সময় পাওয়াই ছিল তাহার উদ্দেশ্য, কিন্তু টাকাটা জমা দিবার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের ভুল বুঝিতে পারিল। এখানে থাকার কোনও ব্যবস্থা হইল না, অথচ আর কোথাও যাইবার পথও যে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হইয়া গেল, এই সহজ সত্যটা সে উপলব্ধি করিয়া ভয়ে কাঠ হইয়া উঠিল।

সর্বনাশের সামনা-সামনি দাঁড়াইয়া তাহার মনের জড়তা অনেকখানি কাটিয়া গেল। তারপর সাতটা দিন সে পুনরায় দিল্লির প্রতিটি গলি চষিয়া ফেলিল। যা হোক্ কিছু কাজ চাই, যত সামান্যই হউক্। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়া সপ্তম দিনের দিন যখন দুইটি গোটা পাঁচ-ছয়টাকা হিসাবের ছেলেপড়ানোর কাজ সংগ্রহ করিতে পারিল তখন হোটেলওয়ালারা রীতিমত রূঢ় হইয়া উঠিয়াছে। কাজ একটি টিমারপুর ও একটি নিউ দিল্লিতে অর্থাৎ সকালে বিকালে হাঁটিয়া যাইতেই শুধু ঘণ্টা-তিনচার সময় বাজে নষ্ট হইবে। কিন্তু তাহাতেও ক্ষতি ছিল না, যদি একমাস আর কোথাও কাটাইবার উপায় থাকিত। হোটেলওয়ালারা থাকিতে দিবে না, অথচ আর কোথাও বাসা করিয়া থাকিয়া একমাস কাটাইবার মত পয়সা কোথায় হাতে? এক মাসের পর মাহিনা আদায় হইবে, হয়ত আরও দুই চারিদিন পরে, তাহা ছাড়া হোটেলের টাকা মারিয়া দিল্লিতেই যদি সে বাসা

লইয়া থাকে, একদিন না একদিন হোটেলওয়ালাদের চোখে পড়িবেই, তাহার পরের অবস্থাটা কল্পনা করিয়া সে ঘামিয়া উঠিল। ভুবনবাবুর বাড়ী ছাড়িয়া আসা তাহার পক্ষে কতদূর মূর্খতার কাজ হইয়াছে, তাহা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

সেদিন সে অনেক রাত্রে হোটেলে ফিরিল। ইচ্ছা ছিল যে সকলের অলক্ষ্যে কোনমতে ঘরে ঢুকিয়া শুইয়া থাকিবে, আহারাদির নামও করিবেনা; কিন্তু ঘরে ঢুকিয়া আলো জ্বালিবে কিনা স্থির করিবার পূর্বেই ম্যানেজারও দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দেখা দিলেন, বোধ করি তাহার অপেক্ষায় এই বাহিরেই কোথাও দাঁড়াইয়াছিলেন। অগত্যা অমলকে আলো জ্বালিতে হইল। তিনি ঘরে ঢুকিয়াই প্রশ্ন করিলেন, কেঁও বাবুজী, তার্‌কা জাবাব মিলা ?

অমল তাহার আগের দিনই বলিয়াছিল যে সে মনিবের কাছে টেলিগ্রাফ পাঠাইয়াছে, সুতরাং সে ঢোঁক গিলিয়া জবাব দিল, নেহি, ফিন্ কাল একঠো ভেজেঙ্গে—

ম্যানেজারের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল; কহিলেন, হামকো পাত্তা লিখ্ দিজিয়ে, হাম খুদ্ ভেজ দেঙ্গে কাল—

অমলের মুখ শুকাইয়া উঠিল। সে কহিল, আচ্ছা কাল লিখ্ দেঙ্গে !

কিন্তু ম্যানেজার নাছোড়-বান্দা। তিনি কহিলেন, আজ লিখ্ দেনেমে কেয়া হরজা হ্যায় ? লিজিয়ে পেন্সিল, কাগজ-ভি হ্যায় হামরা পাশ।

বিভাসবাবুর অনুরোধ অমলের মনে পড়িল। যে লোকটা দুদিনের জন্যও তাহার উপকার করিয়াছে, তাহার অপকার করা কিছুতেই উচিত হইবে না। বরং তাহাতে যদি নিজেকে বিপদগ্রস্ত হইতে হয় ত' সে-ও ভাল। সে কাগজটা লইয়া মরিয়া-ভাবে যে ঠিকানাটা পেন্সিলের ডগায় বাহির হইল তাহাই লিখিয়া দিল, তাহার পর ম্যানেজার বিদায় লইলে আলো নিভাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

কিন্তু ঘুমের কল্পনা সেদিন একেবারেই দুরাশা। ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া এইমাত্র সে যে মিথ্যা ঠিকানাটি লিখিয়া দিল, তাহার জবাবদিহি করিবার সময় আসিবে

সন্ধ্যার পূর্বেই, যখন হোটেলওয়ালাদের টেলিগ্রামখানি ফিরিয়া আসিবে। তাহার পরে যে লাঞ্ছনা তাহাকে সহিতে হইবে, সে কথা সে ভাবিতেও পারিল না। হয়ত বা পুলিসেই দিবে। এতদিন যে তাঁহারা সহ্য করিয়াছে এবং এখনও নিজেদের খরচে তার পাঠাইতে চাহিতেছে, সে শুধু বিভাসবাবু সম্প্রতি অনেকগুলি টাকা দিয়া গিয়াছেন, সেই কথাটা মনে করিয়াই। কিন্তু তাহার পর? অতি দ্রুত জেল ও হাতকড়ার একটা অস্পষ্ট ছবি তাহার চোখের সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কপালে ঘাম দেখা দিল। সে স্থির হইয়া শুইয়া থাকিতে না পারিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল।

কাল মধ্যাহ্নের পূর্বেই তাহাকে পলাইতে হইবে, যেমন করিয়াই হউক। কিন্তু কোন উপায়ের কথাই তাহার মনে পড়িল না। পকেটে কয়েক আনা মাত্র পয়সা অবশিষ্ট আছে, তাহাতে কোথাও যাওয়া ত দূরের কথা, দুইদিনের বেশী খোরাকীই চলে না। যতদিন সে বাড়ী হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে এমন অবস্থায় তাহাকে কোনদিন পড়িতে হয় নাই।

ঘণ্টাখানেক চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পর সে বাহিরের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। আত্মহত্যা ছাড়া আর কোন পথ, কোনও রাস্তা খোলা নাই, শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যাই করিতে হইবে—

কতকটা স্বপ্নাবিষ্টের মত সে দুই এক পা অগ্রসর হইল। তাহার পাশের ঘরের দুইখানি ঘর পরেই বড় একটা চার-টাকাওয়ালা ঘর, সেই ঘরে কোথাকার ছোকরা রাজা আসিয়াছেন আজ দুইদিন, এ সংবাদ সে পূর্বেই পাইয়াছিল। অকস্মাৎ সেই ঘরের সামনে আসিয়া সে দাঁড়াইয়া গেল। ঘরের বারান্দার দিকের এবং ভিতরের দিকের দুটি দরজাই খোলা। নেয়ারের খাটে রাজা বাহাদুর ঘুমাইতেছেন, আর দ্বিতীয় কোন প্রাণী নাই। ঘরে সামান্য যে আলোর আভাস আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার অস্পষ্টতার মধ্যেও পরিষ্কার তাহার নজরে পড়িল রাজাবাহাদুরের কোটটা দুয়ারের পাশেই আলনাতে টাঙ্গানো এবং তাহার বুক পকেটে মনিব্যাগের মত কি একটা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আছে।

সহসা অমলের বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করিয়া উঠিল; তাহার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। যে চিন্তা তখনও তাহার মাথায় আসে নাই, শুধু মনের মধ্যে আকার ধারণ করিতেছে মাত্র, তাহারই ইঙ্গিতে সে মূর্ছাতর হইয়া উঠিল। একথা যে কোনও দিন তাহার মনে আসিতে পারে, তাহা সে মুহূর্ত কয়েক পূর্বেও বিশ্বাস করিতে পারিত না এবং হয়ত দুঃস্বপ্নের মত কয়েক মুহূর্ত পরেও অবিশ্বাস্য হইয়া থাকিবে, কিন্তু এই ক্ষণটিতে অকস্মাৎ সেই অতি হীন প্রবৃত্তিই মনের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। সমস্ত শিক্ষা, সমস্ত সংস্কার, সমস্ত বিবেক ছাড়াইয়া একটা চিন্তা মনের মধ্যে সর্বপ্রধান হইয়া উঠিল যে, আত্মহত্যা ছাড়া আর এই একটিমাত্র পথই এখনো খোলা আছে।

মানুষের নিজের জীবনরক্ষার যে দুর্নিবার ইচ্ছা মানুষের সহজাত, সেই ইচ্ছারই জয় হইল এবং কি করিয়া কোন্ যুক্তিতে তাহার আজীবনের শিক্ষা ও জীবনের বহু পূর্বেকার সঞ্চিত পূর্বপুরুষদের সংস্কারকে ঐ অতি অল্পক্ষণ সময়ের মধ্যে জয় করিয়া সত্যসত্যই রাজাবাহাদুরের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল নিঃশব্দ, তস্করগতিতে—তাহা আজও তাহার কাছে অবোধ্য হইয়া আছে; তবে সত্যসত্যই সে সেই জামাটার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

ঘরের আবহাওয়ায় প্রচুর মদের গন্ধ, মদ্যপ গৃহস্বামীর গভীর নিদ্রার কথা জানাইয়া দিল। তবু অমলের বুকে হাতুড়ীর ঘা পড়িতেছিল, হাত কাঁপিতেছিল থর থর করিয়া। সে কোনমতে মনিব্যাগটা বাহির করিয়া খুলিয়া ফেলিতেই ভিতরে একতাড়া নূতন নোট খস্ খস্ করিয়া উঠিল। সে আন্দাজে খান তিন-চার নোট বাহির করিয়া লইয়া মনিব্যাগটা আবার বন্ধ করিয়া জামার পকেটে রাখিয়া দিয়া বারান্দায় বাহির হইয়া আসিল।

সেখান হইতে নিজের ঘরে পৌঁছিতে মনে হইল যেন এক যুগ সময় লাগিল। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া নোট ক'খানা হাতের মধ্যে মুঠা করিয়াই সে বিছানায় অর্ধমূর্ছিত-ভাবে শুইয়া পড়িল।

৯

যখন তাহার মনের এবং দেহের আবার সক্রিয় অবস্থা ফিরিয়া আসিল তখন ভোর হওয়ার আর বিলম্ব নাই। প্রথমেই যে চিন্তা তাহার মনে দেখা দিল, তাহা হইতেছে অপরিসীম ধিক্কার ও আত্মগ্লানি! দেহের প্রতি রক্তকণা একসঙ্গে বলিয়া উঠিল, ছিঃ তুমি চোর!

সে ভদ্রসন্তান, দরিদ্র হইলেও উচ্চবংশে তাহার জন্ম, আজীবন সে শুনিয়া আসিযাছে যে চুরি করার মত হীন কাজ ভদ্রসন্তানের পক্ষে আর নাই। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা ভাল, মোট বওয়া ভাল, কিন্তু চুরি করা কিছুতেই, কোনমতেই শ্রেয় নহে। কিন্তু আজ সে সেই সমস্ত শিক্ষা, পূর্বপুরুষদের সমস্ত কৃচ্ছ্র সাধনের গৌরবকে হেলায় তুচ্ছ করিল! তবু তাহার আগে মরিতে পারিল না!

একবার ভাবিল ফিরাইয়া দিই, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিল, নিঃশব্দে চুরি করা বরং সম্ভব, কিন্তু এখন গিয়া পুনরায় সকলের অজ্ঞাতসারে ফিরাইয়া দেওয়া আরও কঠিন। বহুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ়ভাবে সে বিছানার উপরেই বসিয়া রহিল, তারপর মুখ-হাত ধুইবার অছিলায় সে একবার রাজা বাহাদুরের ঘরের সম্মুখ দিয়া হাঁটিয়া চলিয়া গেল।

রাজা বাহাদুর তখনও ঘুমাইতেছেন। খুব সম্ভব আরও দুই-তিন ঘণ্টা ঘুমাইবেন। এখনও সরিয়া পড়িতে পারিলে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিবার আগেই পূর্বগামী ট্রেন হয়ত একটা পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার চুরি ধরা পড়িবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার অদৃশ্য হওয়াটা কি দুই আর দুইয়ে যোগ করার মতই সকলের চোখে সহজে ধরা পড়িবে না?

মানুষ যখন একবার একটা পাপ কাজ করিয়া ফেলে, তখন তাহার আনুষঙ্গিক চিন্তা বা কাজগুলিকেও সহজে মানিয়া লয়। অমলেরও তাহাই হইল। ইতিমধ্যেই সে তাহার মনকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিল যে, দশ টাকার নোটের নম্বর থাকে না, সুতরাং সে যদি হোটেলে বসিয়া থাকে তাহা হইলে চুরি ধরা পড়িলেও

তাহাকে ধরিবে কি করিয়া? এবং এমন কথাও তাহার মনে আসিতে বাধিল না যে, ঐ মদ্যপের হাতে টাকাটা থাকিলে-ত বাজে খরচ হইতই, বরং তাহার হাতে টাকাটা পড়িলে তাহার কাজে লাগিবে বলিয়াই ভগবান তাহাকে এই কাজে নিযুক্ত করিয়াছেন।

কিন্তু তবুও সে ঘরে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিল না, কম্পিতবক্ষে রাজা বাহাদুরের ঘুম ভাঙ্গিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহার সেই সময়কার পাংশু, বিবর্ণ মুখ ও অস্থির ভাব দেখিলে যে কোনও পুলিসের লোক বুঝিতে পারিত যে, সে কোনও একটা অত্যন্ত গর্হিত কার্য করিয়া প্রতিমুহূর্তেই তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলের আশা করিতেছে!

ঘণ্টাখানেক পরে রাজা বাহাদুরের ঘুম ভাঙ্গিল। তাঁহার হাঁকডাক, চাকরবাকরের ছুটাছুটি এবং হোটেলওয়ালাদের সন্ত্রস্ত ভাবেই সেই মহা ঘটনাটি বিজ্ঞাপিত হইল। সেই সময়কার প্রতি মুহূর্ত অমলের কাছে এক একটি যুগ বলিয়া মনে হইতে লাগিল। তাহার এক এক সময় মনে হইতে লাগিল যে, আশঙ্কায় তাহার হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়াই বন্ধ হইয়া যাইবে। চুরি করা যে এত কঠিন কাজ, তাহা সে জীবনে কোনদিন কল্পনা করিতে পারে নাই।

যাহা হউক—রাজা বাহাদুর দাড়ি কামাইয়া, স্নান সারিয়া, গাড়ি ডাকাইয়া বাহির হইয়া গেলেন। পকেটের অনেকগুলি নোটের সবগুলি আছে কি না সে হিসাব করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবও ছিল না, তিনি সে চেষ্টাও করিলেন্ না। কেবল অমলের পরমায়ুর অনেকখানি শুধু দুশ্চিন্তায় ক্ষয় হইয়া গেল।

কিন্তু সে একটু সুস্থ হইয়াই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। স্নান সারিয়া শেষবার হোটেলের অন্ন গ্রহণ করিল। বিভাসবাবুর মতই যে সর্বাপেক্ষা সার, ইহা সে এই ক'দিনে নিজের মনের মধ্যে অনুভব করিয়া লইয়াছিল, সেইজন্য হোটেলের চাকর-বাকরদের স্পষ্ট অবজ্ঞা হজম করিয়াও অনায়াসে সে সেদিনও সেখানের খাবারই আনাইয়া লইল। নিতান্ত প্রয়োজন ভিন্ন সে আর একটি পয়সাও খরচ করিবে না, মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে হোটেলে যখন সকলে কাজে ব্যস্ত তখন নিজের পরিধেয় কাপড়-জামাগুলি একটা খবরের কাগজে জড়াইয়া, যথারীতি ঘরে তালা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। রাস্তায় বাহির হইয়া যখন ট্রামে চড়িয়া বসিল, তখন তাহার বক্ষ ভেদ করিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইল। জীবনে যে সব আশা তাহার ছিল, আজ তাহার কোনটারই পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই, বরং এই বিপুল শহর, এই রাজধানীতে আসিয়া কলঙ্কের গভীরতম পঙ্কে সে নামিয়া গেল। জীবনে যদি কখন সে অর্থ উপার্জনও করে, তাহা হইলেও এ কলঙ্ক কখনই মুছিবে না!

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিল যে ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই কলিকাতাগামী একটা ট্রেন ছাড়িবে। সে কম্পিতবক্ষে একখানা টিকিট কিনিয়া কোনমতে একটা থার্ডক্লাস কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। ভয় তাহার হোটেলওয়ালাদের; যদি কোনও গাইড্ তাহাকে কলিকাতাগামী গাড়িতে চড়িয়া বসিতে দেখে, তাহা হইলে কি অবস্থা হইবে তাহা কল্পনা করিয়াই অমলের ললাটে ঘাম দেখা দিল। লাঞ্ছনার ত অবধি থাকিবে না, উপরন্তু হয়ত হাজতে যাইতে হইবে।

কিন্তু কোনমতে সে একঘণ্টা সময়ও কাটিয়া গেল এবং একসময়ে সত্যই ট্রেনখানা দিল্লির প্লাটফর্ম পার হইয়া চলিতে শুরু করিল। একটা লোক একটা বড় শহরে প্রাণপণ চেষ্টায় ঘুরিলেও অন্নসংস্থান করিতে পারে না, একথা কিছুদিন আগে পর্যন্ত বোধ হয় সে বিশ্বাস করিতে পারিত না, কিন্তু আজ আর সে বিষয়ে সংশয় নাই, আজ সেই ক্রমবিলীয়মান শহরের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল, আজ মনে হইল, মা-বাপ, ভাইবোনের মধ্যে থাকিয়া পঁচিশ টাকা আয়ও অনেক সুখের হইত।

কলিকাতায় ট্রেন পৌঁছিল পরদিন সন্ধ্যায়। হাওড়ায় বিপুল জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আশ্রয়ের চিন্তাটা তাহাকে বিপন্ন করিলেও সে যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হইল। মনে হইল যে এ তবু স্বদেশ, এখানে হয়ত উপবাস করিয়া মরিতে হইবে না! সে অন্যমনস্কভাবে বাহির হইয়া বাসের নিকট পর্যন্ত আসিয়া দ্বিধায় পড়িল, তারপর অভ্যাসবশত হ্যারিসন রোডের বাসেই উঠিয়া পড়িল। কলেজ স্কোয়ারের পাড়া

ছাড়া আর কোথাও আশ্রয়ের কথা সে মাথায় আনিতে পারিল না। কিন্তু ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মোড়ে পৌছিতেই যে লোকটি বাসে উঠিল, তাহাকে দেখিয়া আশঙ্কায় অমলের মুখ শুকাইয়া উঠিল। লোকটি আর কেহ নয়, আগের মেসের কার্তিকবাবু। তিনি উঠিয়াই অমলকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, আরে ভায়া যে! কোথায় থাক আজকাল? কি করছ?

কার্তিকবাবু তাহার পাশে আসিয়া বসিলেন। অমল অপ্রতিভ হইয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, কাজকর্মের চেষ্টায় একটু পশ্চিমের দিকে গিয়েছিলুম, সুবিধে হল না, তাই চলে আসছি—

কার্তিকবাবু অনুকম্পার স্বরে কহিলেন, কি আর বলব ভাই, ছেলেমানুষ তোমরা, মিথ্যে হাঁকড়-পাঁকড় কর। কল্‌কাতা ছাড়া পয়সা রোজগারের জায়গা আর নেই, যতই দিল্লি লাহোর যাওনা কেন!...তা মালপত্র ত নেই, সে সব কি রেখে আসতে হ'ল নাকি?

শেষের কথাগুলি নিম্নস্বরে বলিলেও অমলের মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। সেদিকে চাহিয়াই কার্তিকবাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, আরে কী আশ্চর্য, এতে লজ্জা পাবার কি আছে? এ কাজ আমার জীবনেই কি কম করেছি? বলি জুয়া ত আর আজ থেকে খেলছি না!...ওতে লজ্জা পেওনা ভায়া—ওতে লজ্জা পেওনা।

ততক্ষণে গাড়ি কলেজ স্কোয়ারের মোড়ে আসিয়াছে; উভয়েই বাস হইতে নামিয়া পেভমেণ্টে দাঁড়াইলেন।

কার্তিকবাবু কহিলেন, তার পর কোথা যাবে এখন?

অমল নতমুখে কহিল, তাই-ত ভাবছি, কোথায় যাই—

কার্তিকবাবু কহিলেন, ইস্‌ তাইত, সঙ্গে ত দেখছি বিছানাপত্রও নেই।...... তা এক কাজ কর, আজকের মত আমার এক ফ্রেণ্ডের কাছ থেকে একটা সতরঞ্চি আর বালিশ চেয়ে দিই, কোনও ধর্মশালা কি হোটেলে গিয়ে থাকো। কাল সকালে বাসা-টাসা খুঁজে নিও—। এই এখানেই, নবীনকুণ্ডু লেনে—

তাঁহার সহিত যাইতে যাইতে অমল প্রশ্ন করিল, ইন্দু আছে আপনাদের মেসে?

কার্তিকবাবু জবাব দিলেন, আছে বৈকি? পাস করেছে, কিন্তু স্কলারশিপটা পেলে না, চাকুরি খুঁজছে—

অমল কহিল, কাল আমার সঙ্গে সকালে দেখা করতে বলবেন? আমি যেখানেই থাকি আজ রাত্রে, কাল সকালে হেঁদোতে যাব, সকাল সাতটা-সাড়ে সাতাটার মধ্যে।

কার্তিকবাবু কহিলেন, বিলক্ষণ, তা বল্‌ব না কেন? এক ফাঁকে চুপি চুপি ভোরবেলাই জানিয়ে দেব এখন।

অমল আর কথা কহিল না, ভাবিতে লাগিল ইন্দুর কথা, বেচারী স্কলারশিপটা পাইল না তাহা হইলে! ইন্দুর উচ্চশিক্ষার আশা এইখানেই শেষ, পড়াশুনা আর চলিবে না। বেচারা!

নবীনকুণ্ডু লেনের এক জরাজীর্ণ বাড়ীর দ্বারে আসিয়া কার্তিকবাবু কড়া নাড়িলেন। বহুক্ষণ কড়া নাড়িবার পরে গৃহস্বামী একটি ভাঙা হ্যারিকেন হাতে দেখা দিলেন; বয়স কার্তিকবাবুর মতই, যদিচ চুল কিছু বেশী পাকিয়াছে। ছেঁড়া কাপড় পাট করিয়া পরিয়াছেন, তবু লজ্জা নিবারণ হওয়া কঠিন। কিন্তু কার্তিকবাবুকে দেখিয়াই স-কলরবে অভ্যর্থনা করিলেন, আরে কার্তিক যে, এস, এস, ইটি কে ভাই?

কার্তিকবাবু কহিলেন, এর জন্যেই এসেছি রে, একটা সতরঞ্চি, আর একটা বালিশ দিতে পারিস? এই ভদ্রলোক আজই দিল্লি থেকে আসছেন, বিছানা-বাক্স সব পথে চুরী গেছে; আজ রাত্রে শুতে হবে ত!···কী, পারবি দিতে?

বোধ হয় মুহূর্তকালের জন্য ভদ্রলোকের মুখ মলিন হইয়া উঠিল; খুব সম্ভব বালিশের অবস্থা চিন্তা করিয়াই; পরক্ষণেই কিন্তু আবার মুখে হাসি ফুটিল। কহিলেন, বিলক্ষণ, তা আর পারব না। আসুন দাদা, ভেতরে আসুন—আয় কার্তিক!

যেটি বাহিরের ঘর, সেটিরও অবস্থা শোচনীয়; একটি জীর্ণ তক্তপোশের উপর মসিমলিন সতরঞ্চি, তাহার উপর অজস্র কালিমাখা বইখাতা ছড়ানো; ছেলেরা ইহারই উপর বসিয়া পড়াশুনো করে বোঝা গেল। গৃহস্বামী লজ্জিতমুখে কহিলেন, বসতে বলব কি, ঘরের যা ছিরি!······আ মোলো, আবার ঘুঁটেগুলোও দেখছি ঝি-মাগী ঘরের মধ্যে তুলে রেখেছে!

শুধু ঘুঁটে নয়, এক বস্তা ছোবড়াও তোলা আছে ; আর আছে এক পুঁটুলি তুলা। ইঁদুরে কাটার ফলে ঘরময় ছড়াইয়া আছে। বইখাতাগুলা সরাইয়া একপাশে জড়ো করিয়া রাখিয়া বলিলেন, বসুন্ ভাই, ভেতর থেকে আস্‌ছি একটু, বোস্ কাত্তিক,···চা খাবি ?

কাতিকবাবু সম্মতি জানাইয়া বিঁড়ি ধরাইলেন। কহিলেন, এ হ'ল গঙ্গাধর, আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, এমন ভাল মন মানুষের মধ্যে দুর্লভ ! কিন্তু অবস্থা খারাপ, এই পৈত্রিক বাড়ী তাও বাঁধা আছে। মাইনে ত পায় মোটে বায়াত্তর টাকা !···পথে বস্‌তেই হবে একদিন,···তবু, এম্‌নি করে যে কটা দিন যায় !

অমল বিস্মিত হইয়া কাতিকবাবুর দিকে চাহিল, এই লোকটিকে এতদিন সে শুধু পাকা জুয়াড়ী বলিয়াই জানিত, কিন্তু ইহার মধ্যেও যে হৃদয় আছে, তাহা সে বোধ হয় কল্পনা করে নাই। মিথ্যাকথা সত্যকথার মতই অনায়াসে বলিয়া যায়, মানুষের চরম সর্বনাশের বার্তাও সহজ কণ্ঠে প্রকাশ করে, নিজের স্ত্রী-পুত্র সম্বন্ধে লোকটি সম্পূর্ণ নির্বিকার, কিন্তু তবুও কোথায় একটু হৃদয় এখনও আত্মগোপন করিয়া আছে। নহিলে তাহাকে পথ হইতে ধরিয়া আনিবে কেন ?

গঙ্গাধরবাবু ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, ওরে, মলিনার মা বলছিল যে ভদ্রলোকটি আজ থাকবেন কোথায় ? তোর বাসায় নিয়ে যাবি ?

কার্তিকবাবু কহিলেন, না সেখানে একটু অসুবিধা আছে।···আজ রাত্রে কোনও ধর্মশালায়, নয়ত হোটেলে থাক্, কাল বাসা খুঁজে নেবে এখন—

গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, তাতে দরকার কি, উনি আজকের রাতটা এখানেই থাকুন না, অবিশ্যি অসুবিধা হবেই একটু, কিন্তু ধর্মশালার চেয়ে ভাল হবে—

কার্তিকবাবু অমলের মুখের দিকে চাহিলেন , অমল ইতস্তত করিয়া কহিল, একটা রাত বৈ-ত নয়, খামকা ভদ্রলোকদের বাড়িতে উৎপাত করে লাভ কি ?

গঙ্গাধরবাবু প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, না, না, উৎপাত কিচ্ছু না, একটা রাত গরিবের ঘরে কোনরকমে থাকুন, কাল ধীরে সুস্থে বাসা খুঁজে নেবেন এখন।

অমল তবুও ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া কার্তিকবাবু কহিলেন, না না, কিচ্ছু ভয় নেই। সে রকম লোক হলে এখানে আনতুম না!...তুমি এখানে থাক, কাল সকালে ইন্দুকে বরং এখানেই আসতে বলব। আচ্ছা আসি তাহলে গদাধর—

ইতিমধ্যে বছর দশেকের একটি শ্যামবর্ণ মেয়ে চায়ের বাটি হাতে প্রবেশ করিল। কার্তিকবাবু কহিলেন, ওহো, চায়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।

চা খাইতে খাইতে কার্তিকবাবু চুপি চুপি কহিলেন, কোথায় বাসা নাও আমাকে জানিও ভায়া, আসছে শনিবার একটা নির্ঘাৎ খবর পাওয়া গেছে; বেশী নয়, দুটি টাকা দিও, বরাত ঘুরিয়ে দেব!

চা খাইয়া কর্তিকবাবু প্রস্থান করিলেন।

গঙ্গাধর কহিলেন, ভায়া কি চান করবে, তাহলে এস আস্তে আস্তে। যা অন্ধকার বাড়ি, কলতলাও ভাঙ্গা, আমি আলো ধরে নিয়ে যাই, সাবধানে চলে এস—

১০

স্নান ও আহার করিয়া অমল আবার বাহিরের ঘরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল ইতিমধ্যেই সতরঞ্চির উপর একটা ধোয়া শাড়ী বিছানো হইয়াছে এবং একটি ময়লা বালিশের উপর একটি ফর্সা তোয়ালে বিছাইয়া ভদ্রলোকের মত করা হইয়াছে। ইহাদের যত্নে বহুদিন পরে অমলের মা-বাবার কথা মনে পড়িয়া গেল। গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রী তাহার মায়ের মতই বসিয়া জোর করিয়া খাওয়াইলেন এবং মাথার দিব্য দিয়া বলিলেন যে, কাল যেখানেই বাসা ঠিক করুক না কেন, দ্বিপ্রহরের আহার সারিয়া তবে যেন যায়, আজ কিছুই খাওয়া হইল না।

ছেলেমেয়েগুলিও ভাল। যেমন শান্ত, তেমনি ভদ্র। অন্ধকারে ঘরে শুইয়া অমল, কার্তিকবাবুর কথাগুলি মনে পড়ায় শিহরিয়া উঠিল। এই অমায়িক পরিবারটিকে হয়ত সত্যই একদিন পথে বসিতে হইবে; ইঁহাদের দয়া-স্নেহ মমতার জন্য পৃথিবীর নিকট হইতে একবিন্দু করুণাও পাইবার সম্ভাবনা নাই—। মানুষের

দেনা-পাওনার সম্পর্ক সমস্ত বিশ্বের সহিত, পাওনার চেয়ে দেনা বেশী হইলেই আর তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিবে না।

পরদিন সকালে উঠিয়া মুখ ধুইতে ধুইতেই ইন্দু আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রায় তেমনিই আছে, শুধু মুখে দুশ্চিন্তার কয়েকটি গভীর রেখা পড়িয়াছে মাত্র।

সে নীরবে আসিয়া অমলের পাশে বসিয়া পড়িল। কি হইল, কেন অমল এমন শুধু হাতে ফিরিল, কোন কথাই জানিতে চাহিল না। নিজের দুর্ভাগ্য দিয়া পরের দুঃখের গভীরতা সে মাপিরে শিখিয়াছে, নীরব সহানুভূতিতে এই কথাটাই শুধু বুঝাইয়া দিল।

একটু পরে অমলই কথা কহিল, বলিল, স্কলারশিপটা রাখতে পারলেন না ?

ইন্দু একটা ছোট রকমের দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া জবাব দিল, না, বড্ড অভাব অমলদা, ক্ষিধেতে পেট জ্বলত, মাথা ঘুরত—পড়াশুনো তার মাথায় ঢুক্‌ত না। কিন্তু তবুও এতটা যে খারাপ হবে, তা ভাবিনি। শেষদিনটা পরীক্ষা দিতে গিয়ে কী যে মন খারাপ হয়ে গেল, মনে হল সব বৃথা, জীবনে এ-সবের কোন দাম নেই।—আর কিচ্ছু লিখতে পারলুম না।

অমল প্রশ্ন করিল, এখন কি করবেন ভাবছেন ?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু কহিল, আমাকে আর পড়াবার ক্ষমতা মামার নেই ; এখন চাক্‌রি খোঁজা ছাড়া আর উপায় কি ? কিন্তু তাই বা কৈ ? এই দু-তিন মাস কল্‌কাতার মেসে থেকে চাক্‌রি খুঁজছি, মামাকে ত কিছু পাঠাতে হচ্ছে, সেই কটি টাকা পাঠাতেই তিনি যে কি কষ্ট পাচ্ছেন তাও বুঝছি। কিন্তু উপায় কি বলুন! একটি দশ টাকার ট্যুইশনি, এই ত ভরসা।

অমল চুপ করিয়া রহিল, কী-ই বা জবাব দিবে!

ইন্দু পুনশ্চ কহিল, আপনি এখন কি করবেন ?

অমল কহিল, একটা বাসা-টানা খুঁজে নিতে হবে। তারপর যাব আমার সেই পুরাণো ছাত্রের বাড়িতেই—কিন্তু সে কি আর এখনও আছে ?

ইন্দু কহিল, আচ্ছা একটা কাজ করলে হয় না ? আমরা যদি একটা খুব

সস্তার ঘর দেখে নিয়ে দুজনে একসঙ্গে থাকি? আর নিজেরা রেঁধে খাই? তাহলে বোধ হয় আমাদের এই আয়েতেই চলে যায়।

অমলের মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, কহিল, সে ত বেশ হয়। আমি তাহলে বেঁচে যাই ইন্দুবাবু, একলা এত অসহায় মনে হয় নিজেকে; দুজন হলে তবু এক সঙ্গে ফাইট করা যায় দুর্ভাগ্যের সঙ্গে—

ইন্দু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাহলে চলুন এখনই বেরিয়ে পড়ি। আজই একটা বাসা ঠিক করে ফেলা যাক্—

এই সময়ে গঙ্গাধরবাবুর কন্যা দুইটি রেকাবীতে কিছু মুড়ী, বাতাসা, আর দুই কাপ চা লইয়া প্রবেশ করিল। অমলের বন্ধু আসিয়াছে, এ কথাটি গঙ্গাধর বাবুর স্ত্রীর দৃষ্টি এড়ায় নাই।

ইন্দু বিস্মিত দৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে চাহিল, অমল কহিল, অনেকদিন বাড়ি থেকে বেরোবার পর আবার মা খুঁজে পেয়েছি ইন্দুবাবু! কিন্তু আমারই মা— দুর্ভাগ্যের দিক দিয়ে অন্তত।

তাহার পর মুড়ী খাইতে খাইতে অমল গতকল্যকার ইতিহাস ইন্দুকে সব খুলিয়া বলিল। ইন্দু কহিল, কার্তিকবাবু লোকটিকে আমারও খুব খারাপ বলে মনে হয় না। আজ ভদ্রলোক রাত থাক্‌তে গিয়ে ডেকে তুলে আপনার খবরটি শুনিয়ে দিলেন। কিন্তু সব কথা সেরে বেরোবার সময় ঐ এক কথা—আসছে শনিবার একধা সিওর টীপ ভাই, দুটী টাকা উইনে ফেলে দাও, দশটি টাকা নিয়ে বাড়ী ফিরবে। আশ্চর্য, না?

অমল উন্মনা হইয়া কহিল, আশ্চর্য কিছুই না ইন্দুবাবু—সমস্ত রকমের দোষ আর গুণ মিলিয়েই প্রত্যেকটি মানুষ তৈরী, এর মধ্যেই সব আছে!

জলযোগের পর দুই বন্ধু বাহির হইয়া পড়িল বাসা খুঁজিবার জন্য। কিন্তু শহরের প্রায় তাবৎ সরকারী প্রস্রাবখানা ও গ্যাসপোষ্ট দেখিয়াও তাহাদের মনের মত বাসা পাওয়া গেল না। ঘরের ভাড়া তাহাদের আয়ের তুলনায় অনেক বেশী। সস্তার মেসের সস্তার সীটও পছন্দ হয় না। শেষ পর্যন্ত বেলা

দ্বিপ্রহরের পর ছুতারপাড়ার নিকট একটি মাটির ঘর তাহারা ভাড়া করিয়া ফেলিল। সিমেণ্টের মেঝে, মাটির দেওয়াল এবং খোলার চাল। কিন্তু ঘরটির রাস্তার দিকে দোর বসানো এবং জলকলের সুবিধা আছে; ভাড়া চার টাকা। শুধু তাহাই নয়, পূর্ববর্তী কোন্ এক ভাড়াটিয়া দুইটি আমকাঠের চৌকী ফেলিয়া গিয়াছে, সে দুটিও পাওয়া যাইবে।

অমল নিজের পকেট হইতে চার টাকা অগ্রিম দিয়া ঘর সেইদিন হইতেই ভাড়া করিল এবং আহারাদির পর সামান্য শয্যা কিনিয়া আনিয়া রাত্রিবেলাই নূতন ঘরে চলিয়া আসিল। গদাধরবাবু ও তাঁহার স্ত্রী বার বার বলিয়া দিলেন, যখনই অসুবিধা হবে, এখানে চলে এস বাবা, লজ্জা করো না।

গঙ্গাধরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যা বিপুল দেনা, রাত্রে দেনার চিন্তায় ঘুম হয় না; মরমে মরে রয়েছি। নইলে তোমার মত ছেলেকে দুটোদিন থাক্‌তে বলতে কি ইচ্ছে করে না? কি করব—ভগবান মেরে রেখেছেন!

ইন্দুও পরের দিন মেসের দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া চলিয়া আসিল। দুজনে অপটু-হস্তে রান্না করিয়া খাইতে লাগিল এবং আশা করিতে লাগিল যে, এ-দিন হয়ত শীঘ্রই কাটিবে।

দীর্ঘ দিন এবং দীর্ঘ রাত্রি।

অতি মন্থরগতিতে তাহাদের দুঃসহ দিন-রাত্রি কাটিতে লাগিল। কিছুই হয় না। কোনদিনই দৈবাৎ তাহাদের কোন সুসংবাদ আসে না। অতিকষ্টে উপার্জিত এবং আত্মাকে বঞ্চিত করা পয়সা হইতে শুধু মধ্যে মধ্যে ষ্ট্যাম্পের পয়সা বাজে খরচ হয় মাত্র। কেরানীর কাজ, ট্যুইশন, ভদ্রভাবে অর্থ উপার্জনের যত পথ আছে, সবগুলিতে মাথা ত ঠুকিলই, এমন কি থিয়েটার ও বায়স্কোপের গার্ডের চাকরির জন্যও দরখাস্ত করিতে ক্রটী করিল না; কিন্তু পরে বুঝিল সেখানেও সুপারিশের প্রয়োজন হয়। অমলের পুরাতন ট্যুইশনটি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়াই শুধু গ্রাসাচ্ছাদন সম্ভব হইতেছিল

অবশেষে ইন্দুর মুখে স্পষ্ট হতাশা ফুটিয়া উঠিল। সে আর পারে না। মাঝে মাঝে অমলকে বলে, অমল-দা, ভাল খাবারের অভাবে এত কষ্ট হয়, তা আগে ভাবতে পারি নি! ভাব্‌তুম যে, ওটা ছেলেবেলাকারই ব্যাপার, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যের লোভটা অন্য লোভে দাঁড়ায়। কিন্তু এখন দেখছি ভাল খাবারের জন্য পরিণত বয়সের লোকের মনও ঠিক শিশুর মত চঞ্চল হয়ে ওঠে! এক এক সময়ে আমি খাবারের দোকানের সামনে দিয়ে চল্‌তেই পারি না।

অমল চুপ করিয়া শোনে। তাহার লোভ ও কামনার উৎস-মুখ কে যেন নীরেট পাথর দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে, কিন্তু তবুও তাহার মনে হয় তাহার আত্মা যেন বহুদিন উপবাসী, ক্ষুধার্ত হইয়া আছে।

একদিন, কি একটা লগন্‌না সেদিন, অমল সহসা সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া কহিল, এই ইন্দুবাবু, ফরসা কাপড় আছে?

ইন্দু বিস্মিত হইয়া কহিল, আছে, কেন?

অমল কহিল, কাপড় জামা পরে নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন, চলুন কোথাও নেমন্তন্ন খেয়ে আসা যাক্‌---

ইন্দু আরও বিস্মিত হইয়া কহিল, তার মানে?

অমল কহিল, আজ অনেক বিয়ে, কোনখানে ভীড় বেশী দেখে ঢুকে পড়া যাক্‌, কে আর চিন্‌বে?

নিমন্ত্রণ অর্থে সুখাদ্য; লোভে ও ভয়ে বিবর্ণ হইয়া ইন্দু প্রশ্ন করিল, যদি ধরে ফেলে?

অমলও উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, কহিল, কে ধরবে? পাগল! বরযাত্রীরা মনে করবে কন্যাপক্ষের লোক, আর কন্যাপক্ষরা মনে করবে বরপক্ষের—চলুন চলুন।

সত্য-সত্যই দুজনে বাহির হইয়া পড়িল। খানিকটা ঘুরিয়া একটা বড় বাড়ীর সম্মুখে ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। উৎসবের সমারোহ দেখিয়া মনে হইল বড়লোকের বাড়ি, অভ্যর্থনার বিশেষ ঝঞ্ঝাট থাকিবেনা, কিন্তু খানিকটা যাইতেই একটি মোটা গোছের ভদ্রলোক সহাস্যবদনে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, আসুন, আসুন ... এই যে এদিকে—

ইন্দুর মুখের অবস্থা কল্পনা করিয়া অমল তাহার হাত ধরিয়া এক রকম টানিয়া লইয়া একটু ভীড়ের মধ্যে গিয়া বসিল। তাহার পরের ঘটনা নিতান্তই সাধারণ এবং স্বাভাবিক। গোলাপ জল, গোলাপের 'বোকে', প্রীতি-উপহার ও সর্বশেষে ভোজ। আহার্য্যের সুগন্ধে ইন্দুর মুখে হাসি ফুটিল, সে একাগ্রমনে খাইয়া যাইতে লাগিল।

আহারাদির পর রাস্তায় বাহির হইয়া পথ চলিতে চলিতে ইন্দু কহিল, এরা খাইয়েছে বেশ, না ?

অমল অন্যমনস্ক-ভাবে জবাব দিল, হুঁ।

তাহার পর একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি শুধু ভাবছি অভাবে মানুষ কতখানি নীচেই নেমে যেতে পারে। এই রকম চুরি করে খাওয়ার কথা কি আর তিন বছর আগেও ভাবতে পারতেন ?

ইন্দুর মনে তখনও সুখাদ্যের একটা মধুর রেশ ছিল। অমলের কথায় অকস্মাৎ কে যেন চাবুকের বাড়ি তাহাকে মারিল। সে কিছুক্ষণ বিবর্ণমুখে রাস্তার দিকে চাহিয়া চলিবার পরে ঈষৎ ক্ষুণ্ণ-কণ্ঠে কহিল, কিন্তু ওদের ত এমনই অনেক ফেলা যেত! আমরা দুজন আর কতই বা খেয়েছি ?

অমল কহিল, তা বটে। কিন্তু তাতে আমাদের অপরাধ কমে না।...যাক্ গে, ও সব ভেবে আর এখন লাভ নেই।

ইন্দু আর কথা কহিল না। তাহার পেটের মধ্যে লুচি আর মিষ্টান্ন তাল পাকাইয়া পাথরের মত ভারি হইয়া উঠিয়াছিল।

১১

আরও মাস কতক পরে সহসা একদিন ইন্দু কহিল, অমলদা, আমি বিয়ে করছি !

অমল আশ্চর্য হইয়া কহিল, তার মানে ?

ইন্দু চৌকীটার উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল, আর এ-রকম করে পারি না, একটু বৈচিত্র্য দরকার। যা অদৃষ্টে আছে হোক—

অমল একটু অসহিষ্ণুভাবেই কহিল, তার মানে কি ? কী ব্যাপার ?

ইন্দু কহিল, আমার এ ট্যুইশনটিও ত যাবে যাবে হয়েছে, আমি ভদ্রলোককে খুব কাকুতি মিনতি করে বলেছিলুম আর একটা ট্যুইশনের জন্যে। অবশ্য নিজের অবস্থাও খুলে বলেছিলুম। তিনি আজ আমাকে ডেকে বললেন যে, তাঁর এক বন্ধু আছেন, কোথাকার পাটকলের বড়বাবু, তাঁর একটি মেয়ে আছে ; মেয়েটি শ্যামবর্ণ—

অমল কহিল, তারপর ?

ঈষৎ লজ্জিত নতমুখে ইন্দু কহিল, সে ভদ্রলোকের মেয়েটিকে যদি আমি বিয়ে করি ত তিনি আমায় টাকা চল্লিশেকের মত একটা চাকরী করে দেবেন। তা ছাড়াও বিয়ের খরচ বলে মামার হাতে হাজার-খানেক টাকা দিতে রাজী আছেন, গয়না দান-সামগ্রী আলদা—

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, কিন্তু চল্লিশ টাকা মাইনেতে কি হবে, এ দারিদ্র্য কি আর ঘুচবে ? তা ছাড়া বিয়ে করলেই ত ছেলেপুলে হবে, তখন ? শেষকালে ঐ গঙ্গাধরবাবুর মতই ত হবে।

ইন্দু সারা পথ একটা সুখস্বপ্নের জাল বুনিতে বুনিতে আসিয়াছিল, সহসা বাস্তবের আঘাতে তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিল, সে কহিল, আপনি বড্ড সব জিনিসের ডার্ক সাইড দেখেন !—সে মেয়েটি তার বাপের একমাত্র মেয়ে, তার সাচ্ছন্দ্যের মুখ চেয়েও ভদ্রলোক নিশ্চয় প্রাণপণে চেষ্টা করবেন আমার উন্নতির জন্যে।

অমল উঠিয়া বসিয়া কহিল, তা বটে, ভালও হতে পারে ; তবে ঘরপোড়া গরু আমি, কোনওটাতেই ভাল কিছু যেন দেখতে পাই না।

ইন্দু উৎসাহিত হইয়া কহিল, চাই কি, আমি যদি আপিসে ঢুকি ত সুবিধে মত আপনাকেও ঢুকিয়ে নিতে পারি। কি বলেন ?

অমল মনে মনে বিশেষ উৎসাহ না পাইলেও মুখে বলিল, তা বটেইত।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ইন্দু খামকা বলিয়া ফেলিল, আমি তাদের কথা দিয়ে এসেছি!

অমল দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, কথা দিয়ে এসেছেন একেবারে ?

মুখ নীচু করিয়া ইন্দু জবাব দিল, হ্যাঁ, ভেবে দেখলুম ইতস্তত করে বিশেষ লাভ নেই। যা হয় হোক—। কাল মামাকে চিঠি লেখে দেব।

আরও কিছুক্ষণ পরে ইন্দু কহিল, মামার যে কি দারিদ্র্য তা আপনি জানেন না অমলদা, কিন্তু আমি জানি। বেচারি আমার খরচ জোগাতে গিয়ে ভিটেটি শুদ্ধ দেড়শ' টাকায় বাঁধা দিয়েছেন, তার ওপর চালে আজ তিন বছর খড়ের কুটোটি শুদ্ধ ওঠেনি। হাজার টাকায় তাঁকে নিঋণী করে ঘরদোরগুলো যদি ভাল করে একবার ছাইয়ে দিতে পারি ত তাই আমার লাভ। ইহজীবনে ত আর কোন কাজে এলুম না!

অমল যেন নিজের মন হইতেই দুশ্চিন্তা ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য গলায় জোর দিয়া কহিল, না মিছে ভাববেন না। সত্যিই ত, এর চেয়ে আর কি খারাপ অবস্থা আমাদের হতে পারে ?

দিন-পাঁচেক পরেই ইন্দুর মামা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার দুই চোখে জল, মুখে হাসি। ইন্দুকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, কি শান্তি যে আমাকে দিলি বাবা, তা আর কি বলব। তুই বিয়ে-থা করে ঘরবাসী হলি, এইটুকু যে আমি দেখে যেতে পারলুম, এই ঢের।

তার পর একটু দম লইয়া কহিলেন, রাঙাটুকটুকে বউ আনব, ইন্দু আমার ঘরসংসার করবে এই দেখে বুড়ো-বুড়ী চোখ বুজব! তা মানুষের সব সাধ পোরে না। বড়লোকের মেয়ে আমার মাটীর ঘরে ঘর করবে না, কিন্তু তবু তুই ত সুখী হবি!—নাই করলে সে আমার ঘর!

ভাঙা ছাতিটায় চোখের জল মুছিয়া পুনশ্চ কহিলেন, কিন্তু বিয়ের নিয়ম-কর্ম-গুলো আমার ওখান থেকেই হবে ত? তা নইলে তোর মামী বড় দুঃখু পাবে।

ইন্দু ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়াছিল, বোধ করি তাহার চোখও শুষ্ক ছিল না। সে কহিল, কেন মিছে ভাবছেন মামা। তা নইলে আমি রাজী হবো কেন?

মামা শুধু নীরবে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে লাগিলেন, কথা কহিলেন না। অমল একটুখানি হাসিয়া কহিল, আমার অবস্থাটা এবার কাহিল হল আর কি।

ইন্দু যেন নিমেষে ম্লান হইয়া উঠিল, কহিল, সত্যি দাদা, আপনি একলা এই ঘরে—তাইত!—আচ্ছা, আমি কয়েক মাস আমার শেয়ারটা যদি চালিয়ে যাই, আপনি রাগ করবেন?

অমল জবাব দিল, সবই ত জানেন ইন্দুবাবু, অতখানি সৌখীন ভদ্রতার অবস্থা কৈ?

ক্রমশ ইন্দুর বিবাহের দিন অগ্রসর হইয়া আসিল। তাহার এক অতি দূর-সম্পর্কের ভগ্নির বাড়ি হইতে পাকা দেখার কাজটা সারা হইল, মামা তাহার পর দেশে গিয়া অল্প দুই একজন আত্মীয়স্বজনকে কথাটা জানাইয়া আসিলেন এবং ইন্দু তাহার দুই-একজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিল মাত্র। কিন্তু মামা এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন যে, বিবাহের পর খরচার অঙ্কটা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে ভাবিয়া ইন্দু ও অমল শঙ্কিত হইয়া উঠিল। পাকা দেখার দিন পাত্রীপক্ষ পাঁচশ টাকা দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে তিনি আড়াইশ টাকার গায়েহলুদেরই বাজার করিয়া ফেলিনেন। তখন ইন্দু তাঁহাকে কতকটা জোর করিয়াই বাকি টাকাটা দিয়া দেশে পাঠাইয়া দিল এবং মাথার দিব্য দিয়া দিল যেন তিনি দেনাটা শোধ না করিয়া কোনমতেই টাকাটা অন্য কোন বাবদে খরচ না করেন।

ইন্দু অমলকে ধরিয়া বসিল তাহার বিবাহে দেশে যাইতেই হইবে। অমলেরও বিশেষ আপত্তি ছিল না, সে সহজেই রাজী হইল। ছাত্রদের নিকট হইতে সাত দিনের ছুটী লইয়া সে প্রস্তুত হইল এবং বিবাহের পরদিন একেবারে বরকন্যার সঙ্গে দেশের ট্রেনে চাপিয়া বসিল।

দেশে আসিয়া ইন্দু মামীমার নিকট দেনার খবর লইল। শোনা গেল, মামা সুদ ও আসলের পঞ্চাশটি টাকা মাত্র দেনা শোধ করিয়াছেন, সামান্য কিছু ঘরদোর মেরামতি কার্যে ব্যয় হইয়াছে এবং বাকী সমস্ত টাকাটাই তিনি ভোজের আয়োজনে জেলে, গোয়ালা প্রভৃতিকে বায়না দিয়া গিয়াছেন।

ইন্দু মামাকে ধরিয়া তিরস্কার করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তিনি তখন দিশাহারা। ইন্দুর শ্বশুররা জিনিসপত্র ভালই দিয়াছিলেন এবং কন্যার গায়ে গহনাও খুব কম দেন নাই। মামা গ্রামসুদ্ধ লোককে ডাকিয়া সেই সব জিনিস দেখাইতে লাগিলেন এবং পাগলের মত প্রত্যেককে বলিতে লাগিলেন, ইন্দু আমার রাজকন্যা বিয়ে করবে একথা বলিনি তোমাদের? সাক্ষাৎ রাজার মেয়ে বিয়ে করে এনেছে, আশীর্বাদ কর যেন বেঁচে থেকে ভোগ করতে পারে—

ইন্দুর অনুরোধে অমলও তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিল, এসব কি করছেন মামা? এখন কি এসব শোভা পায়? দিন কতক যাক না—

মামা হাত-পা নাড়িয়া তাহাকে জবাব দিলেন, তুমি বোঝ না বাবা অমল; ইন্দুর শ্বশুর আমার সাক্ষাৎ দেবতা, তাঁরা যেমন প্রাণপুরে দিয়েছেন, তার মর্যাদা রাখতে হবে ত? আর তা ছাড়া ইন্দুর একটা চাকরী হলে কিসের অভাব বাবা আমাদের? এমন দিনে আমোদ না করলে কবে করব?

অমল কহিল, কিন্তু চাকরী হোক আগে, আগে থাকতেই তার টাকার হিসেব ধরা কি উচিত?

বৃদ্ধ সোৎসাহে কহিলেন, চাক্‌রী ক'রে দেবে না? নিশ্চয় দেবে! কি বলছ, অমল, এ নিজের মেয়ে-জামাইয়ের সুখদুঃখের কথা যে! এ না দিয়ে যাবে কোথায়? সে সব তুমি কিছু ভেবো না।

তিনি পুনশ্চ উত্তরের অপেক্ষা মাত্র না করিয়া দ্রুত অন্য কাজে চলিয়া গেলেন। ইন্দু হতাশ হইয়া কহিল, কি হবে দাদা, মামা হয়ত গ্রামসুদ্ধ লোকই নিমন্ত্রণ করে আসবেন!

অমল কহিল, খুব সম্ভব।

তাহাদের আশঙ্কা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গেল সন্ধ্যাবেলায়। স্বগ্রামের লোক-ত সকলে আসিলই, নিমন্ত্রণের উদারতা দেখিয়া ভিন্ন গ্রামের লোকও বিনা-দ্বিধায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আয়োজন যাহা হইয়াছিল তাহা নিঃশেষে উড়িয়া গেল, তারপর সম্মান রক্ষার জন্য ছুটাছুটী দৌড়াদৌড়ির অন্ত রহিল না। সমস্ত খাওয়া-দাওয়া শেষ হইলে ক্লান্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ইন্দু যখন জীবনের মধুরতম রজনীর অপেক্ষায় ফুলশয্যার দিকে অগ্রসর হইল তখন সূর্যদেব পূর্বাকাশে দেখা দিয়াছেন এবং এদিকে বরপণের সমস্ত টাকা নিঃশেষে উড়িয়া গিয়া টাকা ত্রিশ-চল্লিশ বাজারে ধার পড়িয়াছে।

ইন্দু ফুলশয্যার নিয়মকর্ম শেষ করিয়া বিছানায় না শুইয়াই বাহিরে চলিয়া আসিল এবং শুষ্কমুখে অমলকে ডাকিয়া লইয়া বাহিরের বাগানে একটা আমগাছ-তলায় শুইয়া পড়িল।

কি হবে অমলদা?

অমল তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিল, কি করবেন বলুন? মামা আপনার জন্য অনেক কষ্টই করেছেন, একটা দিন না হয় জীবনে তাঁকে আনন্দ করতে দিলেনই? আর সেও-ত আপনারই জন্য!

ইন্দু ভয়ে ভয়ে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, আচ্ছা, চাকরী ওরা করে দেবে বোধ হয়, কি বলেন?

অমল কহিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেবে বৈকি! নিজের জামাই যদি কষ্ট পায় তাহলে মেয়েরও ত কষ্ট হবে।

ইন্দু ট্যাঁকের মধ্য হইতে গোটা-বাইশ টাকা বাহির করিয়া কহিল, এই কটা কাল যৌতুকের বাবদ পাওয়া গিয়েছিল, এ কটা টাকা আর মামার হাতে পড়তে দিই নি। দশটা টাকা আপনার কাছে রাখুন, মাস পাঁচেকের জন্য অন্তত ঘরটা রাখতে পারবেন। কিছু নিজের কাছে না রাখলেও নয়; শ্বশুরবাড়ি যাওয়া-আসা আছে, কলকাতায় যাওয়ার খরচা আছে, মামার হাতে বোধ হয় একটা পয়সাও নেই আর।

দুজনেই খানিকটা চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

ইন্দু কহিল, কাজটা ঝোঁকের মাথায় করে ফেলে যে ভাবনা হচ্ছে! এখনই যদি চাকরী না পাওয়া যায় তাহলে যে কি করব ভেবে পাচ্ছি না।

অমল কহিল, বিয়ের ঐ দিকটাই শুধু দেখছেন ইন্দুবাবু, তাতে আপনার স্ত্রী বেচারীর ওপর কি একটু অবিচার করা হচ্ছে না?

লজ্জিত হইয়া ইন্দু কহিল, তা বটে। কিন্তু উপায় কি বলুন!…আচ্ছা, বৌ কেমন দেখলেন অমলদা?

অমল একটু ভাবিয়া কহিল, মন্দ কি! রংটা ময়লা বটে কিন্তু বেশ

সত্যই ইন্দুর বৌ মন্দ হয় নাই। কালো রং কিন্তু অল্প বয়স ও মুখশ্রী ভাল বলিয়া ভালই দেখায়। তাহার চোখে যে চমৎকার একটি বুদ্ধির আভা আছে তাহাও সহজে নজরে পড়ে।

ইন্দুর মুখ নিমেষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, তাহলে এ পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে আমি ঠকিনি। এখন শেষ রক্ষা হলে হয়।

অমল প্রসঙ্গান্তরে যাইবার জন্য প্রশ্ন করিল, মামা কোথায় গেলেন?

ইন্দু জবাব দিল, কাল ফুলশয্যার তত্ত্বে যে মিষ্টি এসেছে, তাই পাড়ায় বিলোতে গেছেন। সেটা অবশ্য নামে। ওরা মামীমাকে ত গরদের শাড়ী নমস্কারী দিয়েছেই, উপরন্তু ওঁকেও একখানা গরদের ধুতি দিয়েছে; আসল কাজ হোল সেই দুটোই পাড়ায় দেখাতে যাওয়া—

বাগানের অসংখ্য গাছের পাতায় পাতায় সোনালী রোদ ঝিকমিক করিতেছিল, পাখীদের প্রভাতী গানে সুনিবিড় শান্তির আভাস। সেদিকে এবং আলো-ঝলমল সুদূর আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিলে মনে হয়, এ পৃথিবীতে কোথাও বুঝি কোন অভাব, কোন অশান্তি নাই। এই তরুণ যুবক দুটিও বহুক্ষণ নিঃশব্দে বহিঃপ্রকৃতির সেই অপূর্ব রূপভাণ্ডারের দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইন্দু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাই, আবার ওদিকের একটু গোছগাছ করা

দরকার। বাড়ির যা অবস্থা হয়ে আছে, যেন চাইতেই পারছি না।…তা ছাড়া হিসেবটাও একটু জানা দরকার—Where we stand!

সে চলিয়া গেল। অমল আর উঠিল না; একটু পরেই ক্লান্তিতে তাহার চোখের পাতা দুইটি বুজিয়া আসিল।

১২

মামা সন্ধ্যাবেলা অমলকে ডাকিয়া কহিলেন, মোটে সাতচল্লিশটি টাকা বাকী পড়েছে। এটা কি একটা দেনা হ'ল? এত বড় একটা বৃহৎ কাজে এই ক'টা টাকা ধার পড়বে না?…ইন্দু ত ভয়ে মুখ শুকিয়ে অস্থির; আবার বলে বৌমার একখানা ছোটখাট গয়না বেচে ধারটা শোধ ক'রে দিতে! ছিঃ ছিঃ, এই কি একটা কথা?…তুই বেঁচে থাক্, চাকরী-বাক্‌রী হোক্—টাকাটা শোধ দিতে কতক্ষণ? কি বল বাবা?

অমলকে অগত্যা বলিতে হইল, তা বটেই ত!

ইন্দুর ঋণ-শোধের স্বপ্নকে অদৃষ্ট কি নিষ্ঠুরভাবে পরিহাস করিলেন, সেই কথাটা ভাবিয়া তাহার দুঃখ হইল। অথচ উপায় কি?

কিন্তু ইন্দুর মনের মধ্যে তখন তারুণ্যই জয়ী হইয়াছে। সে সন্ধ্যাবেলা চুপি চুপি অমলকে ডাকিয়া কহিল, শেষ রাত্তিরে একবার বাগানের দিক দিয়ে ঘুরে আমার ঘরের জানলায় যাবেন, ওর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব, কেমন?

তাহার চোখে মুখে রোমান্সের রঙ্। অকস্মাৎ সেদিকে চাহিয়া অমলের মন যেন দুলিয়া উঠিল, সে কহিল, নিশ্চয় যাব, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা কইবে ত?

তাহার হাত দুইটা ধরিয়া ইন্দু জবাব দিল, সে আমি কওয়াব নিশ্চয়। আপনাকে যেতে হবে কিন্তু!

রাত্রে শুইয়া অমলের ঘুম হইল না। আশ্চর্য! মনে হইয়াছিল এ জীবনে বাসা

বাঁধিবার স্বপ্নকে সে বহুদিন পশ্চাতে ফেলিয়া আসিয়াছে কিন্তু আজ তাহার এ কিসের উত্তেজনা? তবে কি মানুষের স্ত্রী-পুত্র লইয়া ঘর করিবার আশা কোনদিনই যায় না?

বহুক্ষণ বিছানায় শুইয়া ছট্‌ফট্ করিবার পর সে বাগানে বাহির হইয়া পড়িল। চাই, রোমান্স চাই, ভাবাবেগ চাই, জীবনের কাব্য চাই—নহিলে মানুষ বাঁচিতে পারে না!

ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে সত্য-সত্যই সে যখন ইন্দুর শয়নঘরের জানলার ধারে গিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রহিল না। অপরে নবোঢ়া কিশোরী বধূর সহিত প্রেমালাপ করিতেছে, সেখানে তাহার স্থান কোথায়? সে নিজে এ সব ব্যাপারের উর্ধ্বে চলিয়া গিয়াছে এই-ত তাহার বিশ্বাস, তবে আজ এ কৌতূহল কেন? এ প্রবৃত্তি কোথা হইতে আসিল?...

ইন্দু জাগিয়া ছিল, সে জানলাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিয়া কহিল, এসেছেন অমলদা, উঃ কী ভীষণ লোক এ, আমার সঙ্গেই কিছুতে কথা কইবে না! কত সাধ্য-সাধনা ক'রে, কত হাতে পায়ে ধ'রে তবে কথা বলিয়েছি—এই আবার পালাচ্ছে!

ঘরে প্রদীপ জলিতেছিল, তাহারই ম্লান আলোতে কমলার মুখখানি বড় ভাল লাগিল। গত রাত্রেও কে তাহাকে চন্দন পরাইয়া দিয়াছিল, তাহারই কিছু কিছু চিহ্ন তখনও তাহার মুখে লাগিয়া; সলজ্জ হাসিতে ঠোঁট-দুটি ঈষৎ কম্পিত, চোখে লজ্জা ও সুখের আবেশ মাখানো।

তাহার হাত ধরিয়া জোর করিয়া জানলার কাছে টানিয়া আনিয়া ইন্দু কহিল, ইনি আমার বন্ধু অমলবাবু, আর এটি আমার স্ত্রী কমলা—। এই শোন, অমলদা'র সঙ্গে আলাপ কর!

কমলা লজ্জিতভাবে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল এবং স্বামীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিল, কথা কহিতে পারিল না। সেদিকে চাহিয়া ক্ষণকালের জন্য অমল নিজের জীবনের সমস্ত বেদনা যেন ভুলিয়া গেল এবং মনে হইল পৃথিবীতে সেদিন ইন্দুর

অপেক্ষা সুখী কেহ নাই। সে-ও আব্‌দারের সুরে কহিল, কথা কইবেন না ত?

কমলা বিষম বিপন্নভাবে মাথা নীচু করিয়া রহিল; হাতের মধ্যে তাহার স্বেদসিক্ত হাতখানি থর-থর করিয়া কাঁপিতেছে দেখিয়া ইন্দু সস্নেহে কহিল, ভয় কি লক্ষ্মীটি, কথা কও, নইলে অমলদা কী ভাববেন বল দেখি!

কমলা তবুও কথা কহিতে পারিল না, একবার মাত্র মুখ তুলিয়া অমলের দিকে চাহিয়াই পুনরায় দ্বিগুণ লজ্জায় মুখ নামাইয়া লইল। অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়াছিল; সে কহিল, তাহ'লে আমি যাই ইন্দুবাবু, উনি যদি কথা না কন্ ত কি দরকার ওঁকে বিরক্ত করার?

ইন্দু কহিল, দেখ উনি চলে যেতে চাইছেন—

অমলও খানিকটা ঘুরিয়া দাঁড়াইল। এই বিপদে কমলা ঘামিয়া নাহিয়া উঠিয়াছিল, অথচ সত্যসত্যই অমল কিছু মনে করিবে ভাবিয়া সে কোনমতে জড়িত কণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, কথা কইছি ত।

ছোট্ট ছুটি কথা! কিন্তু অমলের মনে হইল যেন এত মিষ্ট কণ্ঠ সে কখনও শোনে নাই। তাহার বুকের সব কটা তারে যেন সেই কণ্ঠস্বর ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। সে বলিল, ইন্দুবাবু, উনি বড়ই বিপন্ন বোধ করছেন, ওঁকে আর টানাটানি করবেন না, আমার মান যে উনি রেখেছেন এতেই ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমি এখন যাই—

আসল কথা সে নিজের এই অভূতপূর্ব্ব অভিজ্ঞতাটাকে একটু নির্জনে অনুভব করিতে চায়! সে আর ঘরে না ফিরিয়া প্রথম ঊষার অস্পষ্ট আলোতেই বাগানে পায়চারী করিতে লাগিল। বহুক্ষণ ধরিয়া এই কথাটাই সে বারবার মনে মনে বলিতে লাগিল, রোমান্স কিছুতেই মানুষের মন হইতে মুছিয়া যায় না, সে চিরদিন থাকে এবং চিরদিনই তাহার থাকা দরকার। নহিলে পৃথিবীতে জীবনের কোন মূল্যই থাকিত না।

পরের দিন বেলা বাড়িতেই সে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার প্রস্তাব করিল, কিন্তু ইন্দুর মামা ঘোরতর আপত্তি তুলিলেন; যে মানুষটিকে অমল ইন্দুর মামা

বলিয়া জানিত, সে মানুষটি যেন আর নাই, এ যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন লোক। অর্থাৎ ইন্দুর বিবাহের যে অভাবনীয়ত্ব, তাহার ঘোর তখনও তাঁহার মন হইতে কাটে নাই ; সেই রেশটুকুই তখনও তাঁহার গলার স্বরে। তিনি প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া তাহার পিঠে চাপড় মারিয়া কহিলেন, পাগল নাকি ? আজ কিছুতে হ'তে পারে না। না, সে আমি কোন মতেই শুনব না। এ ক'দিন তোমার মোটে খাওয়া দাওয়া হয়নি, আমরা ত নজর দিতেই পারিনি।

ইন্দুকে কথাটা বলিতে গেল কিন্তু সেদিকেও বিশেষ সুবিধা হইল না। সে কহিল, কী দুর্ভাবনা আর কী অবস্থায় রয়েছি বুঝছেন ত ? আপনি চলে গেলেই যেন বিভীষিকার মত সেগুলো ঘাড়ে এসে পড়বে। আর একটা দিন অন্তত থেকে যান্—আপনি আছেন তবু একটু রঙ্গীন নেশায় আছি যেন। না, আজকের দিনটা না থাকলে সব মাটী হয়ে যাবে—

শেষের দিকে তাহার গলার স্বর কাঁপিয়া উঠিল। সুতরাং অমল আর কথাটায় জোর দিতে পারিল না কিন্তু বুঝিল তাহার যাওয়াই উচিত। এখানে বেশী দিন থাকিলে হয়ত ঘর বাঁধার নেশা তাহাকেও পাইয়া বসিবে।

কিন্তু সারাদিন ইন্দুর দেখা নাই। সে নানা ছুতায় রান্না-ভাঁড়ার ঘরের মধ্যেই ঘুরিতেছে। মাঝে মাঝে যখন খেয়াল হয় যে, অতিথিকে বোধ করি অবহেলা করা হইতেছে, তখন দুই মুহূর্তের জন্য আসিয়া বসে এবং খাপ ছাড়া দুই-একটা কথা বলিয়া আবার একটা ছুতায় উঠিয়া যায়। অমল ব্যাপারটা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসে।

কিন্তু তবু যে ঐ যৌবন লীলার মধ্যে কী মাদকতা আছে, অমল চেষ্টা করিয়াও তাহার হাত এড়াইতে পারে না। সে দুপুর বেলা মাদুরটা টানিয়া লইয়া আসিয়া বাগানের মধ্যে একটা নভেল পড়িতে বসিল কিন্তু সেই অতি আধুনিক নভেলেও তাহার মন বসিল না। দৃষ্টি কখন বইয়ের পাতা হইতে সরিয়া দূর দিগন্তরালে চলিয়া যায় তাহা সে বুঝিতেই পারে না।

সন্ধ্যার একটু আগে ইন্দু একবার ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া গেল, আসবেন

একটু বাগানের ধারে রাত্তির বেলা। আমিও চুপি চুপি বেরোব'খন ওকে নিয়ে!

অমব মৃদুস্বরে একটা আপত্তি করিতে গেল কিন্তু তাহা টিকিল না, হয়ত তাহার কণ্ঠস্বরে তেমন জোরও ছিল না। ইন্দু সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, না, না, চলে আসবেন একটু—নইলে আমার ভাল লাগবে না!

অমল চুপ করিয়া রহিল। ঘর ছাড়িয়া আসিয়া সে দুঃখ পাইয়াছে প্রচুর, আত্মীয়-স্বজন-বিরহও তাহাকে কম আঘাত করে নাই, কিন্তু এ সমস্তর মধ্যেও তাহার স্বাধীনতার একটা সুখ ছিল বলিয়া তাহা দুঃসহ হইয়া ওঠে নাই! আজ কিন্তু সে মনের মধ্যে কেমন একটা ব্যথা অনুভব করিতে লাগিল। অন্তরের মধ্যে কে যেন হাহাকার করিয়া বেড়াইতে লাগিল, ব্যর্থ হইল, সব ব্যর্থ হইল!

রাত্রে সেদিন একটু সকাল সকালই আহারাদি শেষ হইয়া গেল। তাহার প্রথম কারণ আত্মীয় সমাগম যাহা হইয়াছিল তাঁহারা প্রায় সকলেই চলিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয়ত ইন্দুর মামারও শরীর ভাল ছিল না। অপরাহ্ণে গ্রামের কয়েকজন নববধূর সহিত আলাপ করিতে আসিয়াছিলেন বটে কিন্তু তাঁহারা সকাল সকালই বিদায় লইয়াছিলেন।

আহারাদির পর বিছানায় শুইয়া অমলও প্রথমটা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু খানিকটা পরেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল, ঘড়িতে দেখিল তখন এগারোটা। জাগিয়া থাকিবার ইচ্ছা ছিল বলিয়াই প্রবল ঘুমের মধ্যেও অমন করিয়া ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা অমল বুঝিতে পারিল এবং সেজন্য তাহার কেমন যেন লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সে জানালার মধ্য দিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

কিন্তু খানিকটা পরেই ইন্দু ও কমলার প্রণয় লীলা তাহাকে অজ্ঞাতবন্ধনে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতে লাগিল, কৌতূহলের যেন শেষ নাই, তাহাকে শেষ পর্যন্ত দেখিতেই হইবে। সে নিঃশব্দে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিল এবং অস্তোন্মুখ চন্দ্রের ম্লান আলোতে বাগানের পথ দেখিয়া সে ইন্দুর ঘরের দিকেই চলিল।

কিন্তু ইন্দুও ইতিমধ্যে কখন কমলাকে লইয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা

অমলের ঘরের দিকেই আসিতেছিল। মধ্য-পথে দেখা হওয়াতে ইন্দু ইঙ্গিতে অমলকে ডাকিয়া লইয়া একেবারে পুকুরের পাড়ে গিয়া বসিল। এককালে চত্তরটা বাঁধানো ছিল, এখনও তাহার খানিকটায় শান্ আছে, বসা চলে। কমলা লজ্জিত-ভাবে আড়ষ্ট হইয়া বসিল, ইন্দু তাহার এক পাশে বসিয়া অমলকে জোর করিয়া-আর এক পাশে বসাইল।

কিছুক্ষণ সকলেই চুপ-চাপ, অপ্রত্যাশিত সুখে ইন্দুর মন কানায় কানায় ভরা আর অমল চুপ করিয়া ছিল সঙ্কোচে। কিছুক্ষণ পরে সে-ই কথা পাড়িল, আমরা ত দিব্যি সকলে বেরিয়ে এলুম, চোর ঢুকবে না ত ?

ইন্দু কহিল, না, না, আমরা তিন-তিনটে লোক এখানে জেগে বসে রয়েছি, চোর ঢুকতে সাহস করে কখনও ?

তাহার পর যেন অসংলগ্নভাবেই কহিল, একে নিয়ে কিন্তু মহামুস্কিলে পড়লুম অমলদা, আপনার সঙ্গে আলাপ করবে মনে ক'রে আপনাকে বেরোতে বলেছিলুম বটে কিন্তু এখনও ত আমার সঙ্গেই ভাল করে কথা বল্ছে না।

অমল মৃদু হাসিয়া প্রশ্ন করিল, কেন ?

কৃত্রিম কোপের সহিত ইন্দু কহিল, কে জানে ! বোধ হয় লজ্জা।

কমলা অপাঙ্গে একবার অমলের মুখের দিকে চাহিয়া আরও বেশী করিয়া ঘাড নামাইল।

ইন্দু কহিল, অমলদার সঙ্গে কথা কও না, লক্ষ্মিটি, কাল উনি চলে যাবেন, আবার কতদিনে তোমার সঙ্গে দেখা হবে কে জানে। শুন্ছ, কথাবার্তা বলো না—

নেশা একটু যেন অমলের মনেও ধরিয়াছিল, সে কহিল, কথা কইবেন কি, মনে মনে আমার ওপর চটে রয়েছেন যে ! দিব্যি এমন ফাঁকা জায়গাতে নির্জনে স্বামী-স্ত্রীর আলাপ জমবে, তা নয় আমি এক আপদ-বালাই কোথা থেকে এসে হাজির হলুম !

ইন্দু কমলার মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া কহিল, তাই নাকি, সত্যি ?

কমলা নতমুখেই মাথা নাড়িল, কিন্তু তাহার ভাবভঙ্গী দেখিয়া স্পষ্টই বোঝা গেল যে, পরিহাসটুকু সে বেশ উপভোগ করিতেছে।

ইন্দু কহিল, তবে কথা কইছ না কেন ওঁর সঙ্গে। উনি কি ভাবছেন বল দেখি? দেখছ ত কত দুঃখ করছেন।

অমল উঠিবার উপক্রম করিয়া কহিল, না আমি যাই, উঠি, উনি যখন আমার ওপর প্রসন্ন হলেনই না, মিছিমিছি ওঁকে বিরক্ত ক'রে লাভ কি—

ইন্দু কহিল, ঐ দেখলে ত?

সত্যসত্যই অমল উঠিতেছে দেখিয়া কমলা কি করিবে বুঝিতে না পারিয়া হাতটা বাড়াইয়া তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিল, কিন্তু পরক্ষণেই দ্বিগুণ লজ্জা পাইয়া আবার টানিয়া লইল। অতি অল্পক্ষণ, বোধ করি এক মুহূর্তকাল মাত্র, কিন্তু সেইটুকু সময়ের জন্যই সেই স্বেদসিক্ত লজ্জাকম্পিত কোমল হাতের স্পর্শ টুকুতে অমলের সর্বাঙ্গ যেন জুড়াইয়া গেল। মনের মধ্যে এক ঝলক দক্ষিণা বাতাস বহিয়া তাহাকে যেন মাতাল করিয়া দিল। সে বসিয়া পড়িয়া এবার নিজেই কমলার ডান হাতটা জোর করিয়া নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া কহিল, বেশ, বসছি কিন্তু কথাও কইতে হবে!

কমলা এবার কথা কহিল, অত্যন্ত মৃদুস্বরে, জড়িত কণ্ঠে কহিল, কী কথা বলব?

অমল কহিল, যা খুশী, আপনার বাপের বাড়ির কথা কিছু বলুন না!

ক্রমে আলাপ জমিয়া উঠিল। কমলা শুধু সংক্ষেপে দুই একটি কথার জবাব দেয়, বকিয়া যায় ইহারাই বেশি। অমলের হাতের মধ্যে কমলার হাতখানি ঘামিয়া সপ্‌সপে হইয়া উঠিল, কিন্তু তবু অমল ধরিয়াই রহিল। অবশেষে এক সময়ে পূর্বাকাশে উষার আভাস লাগিলে তাহার চৈতন্য হইল, সে কহিল, ইস্‌, আপনাদের এমন রাতটাই মাটি করে দিলুম দেখছি; ভোর হয়ে গেল যে!—যান, যান—শুতে যান!

ইন্দুরা উঠিয়া পড়িল। অমল কিন্তু আর শুইতে গেল না, গ্রামের পথে বেড়াইতে বাহির হইয়া পড়িল। যে স্বপ্ন এতক্ষণ ধরিয়া সে দেখিল, তাহাকেই মনের মধ্যে সে তখন ভাল করিয়া অনুভব করিতে চায়।

১৩

পরের দিনই অমল কলিকাতায় চলিয়া আসিল। সেই ছুতার-পাড়ার ধূমপরিপূর্ণ গলি এবং সেই নীচু খোলার চালের ঘর। এতদিন ইহা ক্লেশকর হইলেও এমন করিয়া গলা চাপিয়া ধরে নাই।

সে আসিয়া স্নান সারিয়াই বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু ঘর অসহ্য বোধ হইয়া থাকিলেও পথ-ত একেবারেই অসম্ভব। সে সেই দ্বিপ্রহরেই গোলদীঘির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া অপেক্ষাকৃত ছায়াশীতল একটা বেঞ্চিতে গিয়া বসিল এবং দূরের ট্রাম ও বাসের গতির দিকে চাহিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অলস দিবাস্বপ্নের জাল বুনিয়া চলিল।

ক্রমে অপরাহ্ণও মলিন হইয়া আসিল, সন্ধ্যার আর দেরী নাই। এমন করিয়া বসিয়া থাকাও অসহ্য। ইন্দুর কথা, তাহার মামার কথা, কমলার কথা যেন স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। স্বপ্ন বটে কিন্তু বড় মধুর সে স্বপ্ন; তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া কিছুতেই আর বাস্তবে মন বসিতেছে না। বিশেষত, সহসা আজ সে এতদিন পরে অনুভব করিল, কলিকাতা অসহ্য। নিজের দেশ হইতে আসিয়া একদা যে এই শহর ভাল লাগিয়াছিল, সেই অকৃতজ্ঞতার শোধ দ্বিগুণ আদায় করিয়া লইয়াছেন পল্লীজননী তাহাকে দুই দিনের জন্য ইন্দুদের দেশে লইয়া গিয়া।··

একেবারে সন্ধ্যার মুখে উঠিবে উঠিবে করিতেছে এমন সময় যেখানে ছেলে পড়ায় সহসা সেই মনিবের সহিত সাক্ষাৎ। আর যেখানেই হউক, গোলদীঘির মত স্থানে সে তাঁহাকে দেখিবার আশা করে নাই, খানিকটা বিস্মিত, খানিকটা অপ্রতিভ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল, কথা কহিতে পারিল না।

কথা তাহাকে কহিতেও হইল না, দেবেশবাবু নিজেই কথা কহিলেন। সশব্দে পাশে বসিয়া পড়িয়া পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে কহিলেন, ইস্, এই সবে ফাগুন মাসের প্রথম, এইতেই ঘামিয়ে দিলে! আর

শালা কাপড়ের দোকানে ভীড়ও কি তেম্‌নি! অতখানি গুঁতোগুঁতি করেও ঢুকতে পারলুম না!

অমল এবার সাহসে ভর করিয়া মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কাপড় কিনতে এসেছিলেন বুঝি?

না, মসলা কিনতে! কাপড়ওলার দোকানে আবার কী কিন্‌তে ঢোকে হে ছোকরা! ইস্‌, কাল-ঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে!

অমল সভয়ে চুপ করিয়া গেল। দেবেশবাবু কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সুস্থ হইয়াই তাহার দিকে মনোযোগ দিলেন, সেই অস্পষ্ট আলোতেই ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার মুখটা নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, তারপর মাষ্টার, বিয়ের নেমতন্ন খাওয়া হল? পড়াতে যাওনি যে আজ? আজ অবধি ছুটি নেওয়া ছিল বলে ছুটিটা পুষিয়ে নিচ্ছ, না?···ভাল, ভাল।

ইহার কাছে কোনরূপ প্রতিবাদ করিবার চেষ্টা করাই আহাম্মুকি তাহা অমল জানিত, তবু সে একবার কহিল, আজ্ঞে না, এই কিছুক্ষণ আগেই এসেছি মোটে—

তিনি বিরাট এক হাস্য করিয়া কহিলেন, ওহে আমরাও জানি, জানি! চাকরি করার আগে আমিও তিনটি বচ্ছর ছেলে পড়িয়েছি; একবার ছুতো পেলে আর ও মুখোটি হতুম না।···যাক্‌গে, যাওনি ভালই করেছ, পচারা আবার কাল মামার বাড়ী গেছে, আসছে কাল বিকেলে ফিরবে, কাল পর্যন্ত তোমার ছুটি! ও হতভাগার কিচ্ছু হবে না, বুঝলে মাষ্টার, শুধু শুধু অদেষ্টে আছে কতকগুলো অর্থদণ্ড তাই হচ্ছে!

অমল কহিল, মাথাটা ওর ত খুব খারাপ নয়, তবে মোটে পড়ায় মন দেয় না এই যা, একটু মন দিলেই করতে পারে। আপনার ক্ষুদের মাথাটা কিন্তু বেশ শাফ, ওর পড়াতেও বেশ মন। ওর ফিউচার দেখবেন খুব ভাল হবে!

দেবেশবাবু প্রায় ধমক দিয়া উঠিলেন, গোবর, গোবর! আমার ছেলেমেয়ে আমি জানিনে? ও সব বেটা-বেটির মাথাতেই গোবর পোরা আছে, কিচ্ছু হবে না ওদের! হুঁ!!

মিনিটখানেক রুমালটা নাড়িয়া হাওয়া খাইয়া পুনশ্চ কহিলেন, ওসব কথা থাক, এখন তোমার খবর বল ! বলি কাজ-কর্মের কিছু হ'ল ?

অমল ঘাড় নাড়িয়া জানাইল যে কিছুই হয় নাই। দেবেশবাবু কহিলেন, জানি আমি, যা দিনকাল পড়েছে কিচ্ছুটি হবার যো নেই ! আমার ছেলেগুলোকে ত তাই বলি মাষ্টার, যতদিন আছি যা পাস্ খেয়ে নে, এর পর হয় ভিক্ষে করতে হবে নয় জেল খাটতে হবে !···তা দেখ মাষ্টার, একটা অল্প টাকার মাইনের চাকরী খালি আছে আমার অফিসে, করবে নাকি ?

নাকি ? অমল একেবারে দেবেশবাবুর হাতটা চাপিয়া ধরিয়া কহিল, পাঁচটা টাকা পেলেও আমার জীবন রক্ষে হয় এখন, আমি এমন উপোষ করে আর পারি না।

দেবেশবাবু তাঁহার মোটা ভারি হাতখানা অমলের কাঁধে রাখিয়া কহিলেন, সবই বুঝি মাষ্টার ! বড় ছাপোষা মানুষ আমি, নইলে আমিই দুটাকা বাড়িয়ে দিতুম।

যে কাজটার কথা দেবেশবাবু উল্লেখ করিলেন সেটা তাঁহার অফিসেই লাইব্রেরীর কাজ। এক ভদ্রলোক অফিসের কাজ করিয়া লাইব্রেরীর কাজ করিতেন কিন্তু তিনি একা আর পারিয়া উঠিতেছেন না বলিয়া সাহেবকে ধরিয়া আর একটা লোক রাখিবার বরাদ্দ মঞ্জুর করানো হইয়াছে। অবশ্য অফিসেরই কর্মচারীদের কাহাকেও উপরি লোক রাখিবার কথা কিন্তু যদি দেবেশবাবুর বড়বাবুকে ভাল মতে 'পাক্‌ড়ানো' যায় তবে তিনি হয়ত সাহেবকে বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, ছুটির পরে অন্য বাবুদের দিয়া কাজ করানো অপেক্ষা বাহিরের কোন লোককে ঐ মাহিনাতে পাওয়া গেলে অনেক সুবিধা হইবে।

দেবেশবাবু পরদিন তাহাকে অফিসে যাইতে বলিয়া যাইবার সময় আশ্বাস দিয়া গেলেন, কিচ্ছু ভেবো না মাষ্টার, সে আমি বড়বাবুকে এ্যায়সা পাক্‌ড়ান্ পাক্‌ড়াবো যে আর না করতে পারবে না। আর বড়বাবু ভিজলেই সব বন্দোবস্ত ঠিক হয়ে যাবে, শালা ছোট সাহেব ত ওর কথায় ওঠে বসে !

তিনি পুনশ্চ কাপড়ের দোকানের দিকে যাত্রা করিলেন কিন্তু অমলের সেদিন

রাত্রে ঘুম হইল না। আশা ও আশঙ্কায় সারা রাত্রি বিনিদ্র কাটাইয়া অমল অপেক্ষা করিতে লাগিল শুধু ঘড়িতে এগারোটা বাজার, কারণ দেবেশবাবু তাহাকে বারোটার সময় হাজির হইতে বলিয়া দিয়াছেন। মাত্র বারোটাকা মাহিনা, কিন্তু তাহা হউক, মাসিক পনেরটা টাকা আয় হইলেও সে অন্তত একটু স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। সুখে থাকিবার আশা সে আর করে না, স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারাই এখন তাহার কাছে সুদূর কল্পনা!

অবশেষে বারোটাও এক সময়ে বাজিল। অফিসের বাবুদের সম্বন্ধে কিছু অভিজ্ঞতা তাহার দিল্লিতেই হইয়াছিল কিন্তু তবু সে এখানকার ব্যাপারগতিক দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া পারিল না। অধিকাংশ বাবুই নিজেদের স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া আড্ডা দিতেছেন, যাঁহারা নিজের সীটে আছেন তাঁহাদের অবস্থাও বিশেষ খারাপ নয়, অপেক্ষাকৃত যাহারা প্রবীণ তাঁহারা খবরের কাগজ পড়িতেছেন, ছোক্‌রার দল লাইব্রেরী হইতে আনা প্রকাণ্ড নভেল কিম্বা আধুনিক নাটকে মন দিয়াছে। অতবড় হলটার মধ্যে যাঁহারা ঠিক অফিসের কাজ করিতেছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় পাঁচ-ছয়ের বেশী হইবে না।

ঠিক সামনেই যে বাবুটি বসিয়া ঘাড় গুঁজিয়া কি একটা লিখিয়া যাইতেছিলেন, বয়স কম দেখিয়া অমল তাঁহার ডেস্কের কাছেই গিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কাছে গিয়া দেখিল, তিনি অফিসের কাগজ ব্যবহার করিলেও লিখিতেছেন বাঙলায় এক সুদীর্ঘ চিঠি। বোধ করি প্রেম-পত্রই হইবে, কারণ লেখক সহসা মুখ তুলিয়া উগ্রস্বরে কহিলেন, বাইরে লেখা রয়েছে দেখছেন না, No Vacancy—তবু ভেতরে কেন আসেন জ্বালাতন করতে?

অমল ভয়ে ভয়ে কহিল, আজ্ঞে না—

আজ্ঞে না আবার কি? এখানে চাকরী পেতে হলে বড়বাবুদের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকার দরকার হয়, তা আপনার নিশ্চই নেই, নইলে এমন করে আমাকে জ্বালাতন করতে আসতেন না, একেবারে চাকরী পেয়ে নিজের টুলে গিয়ে বসতেন—আগে বাইশ টাকা তারপর একেবারে বিয়াল্লিশ টাকায় কন্‌ফার্মেশন্! ঐ যে নো ভেকেন্সি

বোর্ডটি দেখছেন, ওটি কমসে কম তের বচ্ছর টাঙ্গানো আছে, ওর মধ্যে অন্তত সাড়ে তিনশ' লোক নেওয়া হয়ে গেল, তবু শালা বোর্ড আর নড়ল না!···বাড়ি যান্ মশাই, বাড়ি যান্। কেন মিথ্যে সময় নষ্ট করবেন, এখানে এমনি যদি এসে স্থবিধে হ'ত তাহ'লে আর আমার ভাইটা এতদিন বসে থাকত না।

বাধা দেওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা জানিয়া অমল এতক্ষণ চুপ করিয়াই শুনিয়া যাইতেছিল। এইবার বক্তৃতা বন্ধ হওয়াতে প্রায় মরিয়া হইয়া বলিয়া ফেলিল, আমি দেবেশবাবুকে খুঁজছি।

ভেংচি কাটিয়া ভদ্রলোক জবাব দিলেন, দেবেশবাবুকে খুঁজছি!···তা আমি কি করব? আমি কি Director General of Information? ভ্যালা জ্বালা হয়েছে এই এক দোরের কাছে সীট হয়ে, তুনিয়া শুদ্ধ লোকের ভগ্নিপতির খোঁজ দিতে দিতেই দিন চলে গেল! ছোঃ!··একটু স্বস্তিতে যে একখানা চিঠি লিখ্‌ব তার জো নেই!

বলিয়া, বোধ করি অমলের উপরে রাগ করিয়াই, অতখানি লেখা চিঠিটা কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে দেবেশবাবু কোথা হইতে আসিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি কহিলেন, মাষ্টার ইন্দরের কাছে আমার খোঁজ করছিলে বুঝি? আর লোক পেলে না জিজ্ঞাসা করবার বাবা! ইন্দর বুঝি আজ টিফিনের আগেই বৌকে চিঠি লিখতে শুরু করছিলে?

তারপর গলাটা নীচু করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিলেন, বৌ বুঝি মাস-তিনেকের জন্যে চেঞ্জে গেছে, তা তাকে রোজ একখানা ক'রে চিঠি দেওয়া চাই, সেই সময়ে কেউ এসে পড়লে আর রক্ষে নেই, একেবারে তেলে-বেগুন!···অফিসের কাজ-কর্ম এই তিন মাস একদম বন্ধ আর কি!

ইন্দুবাবু সব কথাই শুনিতে পাইয়াছিলেন, তিনি রাগে তোৎলা হইয়া গেলেন, দে-দেখুন দ্‌-দেবেশবাবু, ভাল হবে না বলে দিচ্ছি—

দেবেশবাবু বাধা দিয়া বলিলেন, আমি কিছুই বলব না দাদা, তবে এই বাবুটি যে বড়বাবুর কে তা-ত জান না, কথাটা যদি কানে ওঠে তাহ'লে ছোটসাহেব ডেকে

তোমাকে মোয়া খাইয়ে দেবে'খন। যত বলি ইন্দর বৌকে চিঠি লেখা একটু কমাও, তা-ত শুনবে না—

দেবেশবাবু অমলের হাত ধরিয়া ভিতরের দিকে চলিতে শুরু করিলেন, কিন্তু অমল তাহারই মধ্যে একবার ইন্দ্রবাবুর দিকে চাহিয়া অবাক হইয়া গেল, যেন জোঁকের মুখে নুন পড়িয়াছে, সে মানুষটিকে আর চিনিবার উপায় নাই!

দেবেশবাবু ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিয়া দিলেন, ঐ ওধারে বড় টেবিলটা দেখছ, ঐ যে টেলিফোন রয়েছে—হ্যাঁ, উনিই আমাদের সেক্‌শনের বড়বাবু; দূরে থেকে চোকো-চোকি হ'লেই একটা নমস্কার করবে, আবার কাছে গিয়ে আর একটা। নমস্কারগুলো বেশ দেখিয়ে করবে, এমনভাবে ক'রো না যেন যে তুমিও করলে অথচ উনিও দেখতে পেলেন না!

তাহাকে দুইবার নমস্কার করিবার উপদেশ দিলেও দেবেশবাবু নিজে বোধ হয় ঐটুকুর মধ্যে বার-চারেক নমস্কার সারিয়া ফেলিলেন, তাহার পর কাছে গিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, এই সেই ছোকরাটি বড়বাবু, বড় ভাল ছেলে; দিন যা হয় একটা সদ্‌গতি করে এখন, আপনার পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্দি হলুম!

বড়বাবুর প্রতাপ যতটা, তাঁহার চেহারা তাহার ঠিক বিপরীত। মানুষটি যেমন বেঁটে তেমনি রোগা। ভদ্রলোকের মাথায় পাতা কাটিবার ধরণে টেরিকাটা, গায়ে অলষ্টার কোট এবং সেই ফাল্গুন মাসেও পায়ে পশমের মোজা। তিনি ভ্রূকুটি করিয়া অমলের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, কলেজে পড়েছিলে?

অমল জবাব দিবার পূর্বেই দেবেশবাবু কহিলেন, রামচন্দর! ওর কি সেই অবস্থা? তা ছাড়া ও প্রায়ই বলে, দেবেশবাবু, চাকরী করেই যখন খেতে হবে, তখন আর বি-এ এম-এ পাশ করে কি হবে মিছিমিছি?

বড়বাবু যেন প্রসন্ন হইলেন বলিয়াই বোধ হইল। কহিলেন, তবু ভাল! বি-এ পাশ করে যে আমাকে জ্বালাতে আসেনি এই আমার বাবার ভাগ্যি! বুঝলে দেবেশ, মুখ্যু হয়ে যারা আসে তবু তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে তৈরি ক'রে নিতে পারি, আর

ঐ তোমার যাঁরা বি-এ এম-এ পাশ, কোন জন্মে ওদের অফিসের কাজ শেখাতে পারবে ? ওরা এক-একটি আস্ত বাঁদর তৈরি হয়ে আসে !

দেবেশবাবু মাথা নাড়িয়া জবাব দিলেন, ঠিক কথা ! এই দেখুন না কেন আপনি ত সেকালের এণ্ট্রেন্স পাশ, আপনি যেমন করে অফিসের কাজ চালিয়ে গেলেন, পারচেজ সেকশানের বড়বাবু একদিনও তা পারলে ! আজ এখানে ভুল, কাল ওখানে গল্‌তি লেগেই আছে। অথচ শুনি ত ওধারে এম্‌-এতে ফার্ষ্ট না কি হয়েছিলেন !

বড়বাবু এবারে হাসিলেন। কহিলেন, অত কথায় কাজ কি দেবেশ। এইত তুমি, তুমি ত ম্যাট্রিকটা পাশও দাওনি, অথচ তোমাকে একটা কাজের ভার দিয়ে যেমন আমি নিশ্চিন্ত হই, তেমন কি আর কাউকে দিয়ে হতে পারি ? রাধেমাধব ! বি-এ পাশ !··হুঁ !!···এই দেখনা মুকুন্দ, মুকুন্দ কাল একটা চিঠির ড্রাফ্‌ট্ করে নিয়ে এল, আমার বড় তাড়া ছিল বলে দেখতে পারলুম না, একেবারে সাহেবের কাছেই পাঠিয়ে দিলুম। ভাবলুম ইংরিজিতে অনার-ওলা ছেলে ওসব, আর যাই হোক ভুল করবে না। ওঃ হরি, ছোটসাহেব ডেকে শুধু আমাকে বললেন, আজই মুকুন্দকে এক মাসের নোটিশ দাও, অমন কেরাণীতে দরকার নেই।

ছোট ছোট চোখ-দুইটি যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত করিয়া দেবেশবাবু কহিলেন, বলেন কি ? একেবারে নোটিশ দিতে বললে ?

বলবে না ? একটা চিঠিতে সাতাশটি ভুল ?···মুকুন্দকে ডেকে চিঠিটা দিয়ে বললুম, মুকুন্দ, এসব কি ? তাই কি ভুল বুঝতে অবধি পারে, বলে কেন বড়বাবু, ঠিকই ত আছে !···গেল তোরই চাক্‌রী, আমার কি ?

তিনি উঠিয়া দাঁড়াইয়া অমলকে প্রশ্ন করিলেন, সাহেবের কাছে নিয়ে গেলে ইংরেজীতে কথা কইতে পারবে ত ?

দেবেশবাবু তাঁহার জুতার ডগাটা দিয়ে সজোরে অমলের পা মাড়াইয়া দিলেন। অমল জবাব দিল, আজ্ঞে বোধ হয় পারব না, সাহেবদের সঙ্গে কথা কওয়া ত অভ্যেস নেই !

বড়বাবু আবার হাসিলেন। মুখে তাঁহার বরাভয়, কিন্তু কণ্ঠে উদ্বেগ টানিয়া

আনিয়া কহিলেন, তাও পারবে না? মাটি করেছে, আচ্ছা দেখি কি করতে পারি—

তিনি ছোটসাহেবের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। দেবেশবাবু অমলের পিঠে চাপড় মারিয়া কহিলেন, আর ভয় নেই মাষ্টার, চাকরী তোমার হয়েই গেলো ধরে রাখো—

তাহার অনুমান যে মিথ্যা নয় তাহা মিনিট-দশেক পরেই বোঝা গেল, বড়বাবু উদ্ভাসিত মুখে ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, যাক্—শেয়াল বাঁহাতি করে বেরিয়েছিলে বটে, সাহেব বললে, তুমি যখন রেকমেণ্ড করছ বাবু, তখন আর আমি কি দেখব, যাও একেবারে বসিয়ে দাওগে—

দেবেশবাবু সমস্ত দাঁত বাহির করিয়া কহিলেন, সে ত আমি জানতুমই সার, সাহেব আর কবে আপনার ওপর কথা বলেছে?

তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বড়বাবু জবাব দিলেন, না, সাহেব আমার তেমন নয়, যদি দিনকে রাত বলি তাহলেও একবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখবে না, সত্যি কি মিথ্যে! যাও তাহলে দেবেশ, ভাল করে একটা দরখাস্ত, লিখিয়ে নিয়ে একেবারে ওকে লাইব্রেরী ঘরে বসিয়ে দাওগে—

দেবেশবাবুকে আর দ্বিতীয়বার বলিতে হইল না, তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া সোজা লাইব্রেরীতে লইয়া গেলেন এবং অফিসেরই একখানা কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন, লেখ দেখি মাষ্টার একখানা দরখাস্ত, মোদ্দা সব যেন ঠিক ঠিক লিখো না, অন্তত গোটা-ছয়েক ভুল যেন থাকে—

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, ভুল? ভুল থাকবে?

দেবেশবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, ঐ বানান ভুল, গ্রামার ভুল সব মিলিয়ে অবিশ্যি! এমন ভুল রাখবে যেন বড়বাবু ধরতে পারেন।

তাহার পর কহিলেন, এ একরকম মন্দ হল না মাষ্টার, কাজ এমন কিছু নয়—অফিসের লাইব্রেরী, তুমিও যেমন, ওর কি মা বাপ আছে? ও আপনিই চলে—

দরখাস্ত লিখাইয়া লইয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এতক্ষণে অমল তাহার নূতন অফিসের দিকে ফিরিয়া চাহিবার অবসর পাইল। অনেকগুলি আলমারী, বইয়েরও

অভাব নাই। অভাব সেগুলির ভাল রকম রক্ষণাবেক্ষণের শুধু। বই যেগুলি ফেরৎ আসিয়াছে, তাহাদের কোনখানিই পুনরায় আলমারীতে ঢোকে নাই, মেঝের উপর স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে। অমল সেইগুলি নম্বর মিলাইয়া পুনরায় আলমারীতে তুলিতে তুলিতেই অফিসের ছুটির সময় হইয়া গেল। এইবার আসিলেন স্বয়ং লাইব্রেরীয়ানবাবু। ঘরে ঢুকিয়াই কহিলেন, তুমিই নতুন এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট এলে বুঝি হে? কতটি দিতে হল বড়বাবুকে?···থাক্ থাক্ বলতে হবে না, আন্দাজ করে নিতে পারব'খন —

তাহার পর চেয়ারে বসিয়া টেবিলটায় পা তুলিয়া দিয়া কহিলেন, বইগুলো ভুল নম্বরে তুলছ না ত হে? শেষকালে আর খুঁজে পাবে না, বেয়ারাটাকে ডেকে নাওনি কেন, ও সব জানে শোনে? আমি আর ও আলমারীতে তুলি না, বাবুদেরই বলি বেছে নিতে—

তাহার পর একটা বিঁড়ি ধরাইয়া কহিলেন, কোনটায় কি আছে দেখে শুনে রাখ ভাল করে, আর পার যদি ত Missing List একটা তৈরী করো। ধীরে-সুস্থে করলেই চলবে, এমন কিছু তাড়া নেই।··দাও দিকি আমাকে একখানা ভাল দেখে বই বেছে—যা হলেই হবে। আমার গিন্নীকে বই জোগানো ভারী সুবিধে, তিনি পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ভুলে যান, এক বই তিনবার নিলেও অসুবিধে হয় না—

মিনিট পাঁচেক পরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, আজ আর কেউ বই নিতে আসবে না, আজকে আমাদের মিলিয়ে তোলবার ছুটি। আমি তাহ'লে চল্লুম, তুমিও বরং আজ বাড়ি যাও, কাল যা হয় ক'র—

তাহার পর গলা নামাইয়া কহিলেন, মোদ্দা একটা কথা সাফ্ বলে দিচ্ছি, এখানে যদি বনিয়ে কাজ করতে চাও তাহ'লে আসছে মাসের মাইনে থেকে পাঁচটি টাকা আমাকে দিতে হবে। আর যদি না দাও কিম্বা ঐ দেবেশ হতভাগাকে বলো, তাহলে কিন্তু তিনটি মাসও টিকিতে পারবে না তা বলে দিলুম—

তিনি বাহির হইয়া গেলেন। অমল পাথরের মত কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল,

তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া আবার কাজে মন দিল। মোটে বারটি টাকা মাহিনা, তাহার মধ্য হইতেও পাঁচটি টাকা চলিয়া গেল!

আরও প্রায় আধ-ঘণ্টা কাজ করিবার পর বেয়ারাকে চাবী দিতে বলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল ইন্দ্রবাবু তখনও পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া বোধ করি তাহারই অপেক্ষা করিতেছেন। কাছে আসিতেই হাত কচ্লাইয়া কহিলেন, কী দাদা, কাজ সারা হ'ল, বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি? চলুন আমিও যাব ঐ পথে—

তাহার পর প্রায় ফটকের কাছাকাছি আসিয়া সহসা অকারণেই অমলের কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিলেন, ন'মাস প্রেগন্যান্সির পর প'ড়ে গিয়ে মরা ছেলে ভেলিভারী হ'ল, যমে-মানুষে টানাটানি—ডাক্তার বললে এর পরেও যদি চেঞ্জে না পাঠাও তাহ'লে তোমার নামে ক্রিমিনাল কেস্ করব। শালাদের কাছে ছুটি চাইলুম, শালারা ছুটি দিলে না, বললে স্পেয়ার করা চলবে না! সেটা কি আমার অপরাধ?

অমল তাঁহার মূল বক্তব্যের আভাসমাত্র না পাইয়া কতকটা বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। ইন্দ্রবাবু তখন নিজেই আবার শুরু করিলেন, অগত্যা আমাকে চেঞ্জে পাঠাতে হ'ল; একা তিনটি ছেলে-মেয়ে নিয়ে সেই বিদেশে-বিভূঁয়ে প'ড়ে, কাজেই আমাকে দৈনিক খবরও নিতে হয়।......আছে অবিশ্যি আমার ছোট শালা, কিন্তু সে মানুষ বললেও চলে ভূত বললেও চলে।...যদি বলেন, যে 'চিঠি ত রোজ আসে না তোমার নামে—তুমিই বা রোজ লেখ কেন'— আচ্ছা সে রোগা মানুষ, রোজ কখনও চিঠি লিখতে পারে? কিন্তু আমার চিঠি না পেলেই ভয়ঙ্কর ভাবতে শুরু করবে, তাতে 'চেঞ্জ' হওয়া চুলোয় যাক আরও রোগ বেড়ে যাবে, বুঝলেন না?

এতক্ষণে অমল যেন আঁধারে কুল পাইল। সে কহিল, ঠিকই-ত! অকারণে ভাবানো উচিত নয়—

সোৎসাহে ইন্দ্রবাবু জবাব দিলেন, এই দেখুন, আপনি ইয়ংম্যান, আপনি যেমন কথাটা বুঝলেন তেমন কি আর কেউ বুঝবে? অফিসের সব বাবুরা যেন

এক-একটি ঢেঁকি অবতার, পেছনে লেগেই আছে! কেউ মানুষ নয় বুঝলেন, সব জানোয়ার! আর ঐ দেবেশ শালা আরও বেশী—

বলিয়াই পরমুহূর্তে জিভ কাটিয়া বলিলেন, ইস্! কী বলতে কি বলে ফেললুম —দেবেশবাবু লোক ভাল, পেছনে লাগে বেশী ঐ কিঙ্করবাবু, সত্যকিঙ্কর!

তাহার পরই সহসা অমলের হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কান্নার স্বরে কহিলেন, দোহাই দাদা, বড়বাবুকে কিছু বলবেন না, তাহ'লে মারা যাব একেবারে। একেই ওর মেয়ের বিয়েতে পরিবেষণ করব না বলেছিলুম ব'লে—মরুক গে, দাদা আপনি ইয়ংম্যান, আমাদের দুঃখটা একটু বুঝুন, আর এই কুড়ি-পঁচিশটা দিন, তারপরই আনিয়ে নেব—

এত দুঃখের মধ্যেও হাসি চাপা দায় হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিয়া অমল কহিল, না না সেসব কিছু ভাববেন না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি কাউকে কিছু বলব না—

ইন্দ্রবাবু অকস্মাৎ পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিয়া অমলের হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, বহু ধন্যবাদ দাদা, না আমি শুনব না, ছোট ভাই সন্দেশ খেতে দিচ্ছে মনে করুন—

এবং পরক্ষণেই প্রতিবাদের অবসর মাত্র না দিয়া ইন্দ্রবাবু একরকম ছুটিয়া গিয়া একটা ট্রামে উঠিয়া পড়িলেন। টাকা দুইটা অমলের হাতের মধ্যেই রহিয়া গেল।

১৪

বিচিত্র ব্যাপার !

অনেকদিন পরে অমল সারাটা পথ আপন মনে হাসিতে হাসিতে বাসায় ফিরিয়া আসিল। টাকা দুইটা তাহার ফিরাইয়া দেওয়াই হয়ত উচিত, কিন্তু তাহার তখন যা অবস্থা, তাহাতে টাকা হাতে পড়িলে আর ফিরাইয়া দেওয়া চলে না। আর, সে ভাবিয়া দেখিল, যখন তাহাকে ঘুষ দিয়া চাকুরি বজায় রাখিতে হইবে, তখন লইতেই বা বাধা কি ? সে পথেই একটা খাবারের দোকানে ঢুকিয়া বহুদিন, বোধ করি একযুগ পরে নিজের ইচ্ছামত খাবার কিনিয়া লইল। যদিও পথে আসিতে আসিতে আবার ঐ সাত আনা পয়সা দমকা খরচ করার জন্য মনে মনে একটু অনুশোচনাও হইতেছিল।

ঘরের চাবি খুলিতেই নজরে পড়িল একখানা খামের চিঠি মেঝের উপর পড়িয়া আছে। পিওন চাবি বন্ধ দেখিয়া দরজা গলাইয়া দিয়া গেছে ; তাহাকে আবার এ ঠিকানার কে চিঠি দিল ? সে বিস্মিত হইয়া খামটা তুলিয়া লইয়া দেখিল হাতের লেখা ইন্দুর ; অর্থাৎ অমল চলিয়া আসিবার পরই ইন্দু চিঠি লিখিয়াছে। অমল মনে মনে হাসিল, নববিবাহিতদের কাণ্ডই আলাদা !

মুখ-হাত ধুইয়া কেরোসিনের আলো জ্বালিয়া সে সোজা বিছানায় শুইয়া পড়িল। তাহার পর ধীরে সুস্থে খামটা ছিঁড়িয়া চিঠি বাহির করিল। ইন্দুর বড় চিঠির মধ্য হইতে আর একটা একফালি কাগজের টুকরা বাহির হইয়া পড়িল, অত্যন্ত কাঁচা হাতের লেখা, আঁকাবাঁকা বড় বড় হরপে দুইটি মাত্র লাইন।

অমলবাবু !

কেমন আছেন ? আপনার জন্য বড়ই মন খারাপ বোধ হইতেছে। চিঠি দিবেন। নমস্কার জানিবেন।

কমলা

কমলা চিঠি দিয়াছে! ইন্দুর বৌ!

অমল সেই দুইছত্র লেখাই বার-তিনচার পড়িল, তাহার পর চোখ বুজিয়া কমলাকে ভাবিবার চেষ্টা করিল। তাহার কথা মনে আসিতেই চোখের সামনে ভাসিয়া ওঠে সেই চন্দনলিপ্ত লজ্জানত মুখ, আর মনে পড়ে তাহার থরথর-কম্পিত স্বেদসিক্ত কোমল হাতখানি! আর তাহার আশ্চর্য কণ্ঠস্বর! সেই প্রথম দিনের কোনমতে বলিয়া ফেলা তিনটি শব্দ—কথা কইছি ত!

অকস্মাৎ অমলের সারাদেহ যেন কোন্ এক অদ্ভুত পুলকানুভূতিতে বার বার শিহরিয়া উঠিল। বিছানায় চুপ করিয়া শুইয়া থাকা যেন অসম্ভব বলিয়া বোধ হইল; সে চিঠিটা সযত্নে বালিশের তলায় রাখিয়া দিয়া উঠিয়া বসিয়া একবার চারিদিকে চাহিল। মনে হইল যে, এই আশ্চর্য সংবাদটা কাহাকেও দেওয়া প্রয়োজন, কাহাকেও ডাকিয়া যেন সে শোনাইতে পারিলে বাঁচে যে, একটি নব বিবাহিতা কিশোরী তাহাকে চিঠি লিখিয়াছে। ইহা নিতান্তই সৌজন্য, হয়ত ইন্দুর বিশেষ অনুরোধেই তাহাকে লিখিতে হইয়াছে, খুব সম্ভব কথাগুলি ইন্দুরই বলিয়া দেওয়া, কিন্তু তবু চিঠি ত? অমল কল্পনায় তাহার লিখিবার সময়কার অবস্থাটা ভাবিয়া লইল। সঙ্কোচে, লজ্জায় কমলার মুখ আরক্ত হইয়াছে, খারাপ হাতের লেখা বলিয়া লিখিতে রাজি হইতেছে না, অথচ ইন্দুর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত কলম ধরিতে হইয়াছে। হাত কাঁপিতেছে, কিন্তু মুখে কৌতুকের হাসি এবং বোধ হয় মনের মধ্যে লিখিবার ইচ্ছাও আছে—

সহসা অমল যেন নিজে-নিজেই লজ্জিত হইয়া উঠিল—এ কি? তাহার কি এখন কিশোরী মেয়েকে লইয়া দিবাস্বপ্ন দেখা উচিত? এমন কথাও একবার যেন মনের মধ্যে কে প্রশ্ন করিল, সে কি ঐ কালো মেয়েটির প্রেমে পড়িতেছে? কিন্তু পরক্ষণেই মনের মধ্যে যতটা দেখা যায়, একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বুঝিল যে, সে আশঙ্কা নাই, ইহা নিতান্তই কিশোরী মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষের সহজাত দুর্বলতা।

মনে পড়িয়া গেল যে, ইন্দুর চিঠিটাই সে এখনও পর্যন্ত পড়ে নাই; বেচারীর

উপর ঘোর অবিচার করিয়াছে। চিঠিটা কখন মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, দেখিতেও পায় নাই। সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে শুরু করিল—

ভাই অমলদা,

আপনি চলে যাবার পরই এমন মন খারাপ হয়ে গেল যে, আর যেন কিছুই ভাল লাগছে না। রাজ্যের দুর্ভাবনা এসে ঘিরে ধরেছে। মনে হচ্ছে আপনাকে কাছে পেলে তবু একটু বল-ভরসা পেতুম। সে উপায় ত আর নেই, এই মুহূর্তে আপনাকে কোথায় পাই বলুন? তাই চিঠি লিখতে বসলুম।

আপনার নতুন বন্ধুটিও আপনাকে চিঠি দিচ্ছে, জবাব দেবেন। লিখতে কি চায়? বলে আমার বিশ্রী হাতের লেখা, বানান ভুল, তোমার অমলদা কি ভাববেন বলো ত? আজ আবার কি কাণ্ড করেছে জানেন? সকাল বেলা উঠেই ঢিপ করে এক প্রণাম। বলে, পিসিমা শিখিয়ে দিয়েছিল, এতদিন মনে ছিল না! অদ্ভুত, নয়?

আমরা বোধ হয় রবিবার নাগাদ ফিরব। ওঁরা তাই লিখেছেন। সোজা গিয়ে ওঁদের বাড়ীই (মানে আমার শ্বশুর বাড়ী) উঠতে হবে।

আমার ভালবাসা ও নমস্কার নেবেন। ইতি—

আপনার ইন্দু।

একেবার ছেলেমানুষ! যৌবনের রঙ্গীন স্বপ্ন এবং বাস্তবের দুশ্চিন্তা—এই দুই বিপরীত স্রোতের মধ্যে পড়িয়া কিশোর মনটি টলমল করিতেছে।) এ বয়সে আনন্দের দিকে, রসের দিকেই মন সাধারণত ঝুঁকিয়া থাকে, সুতরাং দুর্ভাবনাকে আপাতত ইন্দু ঠেকাইতে পারিবে, কিন্তু ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া অমল চিন্তিত না হইয়া পারিল না।···

বাহিরে গিয়া কাগজ কলম সংগ্রহ করিয়া আনিয়া রাত্রেই অমল চিঠি লিখিতে বসিল। ইন্দুকে কয়েক লাইন এবং কমলাকে দুই ছত্র; কী-ই বা লিখিবে?

কিন্তু তবুও ছোট দুখানি চিঠি শেষ করিয়া শুইতেই রাত্রি বারোটা বাজিয়া গেল। রাত্রে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিল, সে যেন কোন্ এক দুর্গম জঙ্গলের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছে, অন্ধকার রাত্রি, শুধু সেই বনের মধ্যেও কোথা হইতে ভাসিয়া আসিতেছে সানাইয়ের সুর, সে সুর যেন আর থামে না—

পরদিন বারোটার সময় অফিসে গিয়াই সে কাজে লাগিয়া গেল। এতদিন পরে একটা কাজ পাইয়া সে বাঁচিয়াছে। মাহিনা না পাক্, তবু কাজ। আরো একটা সুবিধা এই যে, লাইব্রেরী ঘরটি অফিসের অন্যান্য বিভাগ হইতে দূরে এবং একেবারে আলাদা। কেরাণীবাবুদের যা নমুনা সে পাইয়াছে, তাঁহাদের সঙ্গে একত্রে বসিয়া কাজ করিতে হইলে বিষম বিব্রত হইতে হইত।

কিন্তু মনটা খারাপ হইয়া গেল তাহার দরখাস্তের মঞ্জুরীপত্রটা পাইতে। তাহার দরখাস্তের উত্তরে কোম্পানী জানাইয়াছেন যে, লাইব্রেরীয়ানবাবুকে সাহায্য করিবার জন্য লেখাপড়া জানা বেয়ারার কাজটি তাহাকেই দেওয়া হইল।

এতদিন পরে কাজ যদি বা মিলিল ত সে বেয়ারার! কিন্তু দেবেশবাবু পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া বলিয়া গেলেন, ও নিয়ে মিছিমিছি মন খারাপ ক'রনা ভায়া, বারো টাকা মাইনেতে কেরাণী রাখা যায় কি করে বল দেখি? সেইজন্যই ও কথাটা লিখেছে। তাছাড়া চিরদিনই কি তুমি এই বারো টাকা মাইনেতে কাজ করবে? ঢুকতে বেরোতে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা হলেই ভাল করে নমস্কার ক'র, আর নতুন বই কেনা হলেই ভাল ভাল বইগুলো আগে থাকতে খাতায় লিখে বড়বাবুর পরিবারের জন্য গছিয়ে দিও—ব্যস্! হঠাৎ একদিন দেখবে যে চল্লিশ টাকা মাইনেতে ঢুকে গেছো—।

যাক্—ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আকাঁড়া! দুইবেলা ভাল করিয়া আহার জোটেনা যাহার, তাহার কাছে বেয়ারার চাকরীও অবহেলার বস্তু নয়।

অমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কাজে মন দিল। কাজও খুব কম নয়। বই জমা করা, বই বাছিয়া দেওয়া, পুনরায় সেগুলি মিলাইয়া তোলা, খাতাপত্র

ঠিক করা—কিছুক্ষণ পর্যন্ত তাহার যেন আর নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় রহিল না। লাইব্রেরীয়ান বাবু সেদিনও একবার মিনিট-পনেরর জন্য দেখা দিয়া সরিয়া পড়িলেন, বলিলেন, একটা এষ্টিমেট করতে করতে উঠে এসেছি, বুঝলে না, এখন যদি এখানে দেখতে হয় ত ওধারে রাত আটটা বেজে যাবে বাড়ি ফিরতে। তুমি চালিয়ে নিতে পারবে না আজকের দিনটা ?

অমল রাজী হইতেই তিনি গৃহিণীর জন্য আর একখানা মোটা বই সংগ্রহ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। অমল একলা থাকিতে মোটেই অনিচ্ছুক নয়, বরং ঐ মানুষটি থাকিলেই সে অস্বস্তি বোধ করিত। সব কাজ শেষ করিয়া যখন সে খাতাপত্র গুছাইয়া তুলিয়া রাখিল, তখন সন্ধ্যার খুব বেশী দেরী নাই। অফিসের প্রায় সব বাবুই চলিয়া গিয়াছিলেন, শুধু যাঁহারা ক্যাশে কাজ করেন তাঁহারাই কয়েকজন তখনও হিসাব মিলাইতে ব্যস্ত। আর বসিয়াছিল তাহার বেয়ারাটা—সে আসিয়া ঘরের জানালা বন্ধ করিতে করিতে বলিল, বাবু আপনি ত ভূতের মত খাটছেন দেখছি, বারো টাকা মাইনেতে অত খাটেন কেন? আর ও-বাবু পঁচিশ টাকা বাড়তি পায় এই কাজের জন্যে অথচ দিব্যি ফাঁকি দিচ্ছে।

তাহার বারো টাকা মাহিনার সংবাদটা তাহা হইলে এই বেয়ারাটাও রাখে। লজ্জায় অমলের দুইটা কান হইতে যেন আগুন বাহির হইতে লাগিল, সে কহিল, কী-ই বা করব ভাই, কাজ না করে। শুধু শুধু বসে থেকেই বা লাভ কি ?

বেয়ারাটা কহিল, কেন এলেন আপনি অত কম মাইনেতে ? এত লেখাপড়া জানেন, অন্য কোন কাজ পেলেন না ? আমিই ত আপনার চেয়ে বেশি মাইনে পাই !

অমল ম্লান হাসিয়া কহিল, অন্য কোন কাজ পেলে কি এখানে কেউ আসে জগন্নাথ ? বারো টাকায় অন্তত দুটি খেতে পাবো ত ?

জগন্নাথ বোধ হয় এতটা আশা করে নাই। সে লজ্জিত হইয়া কহিল, তা

বটে বাবু, মাপ করবেন ওটা আমার বোঝবার ভুল।······আপনি কিছু ভাববেন না বাবু, বড়বাবুর জামাই রেসের দিন হলেই আমার কাছে টাকা ধার চাইতে আসে, ওকে দিয়েই আমি আপনার মাইনে ঠিক করিয়ে দেব—

অমল মোটা বই একখানা বগলে করিয়া অতি ধীরে ধীরে অফিসের সিঁড়ি বাহিয়া নীচে নামিয়া আসিল। আজ সারাদিন ধরিয়াই তাহার মায়ের কথা মনে হইতেছে, কেমন আছেন তাঁহারা কে জানে? দশ-বারো দিন পরেই এ মাস কাবার, অন্তত অর্ধেক মাসের মাহিনা ত সে পাইবেই, সেই টাকাটা একেবারে বাবার নামে মণিঅর্ডার করিয়া দিয়া সে মাকে চিঠি দিবে, মনে মনে সংকল্প করিল।

১৫

একটু অন্যমনস্কভাবেই অমল পথ চলিতেছিল, সহসা পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল গঙ্গাধরবাবু। সে একটু লজ্জিতই হইল। কারণ সেই রাত্রির আশ্রয়ের পর আর একটি দিন মাত্র সে তাঁহার বাড়ি গিয়াছিল, আর কোন খবরই লওয়া হয় নাই। কিন্তু গঙ্গাধরবাবু কোনপ্রকার ভর্ৎসনার ধার দিয়াও গেলেন না, কাছে আসিতেই একেবারে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, কেমন আছ ভাই?······নানা রকমে এমন জড়িয়ে রয়েছি, তোমার একদিন যে খবর নেব তাও পারিনি। বড্ড লজ্জিত আছি।

অমল হেঁট হইয়া, গঙ্গাধরবাবুর বাধাসত্ত্বেও, তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, তাহার পর কহিল, অপরাধ আমারই দাদা, আমার মত বেইমান কেউ নেই—। আমারই যাওয়া উচিত ছিল।

জিভ কাটিয়া গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, ছি ছি ওকথা কি বলতে আছে! আর তা ছাড়া তুমি যাওনি ভালই করেছ, আমরা এখন এই বৌবাজারেই আছি যে—

অমল বিস্মিতও হইল, ভীতও হইল, কহিল, তার মানে? ও বাড়ী—

গঙ্গাধরবাবু জবাব দিলেন, না ভাই, মাস-তিনেক হল সে গেছে।

অমল কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, দেনাটার জন্যেই কি—

বেশ সহজভাবেই গঙ্গাধরবাবু উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, ওরা নিলাম ক'রে নিলে। একরকম ভালই হয়েছে অমল, একটু একটু ক'রে দগ্ধে মরার চেয়ে ও আপদ গেছে ভালই হয়েছে। কি বলব ভাই, রাত্রে দুশ্চিন্তায় ঘুম হ'ত না। বরং দেনা শোধ হয়েও ছশ' টাকা নগদ পেয়েছি, মেজ মেয়েটাকে যদি ওর মধ্যেই পার ক'রে দিতে পারি ত মন্দ হয় না—

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে পথ চলিবার পর গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, আমাদের কাত্তিকের কি হয়েছে শুনেছ?

অমল কহিল, কৈ না, কি হয়েছে?

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া গঙ্গাধরবাবু জবাব দিলেন, ওর স্ত্রীবিয়োগ হয়েছে। শেষ ছেলেটা হবার পর থেকেই নানা অসুখে ভুগছিল, শেষে বাড়াবাড়ি হ'তে কল্‌কাতায় নিয়ে আসতে হ'ল। বেচারীর ভয়ানক সাধ ছিল কলকাতায় বাসা ক'রে স্বামী-পুত্র নিয়ে দিনকতক ঘর করবে, বাসা নেওয়াও হ'ল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু ঘর করতে আর হ'ল না। চেয়ারে চড়ে বাড়িতে ঢুকল আর একেবারে খাটে চেপে বেরিয়ে গেল।

অমল নিঃশব্দে পথ চলিতে লাগিল। কীই বা কথা কহিবে সে! তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, বেচারী কার্তিকবাবু! একমাত্র রেসের নেশাতেই লোকটির সব গেল, কিন্তু মানুষটির যে হৃদয়ের পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহার পর আর তাঁহাকে অবজ্ঞা করা চলে না! ভদ্রলোক এখন কি অবস্থায় আছেন কে জানে, স্ত্রীর জন্য তাঁহার যে গভীর আঘাত লাগিয়াছে, তাহাতে ত সন্দেহ নাই। রেসে বড় লোক হইয়া একেবারে ভাল বাড়িতেই স্ত্রী-পুত্রকে লইয়া আসিবেন, এই ইচ্ছা ছিল বলিয়াই কিছুতে আগে বাসা করিতে পারেন নাই। এখন নিশ্চয়ই তাঁহার অনুতাপের সীমা নাই।

গঙ্গাধরবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, শুধু কি তাই? আবার বিপদের ওপর বিপদ দেখ না, রেস খেলে খেলে একেই দেনাপত্তরে জড়িয়ে ছিল, তার ওপর এই দম্‌কা খরচার মধ্যে এসে পড়ল। বিশেষ করে শেষের দিকটায় ওর ত আর জ্ঞান ছিল না, পাগলের মত হয়ে পড়েছিল একেবারে—ডাক্তার আর ওষুধ যেখানে যত ছিল, সব এনে জড়ো করেছিল—ব্যস্‌! সেই সময়টায় কোথা দিয়ে কি হয়ে অফিসের কতকগুলো টাকা ভেঙে ফেলে চাকরীটিও গেল।

অমল চকিত হইয়া কহিল, চাক্‌রিও গেল? বলেন কি? তাহ'লে এখন উপায়?

গঙ্গাধরবাবু ম্লান হাসিয়া কহিলেন, উপায় ভগবান ভাই, আমাদের আর কি উপায় আছে বলো? সাহেব ভালবাসত বলে প্রভিডেণ্ড ফণ্ডের টাকাটা পুরোই পেয়েছিল, এখনও তাইতে চলছে। তবে একটা বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে, এখানকার বাসা তুলে ওর ভাইয়ের কাছে ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেবার সময় ভাইয়ের হাতে বৌয়ের গয়নাগুলো আর হাজার টাকা নগদ দিয়ে দিয়েছে। বড় মেয়েটা মাথায় মাথায় হয়েছে, সেটাকে পার করতে পারবে, আর যাই হোক, বাকী ছেলেমেয়েগুলোকেও ভাই ফেলবে না। তাদের জন্য ভাবি না, ভয় ওর জন্যেই। সেই মেসেই আছে, হাতেও চার-পাঁচশ' টাকা ছিল জানি, হিসেব করে চললে বছর-দুই চলতে পারে, কিন্তু রেস্‌ না খেলে কি থাকতে পারবে?

সে সংশয় আর যাহারই থাক্‌ অমলের ছিল না। রেস্‌ তিনি খেলিবেনই এবং আগে যতটুকু বাঁধ ছিল, এবারে বোধ করি তাহাও থাকিবে না। হয়ত ইতিমধ্যেই সর্বস্বান্ত হইয়াছেন। সে কহিল, এর মধ্যে কতদিন কার্তিকবাবুর খবর পান নি দাদা?

গঙ্গাধরবাবু মনে মনে হিসাব করিয়া কহিলেন, প্রায় মাস দেড়েক হ'ল। বড্ড অন্যায় হয়ে যাচ্ছে বুঝি, কিন্তু মোটে সময় ক'রে উঠতে পাচ্ছি না। আজ যাবে ভাই? চল না বাসাটা ঘুরে আসি—

অমল ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল, আমার ও মেসে যেতে একটু বাধা আছে দাদা।

নিমেষে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া গঙ্গাধরবাবু কহিলেন, ঠিক ঠিক— আমারই ভুল বটে।...আচ্ছা আমি কাল যাব এখন। তুমি এখন চলো আমার বাসায়, একটু চা-টা খেয়ে যাবে—

তাঁহারা ততক্ষণে গঙ্গাধরবাবুর নূতন বাসার কাছেই আসিয়া পড়িয়াছেন। একটা তেতালা বাড়ীর নীচে দুইটি ঘর লইয়া উহারা থাকেন, কতকটা ফ্লাটের মতই, তাহারই ভাড়া মাসে আঠারো টাকা। তবু উহা আগেকার বাড়ির চেয়ে অনেকখানি পরিষ্কার, আলো-বাতাসও ঢের বেশী। তাহাকে দেখিয়া গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রী স-কলরবে অভ্যর্থনা করিলেন, চা, জলখাবর ত দিলেনই, রাত্রের খাবারও না খাওয়াইয়া ছাড়িলেন না এবং বাহিরের রাস্তা পর্যন্ত আসিয়া বার বার মাথার দিব্য দিয়া দিলেন যে রবিবার যেন সে নিশ্চয়ই আসে এবং এইখানে আহার করে; আজ কোন যোগাড়ই ছিল না, কিছুই খাওয়া হইল না, ইত্যাদি।

পথে আসিয়া অমলের আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, এই জন্যই মানুষের ঘরের এত মায়া, বাসা বাঁধিবার ইচ্ছা তাহার এত প্রবল! গঙ্গাধরবাবুর স্ত্রী পৃথিবীতে অসংখ্য নাই সত্য কথা, কিন্তু ঐ যে দৈবাৎ এক-আধবার জীবনে ইঁহাদের সাক্ষাৎ মিলে, সেই কথাই মানুষ আর ভুলিতে পারে না, ইঁহাদের মায়া দুর্নিবার বেগে মানুষকে ঘরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকে!

গঙ্গাধরবাবু উপদেশ দিয়া দিলেন, ভায়া, বারো টাকা মাইনে মার্চেণ্ট অফিসে বাহাত্তর টাকা হ'তে বেশি দেরী হয় না, শুধু বড় বাবুর দিকে নজরটা রেখে যেও, আর সাহেব দেখলেই সেলাম কোরো—

অমল যখন বাসায় পৌঁছিল, তখন প্রায় বারোটা বাজে, কিন্তু দূর হইতে নিজের ঘরে আলো জ্বলিতে দেখিয়া তাহার ভয় ও বিস্ময়ের সীমা রহিল না। সে প্রায় দৌড়িয়া ঘরে আসিয়া দেখিল, ইন্দু দ্বার খুলিয়া আলো জ্বালিয়া তাহারই

বিছানাতে চুপ করিয়া শুইয়া আছে! তালার দ্বিতীয় চাবিটা যে এখনও তাহার কাছে আছে, অমল ভুলিয়াই গিয়াছিল।

ইন্দু ক্লান্ত স্বরে কহিল, আপনি অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছেন অমলদা—

গলার আওয়াজটা অমলের ভাল লাগিল না, ইহা অন্তত ঠিক নববিবাহিত তরুণের মত নয়। সে বসিয়া পড়িয়া কহিল, কিন্তু আমি ত আপনাকে আশাই করিনি এরি মধ্যে!

ইন্দু জবাব দিল, আমি আজই সকালে এসেছি। বিকেলবেলা বেরবার আগে ওখানে বলেই এসেছিলুম, আজ রাত্রে আমি আপনার কাছে থাকব। একটু থাকব অমলদা?

কী আশ্চর্য! আপনি পাগল হলেন নাকি? নিশ্চয়ই থাকবেন। কিন্তু আপনার খাবার ব্যবস্থা যে তার আগে করা দরকার!

ইন্দু হাত বাড়াইয়া তাহার হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, থাক্ থাক্ আমার খাবার ইচ্ছাও নেই, দরকারও নাই বিশেষ। শ্বশুরবাড়িতে জলখাওয়া হয়েছে প্রচুর। কিন্তু আপনি?

অমল সংক্ষেপে গঙ্গাধরবাবুর কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল, কিন্তু তা হোক্, সামান্য কিছু নিয়ে আসি আপনার জন্য।

ইন্দু কহিল, আসুন! বেশি কিছু আনবেন না, সত্যিই আমার খাবার ইচ্ছে নেই—

অমল খাবার আনিয়া খাবার ও জল সাজাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিল। ছোট হ্যারিকিনের সামান্য আলোতে ইন্দুর মুখের যে চেহারাটা নজরে পড়িল, তাহাতে দুঃসংবাদের আভাস! ইন্দুও কথা কহিল না, নিঃশব্দে খাওয়া শেষ করিয়া মুখ ধুইয়া আসিয়া আবার শুইয়া পড়িল। অমল আলোটা নিভাইয়া দিয়া তাহার পাশে শুইয়া পড়িয়া কহিল, তারপর, ব্যাপার কি বলুন দেখি—?

ইন্দু অনেকক্ষণ পর্যন্ত জবাব দিল না। সামনের দড়ির আলনায় খান-কতক কাপড় টাঙ্গানো ছিল, তাহার উপর রাস্তার গ্যাসের আলোর একটা রেখা আসিয়া

পড়িয়াছে। দক্ষিণের বাতাসে কাপড়টা মধ্যে মধ্যে দুলিতেছিল, ফলে তাহার ছায়াটা যেন পিছনের দেওয়ালে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। দুজনেই কিছুক্ষণ সেইদিকে চাহিয়া থাকিবার পরে অমল ইন্দুর দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার বুকে একটা হাত রাখিয়া আবারও কহিল, কি হ'ল বলুন দেখি শেষ পর্যন্ত? কোন মনোমালিন্য ঘটেছে কি?

ইন্দু আরও মুহূর্ত-দুই নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিল, সে সব কিছুই নয় অমলদা, আপনি যে মনোমালিন্যের কথা ভাবছেন, আপাতত তার কোন সম্ভাবনা নেই। ওরকম স্ত্রী বহু-ভাগ্যে মেলে—

তবে?

ইন্দু জবাব দিল, শ্বশুরমশায় যে বহুদিন পরে লুকিয়ে রেস্ খেলেন, সেটা অনেকেই জানত না। কিন্তু তার ফলে তাঁর হাতের নগদ টাকা সমস্তই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। টাকাটা গেলেও মেজাজটা যায়নি, মেয়ের বিয়েতে খরচার হাতটা কিছুতে কমাতে পারলেন না এবং সেটা কোথা থেকে নিতে হয়েছিল তা জানেন কি? অফিস থেকে।

অমল কথা কহিল না। এখনও সমস্তটা শোনা হয় নাই, কিন্তু যেভাবে মেঘ জমিয়াছে তাহাতে দুর্যোগটার পরিমাণ অনুমান করা কঠিন নয়। ইন্দুই একটু পরে পুনরায় কথা কহিল, তাতেও বিশেষ অসুবিধা হ'ত না, কারণ বহুকাল ধরেই অফিসের বাড়তি টাকা ওর জিম্মাতে থেকে আসছে, আর নগদ চার পাঁচ হাজার টাকার কম কোনও দিনই থাকেনা।······সে টাকা কেউ দেখাতে চায় না, শুধু কাগজে কলমে তার হিসাবটা দেখেই সাহেবরা ছেড়ে দেন। সেই ভরসাতেই শ্বশুরমশায় তা থেকে তিন হাজার টাকা নিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, ভরসা ছিল যে এর মধ্যে কিছু কিছু ক'রে টাকাটা আবার শোধ ক'রে দেবেন, কেউ জানতেও পারবে না।

ইন্দু চুপ করিল। অমল কহিল, তারপর?

ইন্দু একটু ম্লান হাসিয়া কহিল, তারপর আর কি, আমার বরাত। কখনও

যা হয়নি আমার অদৃষ্টে তাই ঘট্‌ল। গত শনিবার হঠাৎ বড়সাহেব এসে টাকাটা দেখতে চাইলেন। হয় ত তার মধ্যে অফিসের আর কারুর হাতও ছিল, যাই হোক—টাকাটা যখন সব দেখা গেল না, তখন তাঁরা মাত্র তিনটি দিনের সময় দিলেন। আর কোনও উপায় ছিল না ব'লেই শাশুড়ীর অসুখের খবর দিয়ে আমাদের আনানো হয়েছে; শাশুড়ী ঠাক্‌রুণের সব গহনা বিক্রী ক'রেও পাঁচশ টাকা কম পড়েছিল, আমার কাছে কমলার খানকতক গহনা ধার ব'লে চাওয়া হ'ল। সুতরাং আর্মলেট আর নেকলেশ, দুটিই বেচারীকে খুলে দিতে হ'ল। আমারই চোখের সামনে পোদ্দার ওজন ক'রে নিয়ে টাকা দিয়ে চলে গেল—

অমল খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া সান্ত্বনার স্বরে বলিল, তা হোক্, গেলই বা না হয় দুখানা গয়না। মনে করুন তাঁরা ও দুটো গয়না দেননি—

ইন্দু হাসিল। অন্ধকারে সে হাসি ভাল দেখা গেল না, নিঃশব্দ হাসি, কিন্তু তবুও অমল তাহা অনুভব করিয়া শিহরিয়া উঠিল। ইন্দু বলিল, সবটা এখনও শোনেন নি যে!···টাকাটা শোধ করে দিয়ে চাক্‌রি যাবারই কথা। সাহেব ভালোবাসেন ব'লে সেটা কোনরকমে এড়ানো গেছে কিন্তু বডবাবুর চাকরী আর ওঁকে করতে হবে না। মাইনেটাও একশ পঁচাত্তর থেকে শুধু পঁচাত্তরে নেমে এসেছে! সুতরাং যদিও শ্বশুরমশায় এখনও মুখে আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, কিন্তু, ও অফিসে কারুর চাকরী করে দেওয়া যে আর ওঁর পক্ষে সম্ভব হবে, এ বিশ্বাস আমার নেই—

আবারও বহুক্ষণ দুজনে নিস্তব্ধ হইয়া শুইয়া রহিল। মনে হইল যেন ঘরের মধ্যকার বাতাসটা ডেলা পাকাইয়া দুজনের বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে, কাহার কথা কহিবার সাধ্য নাই—

অনেকক্ষণ পরে অমল ভাষা খুঁজিয়া পাইল। কহিল, দেখুন এখন নামিয়ে দিলেও সাহেবরা যে সব বাবুকে ভালবাসে, চট্‌ করে তাদের ওপর থেকে স্নেহটা যায় না, আপনার শ্বশুরমশায় আবার রাইজ করবেনই। তা ছাড়া তাঁর নিজের

প্রেমোশন পাওয়া সম্ভব না হ'লেও ব'লে ক'য়ে তাঁর জামাইকে কি আর কোথাও ঢুকিয়ে দিতে পারবেন না? আমার ত মনে হয় সেটা এমন কিছু অসম্ভব হবে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ইন্দু জবাব দিল, কে জানে কি সম্ভব হবে! কিন্তু আমি ত মনে কোন বল পাচ্ছি না।

তাহার পর সহসা অমলের দিকে পাশ ফিরিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, কী হবে অমলদা। আমার যে কী ভয় হচ্ছে কী বলব আপনাকে। কেন একাজ ক'রে বসলুম তাই ভেবে অনুশোচনায় মরে যাচ্ছি, সুবিধে কিছুই হ'লনা বরং আরও দুর্ভাবনা বাড়ল। বেশ ছিলুম আপনার কাছে, কেন এ দুর্মতি হ'ল কে জানে! পেলুমনা কিছুই—উপরন্তু আগে স্বাচ্ছন্দ্য না থাক্ শান্তি ছিল, এখন সে শান্তিটুকুকেও বিদায় দিতে হ'ল।

অমল সান্ত্বনাছলে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, কিছুই কি পেলেন না? একটি মেয়ের ভালবাসা কি তাহ'লে এতই তুচ্ছ জিনিস ইন্দুবাবু?

লজ্জিত হইয়া ইন্দু জবাব দিল, তা বটে। সেটা তুচ্ছ করবার জিনিস নয় মানি, আর ভগবানের ইচ্ছেয় সেটা পেয়েছিও অজস্র। কিন্তু বড্ডই দুর্ভাবনা আমলদা—

আর কেহই কথা কহিল না।

ঘরের মধ্যে নিবিড় নিস্তব্ধতা, বাহিরেও প্রায় তাহাই; শুধু একটা রাস্তার কল কে দড়ি বাঁধিয়া খুলিয়া রাখিয়াছে, সারারাত্রি ধরিয়া তাহারই একটা একটানা জল পড়ার শব্দ, আর দূরে, প্রশস্ততর রাজপথে কদাচিৎ এক-আধখানা গাড়ি চলার আওয়াজ, ইহা ছাড়া আর কোথাও কোন শব্দ নাই; সমস্ত শহর যেন মরিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তবুও সেই দুটি তরুণের কিছুতেই নিদ্রা আসিল না, সেইরূপ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থাতেই দুজনে সারারাত জাগিয়া কাটাইয়া দিল।

১৬

পুরা মাস কাজ করে নাই বলিয়া অমল সে মাসে মাহিনা পাইল মাত্র নয় টাকা সাত আনা। ইহার মধ্য হইতেই লাইব্রেরীয়ানকে পাঁচ টাকা দিবার কথা, কিন্তু সে সাহসে ভর করিয়া তিনটি টাকা তাঁহার সামনে রাখিয়া কহিল, এই তিনটে টাকাই নিন্ মনমোহনদা, বড্ড টানাটানি, এর বেশী দিলে আর খেতে পাব না।

কিন্তু মনমোহনবাবু কি কারণে সেদিন বেশ খোস মেজাজেই ছিলেন, প্রসন্ন মুখে টাকা তিনটি পকেটে তুলিয়া বলিলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তার জন্য কি হয়েছে। তা ছাড়া তুমি আসায় আমার ঝঞ্ঝাটও অনেক কমেছে। কিছু ভেবো না তুমি ভায়া, নেক্‌সট ইনক্রিমেণ্টের সময়ে অন্তত তিনটে টাকা মাইনে যাতে তোমার বাড়ে, তার জন্যে প্রাণপণে ফাইট করব।

পরের দিন অফিসে আসিবার সময় পোষ্ট অফিসে ঢুকিয়া অমল পাচটি টাকা বাবার নামে মণি অর্ডার করিয়া দিল। তাহার পর সেইখানে দাঁড়াইয়া পেন্সিল দিয়া মাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিল। এতদিন পরে সে বড় অফিসে চাকুরী পাইয়াছে সে কথা জানাইয়া লিখিল, এখন কিছুদিন শিক্ষানবিশ থাকতে হবে বলে মাইনে খুবই কম, এরপর ভাল মাইনে পাব, আশা আছে।

একদা তাহাদের অল্প মাহিনার মাষ্টারীকে উপেক্ষা করিয়া আসিয়া আজ বারো টাকা মাহিনাতে শিক্ষিত বেয়ারার কাজ করিতেছে, সে কথাটা জানাইতে তাহার লজ্জা বোধ হইল।...

দিন পাঁচেক পরে বাসায় ফিরিয়া দেখিতে পাইল একখানা খামে আঁটা চিঠি মেঝেতে পড়িয়া আছে। এতদিন পরেও তাহার বাবার সুন্দর হাতের লেখা চিনিতে দেরী হইল না। সে তাড়াতাড়ি আলো জ্বালিয়া সেই অবস্থাতেই খাম ছিঁড়িয়া চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িতে বসিল; সামান্য কয়েক ছত্র চিঠি—কিন্তু তাহারই মধ্যে বহুদিনের ইতিহাস, বেদনা ও অভিমান জমিয়া আছে নিশ্চয়ই!

চিঠিতে লেখা ছিল—

"কল্যাণবরেষু—

তোমার পত্র এবং টাকা দুইই পাইয়াছি। কিন্তু তুমি চিঠি যাঁহাকে লিখিয়াছ, তাঁহার কাছে সে চিঠি পৌছানো আর সম্ভব নয়, কারণ আজ তিন মাসেরও অধিক হইল তিনি স্বর্গে গিয়াছেন।"

অকস্মাৎ অমলের চোখের সম্মুখে সমস্তটা লেপিয়া মুছিয়া একাকার হইয়া গেল। তাহার মা নাই! মা মারা গিয়াছেন? সে লাইনটি আবারও একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিল, না ভুল ত হয় নাই! তাহার বাবা পরিহাস করিবারও লোক নহেন, সত্যই তাহার মা আর নাই।

নিস্তব্ধভাবে কেরোসিনের আলোটার দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতে তাহার মন ফিরিয়া গেল একেবারে তাহার বাল্যকালে। দারিদ্র্যের মধ্যেই চিরকাল তাঁহাকে সংসার করিতে হইয়াছে, চতুর্দিকে অভাব-অনটন, তাহার উপর দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি স্থতরাং খুব একটা কিছু লোক-দেখানো স্নেহ তিনি অমলকে কোন দিনই দেখাইতে পারেন নাই; আরও পাঁচটা ছেলে-মেয়ে তাঁহার ছিল, সকলের সঙ্গেই তিনি অমলকে মানুষ করিয়াছেন। সকলের প্রতি নিছক কর্তব্যটুকু পালন করিতেই দিনেরাতে কুড়ি ঘণ্টা সময় চলিয়া যাইত, কাজেই বিশেষ স্নেহের দাবী অমল করিতেও পারে না—কিন্তু তবু, তবু সে ভালবাসার কি তুলনা আছে?

ম্যাট্রিক পরীক্ষার দিন বারো-চৌদ্দ আগে হঠাৎ অমলের প্রবল জ্বর হয়, সেই সময়টা সংসারের কাজও ছিল খুব বেশী, তবু অমলের বেশ মনে আছে, প্রতিটি কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি পাঁচ সাত মিনিট অন্তরই কাছে আসিয়া বসিয়া গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া যাইতেন, সাগু খাওয়ানো হইতে শুরু করিয়া বারে বারে তৃষ্ণার জল দেওয়া অবধি তাঁহার সেবার কোন কাজই তিনি অপর কাহাকেও করিতে দেন নাই। শুধু কি তাহাই? যে দুই দিন অমলের বেশী জ্বর ছিল, সেই দুই দিনই রাত্রে তিনি তাহাকে ছেলে-

মানুষের মত বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিয়া সারারাত বসিয়া কাটাইয়া দিয়াছেন, সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পরও একটি মিনিটের জন্য চোখ বোজেন নাই !

আরও ছেলেবেলাকার প্রতিটি খুঁটি-নাটি ঘটনা মাথার মধ্যে যেন ভিড় করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। আজ এতদিন পরে সে যেন অনুভব করিল, তাহার মায়ের স্নেহ তাঁহার প্রথম সন্তানের প্রতিই বোধ হয় একটু বেশী ছিল।

ততক্ষণে তাহার প্রথম স্তম্ভিত অবস্থা কাটিয়া গিয়াছে, বুক হইতে একটা কি যেন ঠেলিয়া উঠিয়া চোখ দিয়া মুখ দিয়া বাহির হইতে চায়। তাহারই অব্যক্ত বেদনায় কপালের শিরাগুলা টন টন করিয়া ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল। তবুও সে প্রাণপণে চোখ মেলিয়া চিঠিটার বাকী অংশটুকু পড়িয়া ফেলিল।

"তুমি নিরুদ্দিষ্ট হইবার পর হইতেই তাহার মন ভাঙ্গিয়া পড়ে—সঙ্গে সঙ্গে দেহও। তাহার পর তোমার মাসীমার নিকট হইতে যখন তোমার সংবাদ পাওয়া গেল তখন তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হইলেও সম্পূর্ণরূপে স্বাভাবিক অবস্থায় আর কিছুতেই ফিরিয়া আসিতে পারিলেন না। সেই সময় হইতে নানারূপ রোগে ভুগিয়া অবশেষে গত অগ্রহায়ণ মাসে সকল জ্বালা-যন্ত্রণার হাত হইতে অব্যাহতি পাইলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে তোমাকে একবার দেখিবার জন্য তাঁহার খুবই ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তোমাকে সে সংবাদ জানান সম্ভব হয় নাই। তোমার পূর্ব ঠিকানায় চিঠি দিয়াছিলাম, সে চিঠি ফেরৎ আসায় বুঝিলাম, তুমি ওখানে নাই। তোমার মায়ের শেষ-কৃত্য খোকাকেই করিতে হইয়াছে।

প্রায় বৎসর খানেক হইল আমি চাকরী ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া আছি। আমার মাথায় মধ্যে মধ্যে খুবই যন্ত্রণা হইত, বোধ হয় তোমার মনে আছে; সেই যন্ত্রণাই ইদানীং এত বাড়িয়াছে যে, ছেলেপড়ানো আর আমার দ্বারা সম্ভব নয়। এখানে সরকার বাবুরা হাটের কাছে একটা চাল-ডাল-কড়াইয়ের গোলা খুলিয়াছেন, খোকা সেইখানেই কাজ করে, কুড়ি টাকা মাহিনা হইয়াছে।

তাহাতেই সংসার চলে। পুঁটি, বুড়ি দুজনেই ভাল আছে; টাকার অভাবে কাহারও বিবাহের ব্যবস্থা করা যায় নাই। ঘেঁটু এখানকার স্কুলে পাশ করিয়া বসিয়া আছে, অর্থাভাবে তাহাকেও আর বড় স্কুলে দিতে পারি নাই।

আশা করি তুমি কুশলেই আছ। যদি সম্ভব হয় একবার বাড়িতে আসিও, কারণ আমারও যাত্রার আর দেরী নাই বলিয়াই বোধ হয়। আমার আশীর্বাদ জানিও, তোমার মাতাও মৃত্যুর পূর্বে তোমাকে আশীর্বাদ জানাইয়া গিয়াছেন। ইতি—

আশীর্বাদক

তোমার বাবা"

চিঠিখানা পড়া শেষ হওয়ার পরেও বহুক্ষণ অমল ঠিক সেইখানেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর গভীর রাত্রে কোনমতে উঠিয়া দরজাটা বন্ধ করিয়া আসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। এতক্ষণ পরে তাহার দুইচক্ষু প্লাবিয়া অকস্মাৎ বহুক্ষণের নিরুদ্ধ বেদনা অশ্রুর আকারে বাহির হইতে লাগিল। সে বহুক্ষণ ধরিয়া কাঁদিল—নিঃশব্দ, কিন্তু বুকফাটা কান্না। এ শুধু তাহার মাতৃবিয়োগের ব্যাথা নয়, তাহার জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত বেদনা এই উপলক্ষ্যে আবার নূতন করিয়া তাহাকে যেন পীড়া দিতে লাগিল।

পরের দিন সকালে উঠিয়াই অমল গঙ্গার ধারে চলিয়া গেল। সে শুনিয়াছিল যে, যতদিন পরেই হউক, কানে শুনিলেই মহাগুরু নিপাতের অশৌচ লাগে। সে নাপিত ডাকিয়া মাথা গোঁফ সব কামাইয়া গঙ্গা স্নান করিল, তাহার পর ঘাটের ধার হইতেই একজন ব্রাহ্মণ ডাকিয়া তাঁহার হাতে একটা টাকা দিয়া একটা ভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া যথারীতি মায়ের পারলৌকিক কার্য সম্পন্ন করিল। এটুকু না করিলে কিছুতেই তাহার শান্তি হইত না; ইহার কোন ফল আছে কি না আছে, তাহা লইয়া সে মাথা ঘামায় নাই, তবে জীবিতকালে ত মায়ের সে কোন উপকারেই আসিল না, সে ভাবিয়া দেখিল, মৃত্যুর পর তাঁহার স্মৃতির প্রতি এই শেষ সম্মানটুকু দেখানো প্রয়োজন।

সেদিন আর রান্না করার সময়ও ছিল না, ইচ্ছাও ছিল না, সামান্য কিছু ফল ও এক গ্লাস সরবৎ খাইয়াই সে অফিসে বাহির হইয়া পড়িল।

কিন্তু সেই দিনই অফিসের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে সহসা তাহার বড়বাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। ইনি দেবেশবাবু সেকশনের বড়বাবু বটে, কিন্তু ছোটসাহেবের পেয়ারের লোক বলিয়া অফিসে ইঁহার প্রতিপত্তিটাই বেশী। সেই জন্যই হউক, আর চাকরী করিয়া দিবার কৃতজ্ঞতাতেই হউক, অমল দেখা হইলেই তাঁহাকে ভক্তিভরে নমস্কার করিত! সেদিনও সে নমস্কার করিয়াই উঠিয়া যাইতেছিল, সহসা তাহার মুণ্ডিত মস্তক, শুষ্কমুখ ও আরক্ত চক্ষুর দিকে দৃষ্টি পড়ায় বড়বাবু তাহাকে ডাকিলেন, কহিলেন, এসব কি ব্যাপার হে?

মুহূর্ত কয়েক ইতস্তত করিয়া অমল আসল কথাটাই বলিয়া ফেলিল, মা মারা গেছেন।

তারপর বড়বাবুর চোখে বিস্ময় লক্ষ্য করিয়া সে নিজেই বলিল, অনেক দিন আগেই চাকরীর খোঁজে কলকাতাতে এসেছিলুম কিন্তু কাজকর্ম কিছুই জোটাতে পারিনি ব'লে আর দেশে কোন খোঁজ-খবর দিইনি। এতদিন পরে এ মাসের মাইনে পেয়ে মায়ের নামে পাঁচটি টাকা পাঠিয়েছিলুম, তারই জবাবে কাল দেশ থেকে চিঠি এসেছে যে মা মাস-তিনেক হল মারা গেছেন!

কথাটা বলিতে বলিতেই তাহার দুই চোখ ছল ছল করিয়া উঠিল। বড়বাবুও দৃষ্টিটা যেন কোমল হইয়া আসিল, তিনি কহিলেন, তাই বুঝি ঘাটে গিয়ে অশৌচটা কাটিয়ে এলে! তা ঠিকই করেছ! এখন তোমার দেশে রইলেন কে কে?

অমল জবাব দিল, বাবা আছেন, তিনি সামান্য ইস্কুলমাষ্টারী করতেন, তাও অথর্ব হয়ে পড়ায় ছেড়ে দিতে হয়েছে। মেজো ভাইটি একটা মুদীর দোকানে খাতা লিখে যা পায় তাইতেই সংসার চলে। আর আছে দুটি বোন আর একটি ভাই। কিন্তু না বোনদের বিয়ে, আর না ভায়ের লেখাপড়া, কোন ব্যবস্থাই হচ্ছে না।

বড়বাবু একবার অস্ফুটস্বরে শুধু বলিলেন, ইস!……

তাহার পর মিনিট খানেক চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেলেন। অমলও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া লাইব্রেরীতে আসিয়া ঢুকিল। সেদিন তাহার আর কোনও কাজে মন লাগিল না, চুপ করিয়া নিজের চেয়ারটায় বসিয়া খোলা জানালার মধ্যে দিয়া দূর আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। বেয়ারাটা তাহাকে ঐ অবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইল, কিন্তু তাহার চোখের দিকে চাহিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। বহুক্ষণ, প্রায় দুই ঘণ্টাকাল, সে সেইভাবেই বসিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতে লাগিল।

বেলা আড়াইটা নাগাদ দেবেশবাবু প্রায় লাফাইতে লাফাইতে ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহার মুখে চোখে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছিল। কহিলেন কি বলেছ হে মাষ্টার, বড়বাবুকে ?

অমল চমকাইয়া উঠিল। একটু ভীতভাবেই বলিল, বড়বাবুকে ? কী বলেছি ?

দেবেশবাবু কহিলেন, আরে নাও, কি বলেছ তাইত জিজ্ঞেস করছি। হঠাৎ বড়বাবু তোমার ওপর এত সদয় হয়ে উঠল কেন ?

তাহার পর সহসা তাহার চেহারার দিকে নজর পড়ায় কহিলেন, এ কি এসব কি ব্যাপার হে ?

অমল সংক্ষেপে তাঁহাকে কথাটা খুলিয়া বলিল। শুনিয়া দেবেশবাবুর ছোট ছোট চোখ দুটি করুণার্দ্র হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, ইস! আহা বেচারী! তাই তুমি আজ সকালে পড়াতেও যাওনি বটে। আমার অতটা খেয়াল ছিল না। আর ছেলেগুলোও হয়েছে তেমনি। সেজন্যে ত ওদের মাথা ব্যথা নেই! মাষ্টার আসেনি ত ওরা বেঁচেছে, সে কথা আমাকে একবার বলেও না।…তা তোমার সঙ্গে বড়বাবুর দেখা হয়েছিল বুঝি, এই অবস্থায় ?

অমল ঘাড় নাড়িয়া কহিল, হাঁ। তিনিও ব্যাপারটা কি জানতে চাইলেন, তাই তাঁকে সব কথাই খুলে বলেছিলুম।

পিঠে একটা চাপড় মারিয়া দেবেশবাবু কহিলেন, ভালই করেছ ভায়া; মা মরে তোমার শাপে বর হল !···বড়বাবু গিয়েই ছোটসাহেবের ঘরে ঢুকেছিল, আর কি ব্যবস্থা করেছে জান ?

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, কৈ না ত !

দেবেশবাবু কহিলেন, আজ থেকে তুমিই লাইব্রেরীর সমস্ত চার্জ পেলে, আর সেই জন্যে তোমার মাইনেও বেড়ে একেবারে ত্রিশ টাকা হয়ে গেল। এ মাসের পয়লা থেকেই বাড়তি মাইনের হিসেব ধরা হবে।

অমল উত্তেজনায় উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, কিন্তু মনমোহনবাবু ?

দেবেশবাবু বলিলেন, ঐ মনমোহনেরই যা একটু অসুবিধা হল। অবশ্যি খুব বেশী অসুবিধা হতে বড়বাবু দেয়নি, বাড়তি যে পঁচিশটে টাকা পাচ্ছিল সেটা গেল বটে, কিন্তু তেমনি পনের টাকা স্পেশ্যাল ইন্‌ক্রিমেণ্ট পেলে।···মরুক গে, মনমোহনের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না, ও অনেক টাকা মাইনে পায়। তুমি এখন চল, বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করে আসবে।

বড়বাবুর সহিত দেখা করিতে গিয়া কিন্তু অমলের কণ্ঠে কোন কৃতজ্ঞতার ভাষা আসিল না। সে শুধু নীরবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তবে তাহার দৈন্য সম্পূর্ণরূপেই ঢাকিয়া লইলেন দেবেশবাবু; কহিলেন, ছোকরা শুনেই কেঁদে ফেলে দিলে, বললে, বড়বাবু গেল জন্মে আমার কেউ ছিলেন দেবেশবাবু, নইলে এমন উপকার কেউ করে না !···তা কাজ যা করলেন বড়বাবু; এ শুধু আপনাতেই সম্ভব। একটা ফ্যামেলিকে বাঁচালেন।

বড়বাবু হাসিলেন; কহিলেন, কী জানো দেবেশ, আমরা মুখুসুখ্যু মানুষ, বি-এ, এম-এ পাশ ত করিনি, কেউ কষ্টে পড়েছে শুনলেই আমরা আর স্থির থাকতে পারি না ! তা যাও হে ছোকরা, মন দিয়ে কাজকর্ম্ম করগে ! দেশে বাপকে চিঠি লিখে দাও বরং—তিনি যেন ভাইগুলোর লেখাপড়ার একটা ব্যবস্থা করেন।

অমল লাইব্রেরী ঘরে গিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই আদেশ পালন করিল। বাবাকে চিঠি লিলিয়া দিল, তিনি যেন পত্রপাঠ ঘেঁটুকে হাইস্কুলে ভর্তি করিয়া দেন। অতঃপর

হইতে সে প্রতি মাসেই দশ-বারো টাকা পাঠাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। তাহাতে ঘেঁটুর পড়ার খরচটা অন্তত চলিয়া যাইবে।...আর আগামী মাসের মাহিনা পাইলে সে দেশে গিয়া বাবাকে দেখিয়া আসিবে, সে কথাও লিখিয়া দিল।

চিঠি লেখা শেষ করিয়া চোখ বুজিয়া চেয়ারে ঠেস দিয়া বসিতেই তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল তাহার মায়ের স্নেহমাখানো চক্ষু দুইটি! তাঁহার সে দৃষ্টি হইতে যেন করুণা ও আশীর্বাদ ঝড়িয়া পড়িতেছে! ঘেঁটু মায়ের শেষ সন্তান, তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারিলে মা স্বর্গে থাকিয়াও প্রসন্ন হইয়া উঠিবেন নিশ্চয়।

১৭

ইতিমধ্যে কয়দিন আর ইন্দুর খোঁজখবর পায় নাই একথাটা বরাবরই অমলের মনকে পীড়া দিতেছিল, কিন্তু আরও তিন চার দিন পরে সে রীতিমত চিন্তিত হইয়া উঠিল। সেদিন রাত্রে সেই যে সে অকস্মাৎ আসিয়াছিল, তাহার পর আর দেখা করে নাই কিংবা কোন চিঠিও দেয় নাই। এক্ষেত্রে কী করা উচিত তাহা অমল ঠিক করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার শ্বশুরবাড়ির ঠিকানাটা সে জানিত, কিন্তু সেখানে খোঁজ করিতে যাওয়া উচিত হইবে কিনা ভাবিয়া পাইতেছিল না। অবশেষে রবিবার দিন পর্যন্তও যখন কোন খবর মিলিল না, তখন আর সে স্থির থাকিতে পারিল না, ইন্দুর শ্বশুরবাড়ির উদ্দেশ্যেই যাত্রা করিল।

পাণিহাটির কাছাকাছি একটা কলে তিনি চাকুরী করিতেন, আর তাহারই কাছাকাছি তাঁহার বাড়ি; এইটুকু তাহার জানা ছিল এবং কলটার নামও সে জানিত। সেই ঠিকানা সম্বল করিয়াই বহু পথ হাঁটিয়া এবং কিছু বাস ভাড়া দিয়া অপরাহ্ণ নাগাদ সে ইন্দুর শ্বশুরবাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিল।

শ্বশুর মহাশয় বাহিরেই বসিয়াছিলেন, অন্তত অমলের তাঁহাকেই ইন্দুর শ্বশুর বলিয়া মনে হইল। বাগানের মধ্যে একটি ইজিচেয়ার পাতিয়া তিনি চোখ বুজিয়া

বসিয়াছিলেন। অমলের প্রশ্নের উত্তরে তিনি একবার ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চাহিলেন, তাহার পর পুনশ্চ চোখ বুজিয়াই জবাব দিলেন, সে এখন বাড়ি নেই।

অমল বোধ হয় ঠিক এটা আশা করে নাই। সে খানিকটা ইতস্তত করিয়া কহিল, কখন আসবে বলতে পারেন ?

তিনি এবারেও চোখ চাহিলেন না, সেই অবস্থাতেই জবাব দিলেন, আমি কেমন ক'রে জানব, সে কি আর কাউকে বলে যায়।

আরও মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অমল ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে, এমন সময় তিনি চোখ মেলিয়া চাহিলেন, অকস্মাৎ উত্তপ্ত-কণ্ঠে কহিলেন, সে মশাই দয়া ক'রে এখানে বাস করে, বুঝলেন ? যেটুকু না থাকলে নয় সেইটুকু থাকে, বাকি সময় কোথায় যায়, কি করে তা সেই জানে। আমরা সব হয়েছি তার শত্রু, জানেন, ভীষণ শত্রু !

একথার আর কি জবাব দিবে, সে চুপ করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল। আরও খানিকটা পরে তিনি অমলের মুখের দিকে চাহিয়া অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে কহিলেন, আপনি কি তার বন্ধু ?

অমল নিঃশব্দে ঘাড় নাড়িল।

তিনি কহিলেন, আপনার মুখটাও যেন চেনা চেনা বলে বোধ হচ্ছে। বোধ হয় বিয়েতেই দেখে থাকব। বসুন !

তাঁহার পাশের টুলটা দেখাইয়া দিয়া কহিলেন, শ্বশুর বুঝলেন, আগাগোড়াই চোর ! পান থেকে চুন খসেছে কি অমনি জামাইয়ের হয়ে গেল মেজাজ খারাপ।··· কার দোষ দেব বলুন, কালের ধর্মই হ'ল এই।···একটু চা আনতে বলি, কী বলুন ?

অমল কহিল, থাক—আমি চা খাইনা।

বিলক্ষণ ! চা না হয় নাই খেলেন, তা বলে আমি ত আপনাকে এমনি ছেড়ে দিতে পারি না। এক মিনিট বসুন, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি !···একেইত জামাইয়ের মন পাওয়া দায়, তার ওপর—

আপন মনেই বকিতে বকিতে তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন এবং প্রায় মিনিট দুই

পরে ফিরিয়া আসিয়াই আবার বলিতে শুরু করিলেন, ছেলে বলুন, জামাই বলুন, মেয়ে বলুন সবই টাকার সঙ্গে সম্পর্ক! আপনি টাকা রোজগার ক'রে তাদের ভাল ভাল খাওয়ান, পরান, দেখবেন সবাই আপনাকে ভালবাসবে, যে মুহূর্তে হাত গুটোবেন অমনি সবাই পর!

অমল চুপ করিয়াই রহিল। ভদ্রলোক কী গভীর বেদনায় এতটা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা অনুভব করিয়া তাহার বসিয়া থাকিতেও কষ্টবোধ হইতেছিল, কিন্তু উঠিয়া যাইবারও উপায় ছিল না। সে একটু পরে বলিল, কিন্তু হাত গুটোবার অবস্থা ত আপনার নয়, আপনার আর সেজন্য চিন্তা কি বলুন।

অকস্মাৎ তিনি যেন জ্বলিয়া উঠিলেন! কহিলেন, তার মানে আমাকে ঠাট্টা করছেন?

ব্যাকুল হইয়া অমল কি প্রতিবাদ করিতে গেল, কিন্তু তিনি সে অবসরই দিলেন না, বলিলেন, আপনি তার বন্ধু, আপনি কি শোনেন কি সব বলতে চান? এই যে সে দুবেলা দুমুঠো খেয়েই কোথায় কোথায় ঘোরে তা কি আমি জানি না মনে করেন? যেখানে যত আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব আছে সকলের কাছেই কি আমার নিন্দে করে বেড়াচ্ছে না বলতে চান? কী করব বলুন, অদৃষ্টদোষে আজ জোচ্চোর হয়ে পড়েছি—সব সইতে হয়! আর আপনাদের দোষ দেব কি, যে বেটারা চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস করত না, তারাই কত টিট্‌কিরী মেরে যাচ্ছে—হুঁ!

ততক্ষণে জলখাবারের থালা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে! আয়োজন প্রচুর, সেদিকে চাহিয়া অমল ভীত হইয়া উঠিল। সে করজোড়ে কহিল, দেখুন, এত কি কখনও জল খাওয়া যায়? আপনিই বলুন!

তিনি যেন উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তার পর কহিলেন, নিজের মেয়ে জামাইয়ের কাছে জোচ্চোর বনে রয়েছি এতে কি আমার কম কষ্ট হচ্ছে মনে করেন? আমি কি চেষ্টা করছি না কিছু—কিন্তু মেয়ে জামাই-ই যদি প্রতিনিয়ত এমন ভাবে গঞ্জনা দেয়, তাহ'লে কেমন ক'রে বাঁচি বলুন দেখি?

অমল হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিল, আমাকে মাপ করবেন, আপনি আমারও বাবার মত, আমি না বুঝেই একটা কথা বলে ফেলেছি, এতটা ভাবিনি কিছু! ও নিয়ে আর মিথ্যে মিথ্যে মন খারাপ করবেন না—

তিনি তাহার হাত দুইটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন, ছিঃ ছিঃ বাবা, তুমি কেন 'কিন্তু' হচ্ছ, আমারই মাথার ঠিক নেই—যা তা বলছি। বড় অন্যায় হ'ল কিন্তু—

তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া গিয়াছিল। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া কহিলেন, জামাইয়েরও আমি দোষ দিচ্ছি না বাবা! তবে তাকে বুঝিয়ে ব'লো যে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি, সে যেন আর ক'টা দিন আমাকে মাপ করে—সে আর কমলা দু'জনেই মুখ ভার ক'রে ঘুরে বেড়ায়, কি কষ্টই যে হয় বাবা আমার কি বলব, যেন বুক ফেটে যায়!

এতক্ষণে তাঁহার জলখাবারের থালাটির দিকে নজর পড়িল, তিনি ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, ছাখো, আবোল-তাবোল কি বকে মরছি, তুমি যে খেতে শুরুই করোনি এখনও। না-না, ওসব কোন কথা আমি শুনব না, ওসব তোমাকে খেতে হবে। কমলাই সব নিজে হাতে সাজিয়ে দিয়েছে।

অমল নতমুখে খাবারগুলি খাইতে লাগিল। কমলার সহিত দেখা করিতে পারিলে মন্দ হইত না, ইন্দুর খবর হয়ত পাওয়া যাইত, কিন্তু লজ্জায় সে কথা সে ইহার কাছে বলিতে পারিল না। খাবার সে প্রায় সবগুলিই খাইল, কমলা নিজ হাতে সাজাইয়া দিয়াছে শুনিয়া আর কোনটাই যেন তাহার ফেলিতে ইচ্ছা হইল না।

খাওয়া শেষ করিয়া পুনশ্চ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে তিনিও উঠিয়া পড়িলেন, তাহার দুই কাঁধে দুটি হাত রাখিয়া অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে কহিলেন, তুমি তাহ'লে ওকে একটু বুঝিয়ে ব'ল বাবা! কমলা বলছিল তুমি নাকি তার বিশেষ বন্ধু, তোমাকে সে খুব ভক্তি করে।

নিশ্চয়ই বলব।

অমল তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু রাস্তা পার হইয়া বড় রাস্তায় পড়িয়া সে বাসের অপেক্ষা করিতেছে এমন সময় একটি বছর আষ্টেক-দশের ছেলে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া তাহার হাতে একটি চিঠি দিল, কহিল, দিদি এই চিঠিটা আপনাকে দিতে বললে।

অমল চাহিয়া দেখিল অবিকল কমলার মুখ, তাহারই ছোট ভাই নিশ্চয়। তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিতে গিয়া তাহার হাতটা যেন একটু কাঁপিয়া গেল। কিন্তু দেখিল সামান্য দুই-ছত্র মাত্র চিঠি—

"সে কাজকর্মের চেষ্টায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার কথা তাকে বলব, আপনার সঙ্গেও দেখা করতে বলব। বাবার কথায় কিছু মনে করবেন না। প্রণাম নেবেন।"

কোন সম্বোধন নাই, অন্য কোন সম্ভাষণও নাই; কিন্তু সেই আঁকা-বাঁকা হাতের লেখা। তাহার মন মুহূর্তের জন্য সেই প্রথম চিঠিখানি আসার দিনে চলিয়া গেল। সে অন্যমনস্কভাবে শুধু কহিল, আচ্ছা। কিন্তু কমলার ভাই চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে পড়িল তাহাকে কোন কুশল সম্ভাষণ পর্যন্ত করা হইল না কিংবা কমলার কথাও কিছু জিজ্ঞাসা করা হইল না। ফিরিয়া দেখিল সে অনেকদূর চলিয়া গিয়াছে, তখন আর তাহাকে ডাকা যায় না।

চিঠিখানা বুক পকেটে গুঁজিয়া আবার পথ চলিতে শুরু করিল। সে যে 'বাসে'র জন্য দাঁড়াইয়াছিল, সে কথাও সে ভুলিয়া গেল। সে ভাবিতেছিল কমলার কথা, যতদূর দৃষ্টি যায় কোন আসক্তির চিহ্ন ত সে মনের মধ্যে খুঁজিয়া পায় না, তবে তাহার চিঠি খুলিতে গিয়া এমন হাত কাঁপে কেন? কেন তাহার কথা শুনিলে বুকের রক্ত এমন করিয়া চঞ্চল হইয়া উঠে? এ তাহার কী অদ্ভুত অবস্থা?

হাঁটিতে হাঁটিতে শ্যামবাজারের মোড়ে যখন উপস্থিত হইল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। তখন আর হাঁটিবার ইচ্ছাও ছিল না, শক্তিও ছিল না। সে সেইখান হইতেই বৌবাজারগামী একটা বাসে উঠিয়া পড়িল। ভাগ্যক্রমে বাসে

উঠিয়া সে যাঁহার পাশে বসিল তিনি তাহার সেই আগেকার মেসের নগেনবাবু উকিল ; তিনি থাবার মত একটা হাত তাহার কাঁধে দিয়া উপর্যুপরি প্রশ্ন করিয়া চলিলেন, কী হে ভায়া, কতদূর যাবে ? এখন আছ কোথায় ? কি করছ ? চাকরি-বাকরি করছ নাকি কোথাও ?

অমল বিস্মিত হইয়া দেখিল ইতিমধ্যে তিনি যেন অনেকটা বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বেশভূষার অবস্থাও বিশেষ ভাল নয়, কোটটি ত প্রায় শতছিন্ন। সে তাঁহার অন্য সমস্ত প্রশ্নগুলি এড়াইয়া গিয়া কহিল, হাঁ মাস কতক হল একটা বিলিতি ফার্মে কাজ পেয়েছি। আপনার খবর সব ভাল ত ? এদিকে কোথায় গিয়েছিলেন ?

নগেনবাবু কহিলেন, এদিকে এই পাইকপাড়া ষ্টেটে একটা কাজ করছি যে।

অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, সে কি ? ওকালতি ছেড়ে দিলেন ?

নগেনবাবু কহিলেন, হ্যাঁ। বড্ড কম্পিটিশান, সুবিধা হ'ল না। কিন্তু তাই বলে বসে নেই একটি দিনও। চাকরী পেয়ে তবে কাজ ছেড়েছি। সময় অমূল্য—বাপরে, সময় নষ্ট করতে আছে ! বুঝলে হে অমলবাবু, একটা কথা বলে রাখি ; বয়োজ্যেষ্ঠ লোক আমি, আমার কথাটা শুনে চ'ল, চুপ করে বসে থাকবে না একটি মিনিটও······

এ সবই পুরানো কথা। অমল অন্যমনস্ক হইয়া তাহার মেসের দিনগুলির কথা ভাবিতেছিল, সহসা কানে গেল নগেনবাবু বলিতেছেন, এই দেখ না কার্তিকবাবু, চাকরী গেল, কিছু টাকা হাতে করে এসে চুপচাপ বসলেন। আমি তখনই পই-পই করে বলেছিলুম, কার্তিকবাবু, অমন কাজটি করবেন না ; চাকরী না থাকে, অন্তত সকাল বিকেল গোটাকতক ট্যুইশান শুরু করে দিন—তাও না জোটে নিদেন শুধু রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান,—সেও ভাল। তা আমার কথা ত শুনলেন না, এখন তেমনি হ'ল—

আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া অমল কহিল, কী হ'ল কার্তিকবাবুর ? ওখানেই আছেন ত ? অসুখবিসুখ কিছু—

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসিয়া নগেনবাবু কহিলেন, আরে না, না, সে ত বরং ভাল

ছিল! টাকা যা ছিল সব ত রেসে উড়িয়ে দিলেন, তার পর মন গুমরে গুমরে চুপচাপ এক জায়গায় বসে থাকতেন আর ভাবতেন, ফলে যা হবার তাই হ'ল। এখন ত দস্তুর-মত মাথা খারাপের লক্ষণ।

অমল কিছুক্ষণের জন্য যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। অনেকক্ষণ পরে কহিল, তার পর, এখন আছেন কোথায়?

নগেনবাবু কহিলেন, আছেন ঐ মেসেই। তা সে আর কতটুকু থাকেন বলো। তিন দিন চার দিন কোথায় উধাও হয়ে যান, তার পর আবার হয়ত একবেলা এসে থাকেন, খাওয়া দাওয়াও করেন। আমরা ভাইকে চিঠি দিয়েছিলুম, সে বেচারা নিতেও এসেছিল, কিন্তু উনি গেলেন না। আমাদেরও এতদিনের জানা-শোনা, বাবুদের চক্ষুলজ্জায় বাধছে। কিন্তু আমি এবার হরিবাবুকে বলে দিয়েছি যে এমন ক'রে আমরা আর কাঁহাতক টানি, যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন মশায়!

ততক্ষণে বাস কলুটোলার মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আপনি নাববেন না?

ঈষৎ লজ্জিত মুখে নগেনবাবু জবাব দিলেন, বৌবাজারে আবার একটা টিউশনী আছে কি না!···চালানি কারবার করেছিলুম দিন কতক, তাতে অনেকগুলো টাকা লোকসান গেছে, সেটা তুলে নিতে না পারলে—বসে থাকা ত ঠিক নয় চুপ ক'রে, বুঝলে না?

অমল নামিয়া পড়িল। তাহার কার্তিকবাবুর কথাটাই মনে পড়িতে লাগিল বারবার, বেচারীর দোষের মধ্যে ছিল দুর্দান্ত রেস খেলিবার নেশা, কিন্তু সেটা বাদ দিলে মানুষটি যে কত অমায়িক তাহা ত সে নিজেই দেখিয়াছে! অমন দিল-খোলা লোকটার এই পরিণাম।······কে জানে কেন এমন হইল, স্ত্রী বিয়োগের জন্য অনুতাপই হয়ত ইহার কারণ! কিম্বা স্ত্রীবিয়োগের ব্যথা। কে জানে?

একবার তাহার মনে হইল গঙ্গাধরবাবুর বাসায় গিয়া খোঁজ-খবর করে, কিন্তু তখন যেন আর পা চলিতেছিল না। সে সোজাসুজি নিজের ঘরের দিকেই চলিল।

১৮

বাসার কাছাকাছি আসিয়া অমল দেখিল কে একজন তাহার ঘরের সম্মুখের সঙ্কীর্ণ রকে চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে একটু বিস্মিত হইল, অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে ঘরের কাছাকাছি আসিয়া দেখিল আগন্তুক আর কেহ নহে—ইন্দু স্বয়ং। আগের বারে যখন সে আসিয়াছিল ডবল চাবিটি এখানেই রাখিয়া গিয়াছিল, সুতরাং আর ঘরে ঢুকিয়া অপেক্ষা করা সম্ভব হয় নাই।

অমল বিস্মিত কণ্ঠে কহিল, আরে! আমি যে আপনারই শ্বশুরবাড়ি থেকে আসছি।

এবার বিস্মিত হইবার পালা ইন্দুর। সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া যেন ঈষৎ ভীত কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, আমার শ্বশুরবাড়ি, সে কি? তাঁরা কি বললেন? কার সঙ্গে দেখা হ'ল?

বলছি। বলিয়া অমল চাবী খুলিয়া আলো জ্বালিল, তাহার পর জামাটা খুলিয়া আনলায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া মুখে হাতে জল দিতে দিতে কহিল, দেখা আপনার খাস শ্বশুর মশায়ের সঙ্গেই হ'ল। আর, আর একজনের সঙ্গেও দেখা হ'ল বলতে হবে, তবে সে নেপথ্যে!

সে সমস্ত কথাই আনুপূর্বিক খুলিয়া বলিল। ইন্দু নিস্তব্ধভাবে বসিয়া সব কথা শুনিল, কিন্তু বহুক্ষণ পর্যন্ত কোন জবাব দিল না, তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, আমাদের আর আত্মহত্যা করা ছাড়া কোন উপায় নেই অমলদা, আর তাই-ই করতে হবে!

অমল যেন শিহরিয়া উঠিয়া তাহার দুইটা হাত চাপিয়া ধরিল, ছিঃ ওকি কথা ইন্দুবাবু, ওকথা মুখে উচ্চারণও করতে নেই।

ইন্দুর দুটি চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে কহিল, উচ্চারণ করতে নেই তা

-ত বুঝি, কিন্তু এমন করে বাঁচিই বা করে বলুন দেখি। দুঃখ ত নিজে পাচ্ছিই, আমার আসার জন্যও কতগুলো লোক অনর্থক দুঃখ পাচ্ছে!···আমার যে কী অবস্থা তা-ত শ্বশুর মশাই বুঝছেন না, ভাবছেন যে আমি তাঁর ওপর রাগ করেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু তা নয়, সত্য বলছি আপনাকে অমলদা, এ ক'দিন শুধু পাগলের মত পরিচিত অপরিচিত সমস্ত জায়গায় চাকরী খুঁজে বেড়িয়েছি। মামার আর্থিক অবস্থা যে কী তা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। তা ছাড়া শ্বশুরবাড়ি প'ড়ে থাকার গ্লানিই কি কম? যা হোক্ কিছু একটা পেলে বাঁচি—

অমল এই পাওয়ার আশাটা যে কতদূর তাহা জানিত। সে কহিল, এর ভেতর কি কোথাও কিছু ভরসা পেলেন?

ইন্দু জবাব দিল, ভরসা! আপনি কি ক্ষেপেছেন? এই বাজারে কেউ কাউকে ভরসা দেয়, বিশেষ করে আমার মত সহায়-সম্বলহীন লোককে?

তা বটে। অমল চুপ করিয়া রহিল। খানিকটা পরে ইন্দু কহিল, একটা ছোট রকম টিউশনীর আশা আছে, সেটা যদি পাই তাহলে ভাবছি এখানে এসেই থাকব।

এখানে এসে? অমল বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল, সে কী করে হবে? কমলা তাহ'লে থাকবে কোথায়?

হঠাৎ কমলার নামটা বাহির হইয়া গেল। ইন্দু লক্ষ্য করিল না, কিন্তু অমলের কানটা আপনা-আপনিই গরম হইয়া উঠিল।

ইন্দু কহিল, ও ওখানেই থাকবে। আমার মামার কাছে রাখাই উচিত, কিন্তু মামা কেমন মানুষ জানেন ত, আরও জড়িয়ে পড়বেন—

অমল সহসা ইন্দুর হাতটায় চাপ দিয়া কহিল, কিন্তু তিনি তাহ'লে বড্ড কষ্ট পাবেন!

বিস্মিত কণ্ঠে ইন্দু কহিল, কে, কমলা?···তা হয়ত পাবে; তবে সে খুব অবুঝ নয়, আমার কথা সে বুঝবে।

অমল আর কথা কহিতে পারিল না। এ সম্বন্ধেও আর কথা বলাও তাহার অনধিকার চর্চা তাহা বুঝিল, কিন্তু তবু মনটা তাহার কমলার জন্যই কেমন খারাপ হইয়া গেল।

ইন্দু প্রশ্ন করিল, আপনার এবেলা খাওয়া-দাওয়ার কী ব্যবস্থা ?

অমল কহিল, খাওয়া ? না, যা খাইয়েছেন আপনার শ্বশুরমশাই আর এবেলা কিছু খেতে হবে না—

কিন্তু কথা কহিতে কহিতেই তাহার নজরে পড়িল ইন্দুর মুখের অপরিসীম শুষ্কতা, সে ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিল, আপনি ক'টায় বেরিয়েছেন ?

আমি ? ইন্দু ম্লান হাসিয়া জবাব দিল, সে সেই বেলা এগারোটায় !

ইস্! তাই অত মুখ শুকনো। আপনি এক মিনিট বসুন, আমি আপনার জন্যে চট্ করে কিছু খাবার নিয়ে আসি—

ইন্দু বাধা দিয়া কহিল, কিচ্ছু দরকার নাই অমলদা, আমি এখনই ফিরে যাব।

কিন্তু ততক্ষণে অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কোঁচার খুঁটটা গায়ে টানিয়া দিয়া পকেট হইতে কয়েকটি পয়সা বাহির করিয়া একেবারে রাস্তায় নামিয়া পড়িল। সেখান হইতেই হাঁকিয়া বলিয়া গেল, এক মিনিট, আমি যাব আর আসব।

কিন্তু সদর রাস্তা হইতে খাবার কিনিয়া যেমন সে পুনরায় গলিতে ঢুকিবে মনে হইল পিছন হইতে কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া দেখিল একটা খোলা ফিটন গাড়ী হইতে সত্যই তাহাকে কে ডাকিতেছেন, আরও একটু কাছে গিয়া দেখিল বিভাসবাবু! প্রায় তেমনিই আছেন, হয়ত একটু বেশী বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, মাথার চুলগুলি প্রায় সবই সাদা হইয়া গিয়াছে —কিন্তু মুখের প্রশান্তি এতটুকু নষ্ট হয় নাই, তেমনিই প্রসন্ন হাসিমুখ—

অমল তাড়াতাড়ি গিয়া প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। তিনিও সস্নেহে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমার কথাই ভাবছিলুম কদিন ধরে, কিন্তু সত্যি- সত্যিই যে দেখা হবে এ আশা আর ছিল না। তোমার বাসা কোথায় ? খালি গায়ে যখন বেরিয়েছ তখন নিকটেই কোথাও বোধ হয় ?

অমল কহিল, হ্যাঁ, এই গলিটার মধ্যেই—

তিনি কহিলেন, তাহ'লে চল তোমার ওখানে গিয়েই কথাবার্তা কওয়া যাক্—

গাড়ী সেইখানেই রাখিয়া তিনি অমলের সহিত তাহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহারই অদ্বিতীয় বিছানাতে ইন্দুর পাশে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, এখানে তুমি একলাই থাক বুঝি ?···কী করছ এখন ?

অমল প্রতিমুহূর্তেই আশঙ্কা করিতেছিল যে বিভাসবাবু হয়ত দিল্লীর কথা তুলিবেন। কিন্তু তিনি খুব সম্ভব ইচ্ছা-পূর্বকই সে প্রসঙ্গ এড়াইয়া গেলেন। অমল খুশী হইয়া কহিল, অনেক দুঃখে একটা চাকরী পেয়েছি। মার্চেণ্ট অফিস —টাকা ত্রিশেক পাচ্ছি !

বিভাসবাবু হাসিয়া কহিলেন, তাহ'লে ত তুমি বড়লোক হে !···কিন্তু এ ছেলেটিকে চিনতে পারছি না ত !

অমল তাড়াতাড়ি ইন্দুর সহিত পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে বিভাসবাবু তাহার কাহিনীও প্রায় সবটা বাহির করিয়া লইলেন। এমনই তাঁহার সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠ যে কিছু গোপন করিতে ইচ্ছাই হয় না, তা ছাড়া তিনি শোনেন যতটা, অনুমান করিয়া লন তাহার চেয়ে অনেক বেশী—গোপন রাখা চলেও না।

সবটা শুনিবার পর অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বিভাসবাবু কহিলেন, সাহেব-সুবোর সঙ্গে আমার ঢের আলাপ আছে, তবে সাধারণত আমি কারুর চাকরীর কথা বলি না। কারণ একই লোকের কাছে অনেক রকম অনুগ্রহ চাইতে নেই, তাতে লোকে বিরক্ত হয়। কাজেই ওদিক দিয়ে কোন উপকার করতে পারব না। তবে ছোটখাট একটা অফার হয়ত দিতে পারি—

এই পর্যন্ত বলিয়া তিনি থামিলেন। অমল আর ইন্দু নিঃশ্বাস রোধ করিয়া আর একটু তাঁহার দিকে ঝুকিয়া বসিল। একটু পরে বিভাসবাবু প্রশ্ন করিলেন, বৌ লেখাপড়া কেমন জানে বাবা ?

ইন্দু বিস্মিত হইল, একটু লজ্জিতও হইল। অপ্রস্তুত ভাবে জবাব দিল, সে বিশেষ কিছু নয়।

বাঙলা অক্ষর পরিচয় আছে ত?

ইন্দু কহিল, হ্যাঁ, তা আছে। বাড়িতে কিছু কিছু পড়েছিল, ইংরেজী অক্ষরও চেনে। বোধ হয় নামতাও দু-একটা মুখস্থ আছে।

বিভাসবাবু জবাব দিলেন, ওতেই হবে। চেষ্টা করলে আর একটুখানি শিখিয়ে নিতে পারবে ত?

অপ্রতিভভাবে মাথা নীচু করিয়া ইন্দু জবাব দিল, তা পারবো বোধ হয়।

আরও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, আমার স্ত্রী ছিলেন ইস্কুলের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। তিনি মারা গেছেন, তাতে বড় অসুবিধায় পড়েছি।

এমন স্বাভাবিক কণ্ঠে তিনি কথাটা বলিলেন, বোধ হইল যেন স্কুলের সাধারণ কেরাণী কেহ মরিয়াছে। অমল বিস্মিত হইয়া কহিল, মারা গেছেন? কবে?

এই মাস তিনেক হ'ল। তার সঙ্গে ছেলেটাও। তাতেইত বিপদে পড়েছি।

মুহূর্ত কয়েক সকলেই চুপ চাপ। অমল একটু পরে প্রশ্ন করিল, তাহ'লে কি আপনি ওখানে একলাই আছেন?

সহজ কণ্ঠে বিভাসবাবু জবাব দিলেন, হ্যাঁ, তা বৈ কি!···হিন্দু ছেলেমেয়েরা কেউ ওখানে যেতেও চায় না, তা ছাড়া ছেলে দুইটি বেশ ভাল চাকরী করছে এখানে, ওখানে গিয়ে থাকাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাহার পর একবার গলাটা ঝাড়িয়া লইয়া বলিলেন, যাক্—যা বলছিলুম, ইস্কুলের কথা! এতদিন জন-দুই লোকাল মাষ্টার দিয়েই কাজ চালাচ্ছিলুম, তাদের গোটাদশেক করে মাত্র মাইনে দিলেই চলে যায়। দুজনেই বৃদ্ধ, কাজের বার, সুতরাং তার বেশী তারা আশাও করে না। কিন্তু এখন একজন লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর একজন হেড মাষ্টার না হলে চলছে না। আমি নিজে রেক্টর, হেড মাষ্টারের কাজ আমাকে দিয়ে চলবে না। ঐ দুটো অফার তোমাকে দিতে

পারি। তুমি যদি হেড মাষ্টার হও আর তোমার বৌ লেডী স্নুপারের কাজ করতে রাজী থাকে ত যেতে পার। বাড়ি অমনি পাবে, একটা ঝি আছে আমার, সে-ই কাজ কর্ম সব ক'রে দিতে পারবে। আর ফসল যা আমার বাগানে হয় তা তোমরা খেয়ে ফুরোতে পারবে না। চালও আমার চাষে কিছু হয়—তাতেই চলে যাবে। এ ছাড়া যা তোমাদের আমি ম্যাক্সিমাম দিতে পারি তা হচ্ছে কুড়ি টাকা আর পনের টাকা, মোট পঁয়ত্রিশ। অবশ্য তোমাদের দুজনকেই ষাট টাকার রসিদ সই করতে হবে! সাফ কথা বলে দিলুম, এখন তুমি যা ভেবে ঠিক করতে চাও করো—

ইন্দু ঝোঁকের মাথায় একেবারে বিভাসবাবুর হাতটা ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, নিশ্চয়ই যাবো, পেলে আমি বেঁচে যাই—!

অমলের চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল ইন্দুর শ্বশুরের মুখ, তাঁহার সেই অপরিসীম লজ্জা ও বেদনার ছবি! সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিল, অত তাড়াতাড়ি করছেন কেন, ভাল করে সব কথা ভেবে দেখুন আগে।

ইন্দু প্রবলবেগে ঘাড় নাড়িয়া কহিল, না অমলদা, ভেবে দেখবার আমার আর কিছু নেই! এ অবস্থার থেকে anything is better!···তা ছাড়া ইনি যা বলছেন তাতে আমাদের গোটা-পনের টাকা হলেই সব খরচা চলে যাবে। গোটা দশেক টাকাও যদি আমি মাসে মাসে মামাকে পাঠাতে পারি তাহ'লেও তাঁরা বেঁচে যান। আর দশটা টাকা করে জমাবো!

সামান্য একটু স্নেহ-মিশানো বিদ্রুপের সুরে বিভাসবাবু জবাব দিলেন, বাঃ, এই ত দিব্যি হিসেব হয়ে গেল। এ হিসেবটা অবিশ্যি তুমি মিছে ধরনি কিন্তু টাকা আনা পাইয়ের হিসেবটাই ত সব নয় বাবা! ভাল ক'রে ভেবে দেখো, স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করো, আত্মীয়-স্বজনকে জানাও, এরি মধ্যে মন ঠিক করবার কিছু দরকার নাই। আমি ক্যালকাটা হোটেলে আছি, তিন দিন থাকব। ছাপ্পান্ন নম্বর ঘর, এই তিন দিনের মধ্যে যে কোন দিন সকাল আটটার আগে গেলেই দেখা পাবে। বেশ ক'রে ভেবেচিন্তে জানিও—

ইন্দু কহিল, কিচ্ছু ভাববার নেই আমার। আমি যাবই। তাতে যার যা আপত্তি থাকে থাক— !

অমল কহিল, অন্তত আপনার স্ত্রীর মতটা ত নেওয়া দরকার !

ইন্দু জবাব দিল, তার অমত হবে না !

বিভাসবাবু একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, আমি এখন যাই। ভালো ক'রে ভেবে দেখো, আমি এখন জবাব নেবো না তোমার কাছ থেকে। তবে একটা কথা বলে রাখি, এখন ঝোঁকের মাথায় যাচ্ছো, এর পর শ্বশুরমশাই চাকরী ঠিক ক'রে ডেকে পাঠালেই যদি সেইদিন চলে এসো ত আমি বড্ড বিপদে পড়বো ! অন্তত কয়েক দিন আগে নোটিশ দিতে হবে—

ম্লান হাসিয়া ইন্দু কহিল, সে আশা সুদূরপরাহত।

দুজনেই বিভাসবাবুর সঙ্গে রাস্তায় বাহির হইয়া আসিল। অমল গলির মোড়ের কাছাকাছি আসিয়া প্রায় মরিয়া হইয়াই প্রশ্নটা করিয়া ফেলিল, কিন্তু—ঐ কি ওদের শেষ ভবিষ্যৎ, না আরও কিছু আশা-ভরসা আছে ?

বিভাসবাবু সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, গ্যাসের আলোতে মনে হইল যেন দৃষ্টি তাঁহার জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অমলের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া তিনি কহিলেন, আশা-ভরসা ভিক্ষে করা যায় না, এ জ্ঞান যদি আজও তোমার না হয়ে থাকে তাহ'লে বৃথাই তুমি পথে পথে ঘুরলে এতদিন অমল ! হয় অদৃষ্ট মানো, তাহ'লে ত কিছুতেই আপত্তি নেই, কারণ যদি ঐ কুড়িটাকাতেই ওর জীবন কেটে যায় তবে বুঝবে যে তাই ওর নিয়তি ; আর নইলে মানো পুরুষকার—তাতেও কোন অবস্থাতেই ভয় নেই। আমি মানি আশাভরসার পথ নিজেকে সৃষ্টি করে নিতে হয়, ওর রাস্তা বাঁধা নেই !......

তাহার পর ইন্দুর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি নিরেট পাষণ্ড, অর্থে আমার বড় মায়া। আমি যে সহজে কিছু দেব তা ভেবো না, তবে যদি আদায় করে নিতে পারো-ত অনেক কিছুই পাবে। সে তোমাদের-ক্ষমতা—

ইন্দু হেঁট হইয়া তাহার পদধূলি লইয়া কহিল, অদৃষ্টে আমার যা আছে তাই হবে, আমি যাইব।

বিভাসবাবু তখন গাড়ীতে উঠিতেছিলেন, জবাব দিলেন না। তবে অদ্ভুত এবং অতি ক্ষীণ একটা হাসির রেখা তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল মাত্র। গ্যাসের আলো তাহার মুখে চোখে আসিয়া পড়িয়াছিল, সে মুখের দিকে চাহিলে তাহার প্রসন্ন শান্তভাবে শ্রদ্ধা আসে; কিন্তু অস্ফুট বিদ্রূপময় দুর্জ্ঞেয় সে হাসির দিকে চাহিলে মনে মনে কেমন ভয়ও করে। অমল একটা ছোট দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। গাড়ী ততক্ষণে চলিতে শুরু করিয়াছে।

১৯

পরের মাসে মাহিনা হাতে পাইবার পরই অমল বড়বাবুকে ধরিয়া দিন-কয়েকের ছুটি লইয়া দেশে গেল। দেশ, কিন্তু কতকাল পরে! তাহার যেন কেমন লজ্জা বোধ করিতেছিল। চেনা লোকের সহিত দেখা হইলে কত রকম যে প্রশ্ন হইতে থাকিবে তাহার ঠিক নাই। সে সব প্রশ্ন হয়ত প্রশ্নকর্তাদের স্নেহেরই পরিচায়ক কিন্তু তাহার পক্ষে যেমন অপমানকর তেমনি কষ্টদায়ক। তাহার পর বাবা, তাহার সহিত প্রথম চোখো-চোখি হওয়ার কল্পনাতেও সে বার বার ঘামিয়া উঠিতেছিল। অথচ না গেলেও নয়। বহুদিন আগে কোন্ এক ইংরেজী উপন্যাসে এমনিই এক প্রডিগালের গৃহ প্রত্যাবর্তনের কাহিনী পড়িয়াছিল, সেই কথাটাই বারংবার তাহার মনে পড়িতে লাগিল।

দুশ্চিন্তা তাহার যতই থাক, স্টেশনে যখন ট্রেন পৌঁছিল তখন নামিয়া পড়িতেই হইল। ইহার পরও প্রায় দুই মাইল পথ তাহাকে হাঁটিতে হইবে এবং গ্রামের মধ্য দিয়াই। গাড়ী যে না পাওয়া যায় তা নয়, কিন্তু তাহাতে আরও সকলের তাকাইয়া দেখিবার সম্ভাবনা, এ বরং মাঠের পথ ধরিলে হয়ত বেশী

লোকের সহিত দেখা হইবে না। সে কোন মতে গোবিন্দর চায়ের দোকান এবং নিবারণের খাবারের দোকান পাশ কাটাইয়া মাঠের পথই ধরিল।

কলিকাতা হইতে আসিবার সময় সে বাবার জন্য খানিকটা ফৌজদারী বালাখানার তামাক সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—ছেলেবেলায় কে একবার শহর হইতে ঐ বস্তুটি আনিয়া দেয়, সেই সময়কার তাঁহার সেই আনন্দের চেহারাটি সে আজও ভোলে নাই—আর ছিল ছোট ভাই বোনেদের জন্য কিছু সন্দেশ। জিনিসগুলি একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া হাতে ঝুলাইয়া লইয়াছিল, নিজের খান-দুই কাপড় জামাও একটা খবরের কাগজ জড়ানো অবস্থায় সেই পুঁটিলির মধ্যেই পোরা ছিল, সুতরাং মালপত্রের বিশেষ কোন বোঝা হয় নাই। মালপত্র বেশী থাকিলেই লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আর তা ছাড়া কীই বা আছে তাহার?

বাড়ির মধ্যে যখন সে ঢুকিল তখন তাহার বুক গুর গুর করিতেছে। এ ভয় নয়, কিংবা দুঃখও নয়—এ যেন কি একটা স্নায়বিক দুর্বলতা, যাহার বর্ণনা দেওয়া চলে না। বাড়ি তাহাদের এমনই যথেষ্ট পুরাতন, এই কয় বৎসরে যেন আরও জীর্ণ হইয়া গিয়াছে। চতুর্দ্দিকেই শ্রীহীনতার চিহ্ন, তাহার মা যে আর নাই সে কথা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। তিনি যখন ছিলেন যতই তাঁহার শরীর খারাপ হউক, সমস্ত বাড়িটা পরিষ্কার করা একদিনও বাদ যায় নাই।

একেবারে কোলের ভাইটি উঠানে খেলা করিতেছিল, সে তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না, সহসা একটা অপরিচিত লোককে ভিতরের উঠানে প্রবেশ করিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল! বাবাও জুতার আওয়াজ পাইয়া তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইলেন।

কে?

অমলের কণ্ঠ দিয়া কোন উত্তরই বাহির হইল না, সে শুধু কাছে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তিনি চশমার মধ্য দিয়া বিস্মিতভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু তবুও চিনিতে পারিলেন না। অমল

বুঝিল যে তিনি চশমা সত্ত্বেও আর ভাল দেখিতে পান না, তখন সে কোন মতে গলা ঝাড়িয়া ডাকিল, বাবা!

অকস্মাৎ ভদ্রলোক তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। সে কান্নার মধ্যে কোন তিরস্কারের ভাষা ছিল না, শুধুই বুক ফাটা কান্না! এতদিনের বেদনা ও অভিমান সমস্ত বাধা ভাঙ্গিয়া যেন একসঙ্গে বাহির হইয়া আসিতে চাহিতেছে। অমল সান্ত্বনার কোন ভাষাই খুঁজিয়া পাইল না, অপরাধীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে হরনাথবাবুই প্রকৃতিস্থ হইলেন, অমলের মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, আর বার বার বলিতে লাগিলেন, তোর দেহে আর কিছু নেই বাবা, কলকাতায় বোধ হয় ভাল ক'রে তোর খাওয়াই হয় না!

বাহিরের পৃথিবী তাহাকে যত অপমান, নৈরাশ্য আর দুঃখের আঘাতে জর্জরিত করিয়াছিল, তাহার সব গ্লানিই যেন ঘুচিয়া গেল। একটি তিরস্কার নাই, একটি অভিমানের ভাষা নাই, শুধুই স্নেহ, অপরিসীম ভালবাসা! এই বস্তুটিরই লোভে বোধ হয় সমস্ত বাঙালী জাতি গৃহগত প্রাণ হইয়া পড়িয়াছে। বাহিরে তাহার কোথাও স্থান নাই।

ছোট ভাই-বোনরা ছুটিয়া আসিল। সেদিন স্কুল বন্ধ ছিল বলিয়া সকলেই বাড়ীর কাছাকাছি ছিল! ছোট বোনটিও তাহাকে সহজেই চিনিল, সে এবং বুড়ি আসিয়া প্রণাম করিল। কিন্তু অমল প্রথমটা কিছুতেই তাহাদের কাছে সহজ হইতে পারিল না, কী একটা অপরাধের দুর্নিবার লজ্জা যেন তাহার কণ্ঠরোধ করিয়া রাখিল। অনেকক্ষণ একথা-সেকথার পর লেখাপড়ার কথা তুলিতে তবু কথাবার্তার ধারা কতকটা স্বচ্ছন্দ হইয়া আসিল। দেখিল লেখাপড়া হইতে শুরু করিয়া তাহাদের খাওয়া-পরা সব বিষয়েই একটা শৈথিল্য আসিয়াছে, মাথার উপর নজর রাখিবার কোন লোক না থাকিলে যাহা হয়। মেজ ভাইটি দুপুরবেলা দোকান হইতে ফিরিয়া তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বসিল। তাহার মুখে বিঁড়ির গন্ধ, এই কয়দিনেই সে যেন দোকানদারের দলে মিশিয়া

গিয়াছে। অমল প্রাণপণে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস চাপিয়া লইল। ইহার জন্য দায়ী সে-ই। সে নিজের জীবনেও বড় কিছু করিতে পারিল না, অথচ মাঝখান হইতে দিল ইহাদের জীবনগুলি নষ্ট করিয়া। তখন হইতে যদি সে বাড়িতে থাকিয়া চাকরী করিত তাহা হইলে হয়ত ইহাদের লেখাপড়াটা হইত। সুগভীর আত্মগ্লানিতে তাহার বুকের ভিতরটা পুড়িয়া যাইতে লাগিল।

রাত্রে আহারাদির পর সে বাবার কাছেই শুইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া নানা কথা আলোচনা হইবার পর হরনাথবাবু একসময় বলিলেন, তাহ'লে এইবার তোর একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলি অমল! আর দেরী ক'রে লাভ নেই।

অমল চমকিয়া উঠিল। কহিল, বিয়ে? সে কি! ক'টাকা মাইনে পাই বাবা, তা আপনি ভুলে যাচ্ছেন?

হরনাথবাবু যে ম্লান হইয়া গেলেন তাহা অন্ধকারের মধ্যেই অমল অনুভব করিল। খানিকটা পরে তিনি কহিলেন, তা বটে, তবে এখানে আমাদের খরচা ত কম। তুই যা পারিস আর তার সঙ্গে খোকার টাকা ক'টা পেলে এক রকম ক'রে কুলিয়েই যাবে। গেরস্ত ঘরের মেয়ে আনলে কত আর খরচা বাড়বে, পেটে এক মুঠো খাবে বৈ ত নয়। অথচ এদিকেও যে আর ঘর দোরের দিকে চাওয়া যায় না। একটা লোক না হ'লে কি চলে?

কথা কয়টি যে খুবই সত্য তাহা এই দুই বেলাতেই অমল অনুভব করিয়াছে। হরনাথবাবু চোখে ভাল দেখেন না, কিন্তু তবু তাঁহাকেই রান্না করিতে হয়। বুড়ি যোগাড় দেয় মাত্র, উনানের কাছে যাইবার মত বয়স তাহার হয় নাই। লোক একটা চাই। ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া সে বাপ-মাকে ঢের কষ্ট দিয়াছে: মা ত চলিয়াই গিয়াছেন, বাপও মৃতপ্রায়, অথচ সে ভবিষ্যৎ ত—এই! মিছামিছি সকলকে আর বেশী কষ্ট দিয়া লাভ কি? যাহা হইবার হউক, সে আর কাহারও ইচ্ছায় বাধা দিবে না।

খুব মৃদুস্বরে সে বলিয়া ফেলিল, আপনি যা ভাল বোঝেন করুন!

তখন ভরসা পাইয়া হরনানবাবু আসল কথাটা ভাঙ্গিয়া বলিলেন, মেয়ে তিনি

ইতিমধ্যেই দেখিয়া রাখিয়াছেন। এই গাঁয়েরই মেয়ে, বেশ সুন্দরী এবং সেয়ানা। একেবারে আসিয়াই গৃহিণী হইতে পারিবে। অবশ্য অমল দেখিয়া পছন্দ না করিলে পাকা কথা দেওয়া যাইবে না তাহা তিনি বলিয়াই রাখিয়াছেন, তবে তাঁহার মনে হয় অমলের অপছন্দ হইবে না।······

আরও অনেক কথাই তিনি বলিয়া চলিলেন, কিন্তু অমলের কানে আর তাহার সবগুলি পৌঁছিল না। বিবাহের কথা মনে হইতেই তাহার মন চলিয়া গিয়াছিল ইন্দুর বিবাহের দিনটিতে। বন্ধু-বান্ধবের বিবাহে সে বিশেষ আর যোগ দিবার সুযোগ পায় নাই, ইন্দুর বিবাহই বোধ হয় একমাত্র।······এ মেয়েটি কেমন দেখিতে হইবে কে জানে, কমলার মত কি আর হইবে! কমলাকে অবশ্য সুন্দরী বলা যায় না, কিন্তু তবুও নিজের মনের মধ্যে বধূরূপ কল্পনা করিতে গেলে আগেই সেই চন্দন-লিপ্ত সুকুমার শ্যামল মুখখানিই মনে পড়ে, আর সেই স্বেদসিক্ত, কম্পিত হাত।··· তাহার কারণ বোধ হয় এই যে, আর কোন মেয়ের সহিত ওভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ সে পায় নাই—কিংবা, আর কিছু, কে জানে।

বিবাহ। ···উৎসব, শাঁক, বাঁশী, হাস্য-পরিহাস, লজ্জা-আনন্দের সেই উচ্ছল প্রবাহ। এ সম্ভাবনা যে কোন দিন তাহার জীবনে উপস্থিত হইবে তাহা সে ভাবে নাই। সমস্ত জীবনটাই যেন দুস্তর মরুভূমি হইয়া গিয়াছিল, তাহাতে চলিতে হয় শুধু অভ্যাস বশে, কিন্তু মনের মধ্যে চলিবার প্রেরণা থাকে না। আবার কোথা হইতে এই সুবিপুল সম্ভাবনা তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে কী পারিবে তাহার অতীতের সব গ্লানি দূর করিতে? আবার আশা-আকাঙ্খার প্রাসাদ কি তাহার গড়িয়া উঠিবে?

হরনাথবাবু ততক্ষণে ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু অমলের কিছুতেই ঘুম আসিল না। সে আস্তে আস্তে উঠিয়া বাহিরের দাওয়ায় আসিয়া বসিল। উঠানের বড় বেলগাছটার ফাঁক দিয়া যেখানে অস্তগামী চন্দ্রের এক টুক্‌রা আলো আসিয়া পডিয়াছে, সেইখানে মাটির উপরই বসিয়া পড়িল। বাল্যকালের কত কথা সঙ্গে

সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল। কত আশাই ছিল প্রাণে,—এম-এ পাশ করিয়া, ভাল চাকরী করিবে কিংবা ওকালতী। দেশের বাড়ী ভাঙ্গিয়া এইখানে গড়িয়া উঠিবে প্রাসাদ, বাবা-মা দেশেই থাকিবেন, সে ছুটির দিনগুলিতে মোটরে চড়িয়া দেশে আসিবে। তাহাকে অবশ্য কলিকাতাতেই থাকিতে হইবে, সেখানেও একটা বড় বাড়ি করিবে, কিন্তু তাই বলিয়া দেশের সঙ্গে সে সম্পর্ক লোপ করিবে না।······

কিন্তু সে সব কল্পনার কথা মনে পড়িলে এখন শুধু হাসিই পায়। সে আশার আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। আজ নিঃসংশয়ে সে বুঝিতে পারিয়াছে যে এই ত্রিশ টাকার চাকরীটা যদি বজায় থাকে তাহা হইলেই যথেষ্ট সৌভাগ্য মনে করিতে হইবে। এমন কি লটারীতে কিছু টাকা পাইয়া হঠাৎ কোন দিন যে বড়লোক হইতে পারে, সে কথাও সে ভাবে না। আশাও নাই, আশা ভঙ্গের দুঃখ অনুভব করিতেও সে ভুলিয়া গিয়াছে।

তাহার চেয়ে এই দরিদ্র গৃহস্থ-জীবনই ভাল। অভাব আছে কিন্তু সান্ত্বনাও আছে ঢের। আশা নাই কিন্তু শান্তি আছে। যে মেয়েটি আসিবে তাহার বধূরূপে, তাহার ভালবাসা ত আছে। অন্তত তাহার হৃদয়ে ত অমলই রাজা!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মন কল্পনার জাল বুনিতে শুরু করিল। একটি তন্বী কিশোরী —নাই-বা হইল সুন্দরী, কুৎসিৎ না হইলেই চলিবে—অমলেরই বুকের মধ্যে ধীরে ধীরে তাহার যৌবনের দলগুলি মেলিবে, তাহার অন্তরটি অমলেরই প্রেমের আলোতে বিকশিত হইতে থাকিবে একটু একটু করিয়া। বাহিরের সমস্ত আঘাত, সমস্ত বেদনা ভুলিবে সে সেই কিশোরীর স্নিগ্ধ প্রেমের মধ্যে আশ্রয় লাভ করিয়া। প্রতিদিনের সুখ-দুঃখ সেই সোনার কাটির স্পর্শে অমৃত হইয়া উঠিবে!

ভাবিতে ভাবিতে তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, বহুদিন আগেকার পড়া, রবি ঠাকুরের এক কবিতার দুটি লাইন—

—প্রাণের গভীর ক্ষুধা,
পাবে তার শেষ সুধা
ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালবাসা!

সেই ভাল। যদি সে সেই শেষ সুধাই পায় ত আর তাহার কোন ক্ষোভ নাই। ধন-মান সব কিছুরই শোক সে ভুলিতে রাজি আছে।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনের মধ্যে বহুদিনের শুষ্ক বনভূমির উপর দিয়া যেন এক ঝলক মিঠা দখিনা হাওয়া বহিয়া গেল। যে ডাল-পালাগুলি চিরকালই শুষ্ক, চিরকাল নিষ্ফলা, তাহারই প্রতিটি লোমকূপ যেন ভাবী সুখস্বপ্নে মঞ্জরিত হইয়া উঠিল।

সহসা তাহার চমক ভাঙ্গিল পাখীর ডাকে। ভোরের আর বিলম্ব নাই, পূর্বাকাশ ইতিমধ্যেই ফরসা হইয়া আসিয়াছে। ভোরাই হাওয়াও দিতে শুরু করিয়াছে। অমল যেন নিজের কাছেই নিজে লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল।

২০

পরের দিনই অমল নিজে গিয়া মেয়ে দেখিয়া আসিল। তাহার নিজের তত ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বাবা জোর করিয়া পাঠাইলেন। আজকালকার ছেলে, নিজে দেখাই ভাল, বিশেষ তিনি যখন চোখে ভাল দেখিতে পান না।

মেয়েটি মন্দ নয়। নাম পারুল, রংটা ফর্সার দিকেই, মুখ-চোখও খারাপ নয়। সুন্দরী না হইলেও আপত্তি করার মত কিছু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে, অমলের মনে হইল, যেন একটু সপ্রতিভ। যে বস্তুটি কমলাকেও তাহার চোখে সুশ্রী করিয়া তুলিয়াছিল সেই একান্ত লজ্জা-নম্র ভঙ্গুর ভাবটির বড় অভাব। কিন্তু সে কথা ত আর বাবাকে বলা চলে না; বাবাকে কেন, যে কোন লোককে বলিলেই সে হাসিয়া উড়াইয়া দিবে, সুতরাং তাহাকে বলিতেই হইল যে মেয়ে পছন্দ হইয়াছে।

ইহার পর হরিদাসবাবু মহা উৎসাহে কথাবার্তা চালাইতে শুরু করিলেন। পারুলের এক ভাই রেলে কাজ করে, অবশ্য সামান্য টাকা বেতনে, তবু পাত্র হিসাবে লোভনীয়। হরিদাসবাবু সুযোগ বুঝিয়া পারুলের বাপকে চাপিয়া ধরিলেন যে, তিনি

বিনা পয়সাতেই পারুলকে লইতে রাজী আছেন, যদি পারুলের বাবা তাঁহার বুড়ীকে গ্রহণ করেন। প্রথমটা পারুলের বাবা রাজী হন নাই, ছেলের বেশী মূল্য পাইবেন বোধ হয় এই আশাই ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হরিদাসবাবুর জেদই বজায় রহিল।

খবরটা শুনিয়া অমল আবাক হইয়া গেল। একবার বাবাকে কহিল, থাক না বাবা, এখনই বুড়ীর এমন কি বয়স হয়েছে?

কিন্তু হরিদাসবাবু যখন জবাব দিলেন, এমনি হয়ে যাচ্ছে, হয়ে যাক্। তুমি আর খোকা পারবে দু-দুটো বোনকে পার করতে? ঐ ত তোমাদের সামান্য আয়!

তখন তাহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল। হরিদাসবাবু বুঝাইয়া দিলেন, এ ভালই হ'ল। আমি কেষ্টবাবুকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে আমাদের যার যা কিছু দেয়, তত্ত্ব-তাবাস, কিছুই আমরা দেব না, শুধু নিয়মকর্ম করার মত করলেই হবে। উভয় পক্ষেরই তাতে সুবিধে।

অমল কহিল, কিন্তু ঘর খরচা ত আছে। তা ছাড়া একেবারে কাঁচের চুড়ি পরিয়ে ত আর মেয়েকে পাঠানো যাবে না!

হরিদসেবাবু জবাব দিলেন, না, তা যাবে না। তাঁরাও চুড়ি হার দেবেন, আমরাও তাই দেব কথা আছে। আর ঘরখরচাও শ' খানেক লাগবে অন্তত।

তাহার পর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি কহিলেন, কিছুই ছিল না তোমার মায়ের, শুধু গাছ কতক চুড়ি আর একটা বালা, তাই ভেঙ্গে যা হয় করে দেব। বাবুদের কাছ থেকেও হয়ত কিছু পাওয়া যাবে। একে ত পার করি, তার পর রইল পুঁটু তোমরা যা হয় ক'রো।

অমল চুপ করিয়া রহিল। কিন্তু এই দুই দিন তাহার মন যে বসন্তবাতাসে মাতামাতি করিতেছিল, অকস্মাৎ যেন তাহাকে হিম-শীতল বলিয়া বোধ হইল। বিবাহের সময় কিছু অর্থ সে হাতে পাইবে আশা ছিল, সামান্য কিছু উৎসব, দু-একটা দিন অন্তত আনন্দে কাটিবে মনে করিয়াছিল—কিন্তু সে সম্ভাবনা আর একেবারেই রহিল না। কোন মতে টানাটানি করিয়া নিয়ম রক্ষা করিতে হইবে! অথচ কীই বা বলিবার আছে। সত্যই, দুইটি বোনের বিবাহের ভার লইবে সে

কোন সাহসে ? তাহার চেয়ে এই ব্যবস্থাই ভাল···এইভাবেই সে মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল।

কিন্তু তবু দিন পাঁচ-ছয় পরে সে একটা আশা ভঙ্গের বেদনা লইয়াই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। বিবাহের দিন স্থির হইয়াছে আগামী মাসে, সুতরাং এখন আর দেশে থাকিবার প্রয়োজন নাই ; কথা রহিল, তখনই সে দিন-চারেকের ছুটি লইয়া কাজটা সারিয়া যাইবে।

বাসায় পৌঁছিয়াই ইন্দুর একখানা সুদীর্ঘ চিঠি হস্তগত হইল। দিন-তিনেক হইতে আসিয়া পড়িয়া আছে। সে ইতিমধ্যেই সস্ত্রীক বিভাসবাবুর দেশে চলিয়া গিয়াছে ; স্থানটি তাহাদের দুজনেরই পছন্দ হইয়াছে, কাজও এমন কিছু নয়— বাসা, লোকজন সব ব্যবস্থাই বিভাসবাবু করিয়া দিয়াছেন। সে সম্বন্ধে বহু উচ্ছ্বাস করিয়া শেষে লিখিয়াছে—

আমি নাকি হেড মাষ্টার আর আপনার কমলা লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, হেসে বাঁচি না। যাই হোক্—এ যেন বেঁচে গেলাম অমলদা, এখানে খরচা কিছুই নেই, যা পাব দুজনে, সব খরচা চালিয়েও মামাকে মাসে মাসে দশ বারো টাকা পাঠানো চলবে। তা ছাড়াও এখানকার পোষ্ট অফিসে মাসে মাসে দু-এক টাকা ক'রে জমাবো। বিভাসবাবু বলেছেন সামান্য কিছু জমলেই কিছু ধানজমি কিনে দেবেন। ব্যস্—তাহ'লে আর ভাবনা কি ?

ঠিক সেই ইন্দু! এতটুকু বদলায় নাই। সোনালী স্বপন সে দেখিবেই।

চিঠির শেষে লিখিয়াছে—

আসবার সময় শুধু শ্বশুর মশাইকে নিয়েই বিপদ বেধেছিল। তিনি এটাকে তাঁর প্রতি অপমান ব'লে ধ'রে নিয়ে গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলেন। কান্নাকাটি, সে ভয়ানক ব্যাপার। শেষে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে দিব্যি গেলেছি যে, তিনি চাকরী ক'রে দিতে পারলেই আবার ফিরে যাব। অবশ্য, আমার আর যাবার ইচ্ছেও নেই, আর তিনিও পারবেন কিছু করতে কি-না সন্দেহ !—তবু, তাঁর ঐতেই সান্ত্বনা।

চিঠির মধ্যে দুই লাইন কমলারও লেখা ছিল—

আপনি কেমন আছেন? ওঁর মুখে শুনলুম, আপনার দয়াতেই এখানকার কাজ পাওয়া গেছে, আমাকে ধন্যবাদ জানাতে বলছেন। কী ধন্যবাদ জানাবো বলুন?

আমাদের জীবন রক্ষা করলেন আপনি! সময় পেলে আসবেন একদিন। একটা রবিবার দেখে আসুন না! বেশ জায়গা, ভাল লাগবে খুব! নমস্কার নেবেন। ইতি—আপনার কমলা।

চিঠিখানা সে হাতে করিয়াই বসিয়া রহিল। যাক্—ইহারা বাসা বাঁধিতে পারিল শেষ পর্যন্ত! ভালই হউক আর মন্দই হউক, শেষের জন্য যাহাই তোলা থাক—এখনকার মত নিরাপদ বাসা ত পাইল। দুদিনের সুখ, এই যথেষ্ট। সে ঠেকিয়া শিখিয়াছে যে, তাহার অধিক আশা করিতে নাই।

সে কল্পনা নেত্রে দেখিতে লাগিল কমলা তাহার সেই নগণ্য এবং ক্ষুদ্র গৃহস্থালী পাতিতেই ব্যস্ত ভাবে ঘোরাঘুরি করিতেছে। তাহারই মধ্যে ইন্দুর জন্য সহস্র ছোট ছোট স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন চলিতেছে—সেই ঈষৎ লজ্জিত অথচ প্রসন্ন আনত মুখখানি সে চোখের সামনে পরিষ্কার দেখিতে পাইল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মনটা যেন কোন্ এক গোপন ঈর্ষায় কাঁটা দিয়া উঠিল।

পরক্ষণেই মনে পড়িল নিজের বিবাহের কথা। তাহার স্ত্রীও কি অমনি করিয়া তাহার সেবা ও তাহার স্বাচ্ছন্দ্যকেই জীবনের ব্রত করিয়া লইতে পারিবে? কে জানে। কমলার স্থানে সে যেন কিছুতেই পারুলকে কল্পনা করিতে পারে না।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ খেয়াল হইল যে অফিসের আর বেশী দেরী নাই। খাওয়া আর হইয়া উঠিল না, কোন মতে স্নান সারিয়া সে ডালহাউসী স্কোয়ারের দিকে দৌড় দিল। দেশে গিয়া প্রায় কপর্দকশূন্য হইয়া আসিয়াছে, এই ক'দিন চালানোই শক্ত, সুতরাং একদিন ট্রাম ভাড়া দেওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব।

যতদূর সম্ভব দ্রুত চলিতেছে, এমন সময় সহসা ছানাপটির মোড়ে পিছন

হইতে সজোরে কে জামাটা ধরিয়া টান্ দিল। এই আকস্মিক বাধায় বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া চাহিতেই একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। আরে এ যে কার্তিক বাবু!

কিন্তু এ কী অবস্থা। যৎপরোনাস্তি ময়লা একটা কাপড়, তাও বাঁ হাঁটুর কাছে অনেকখানিই ছেঁড়া, গায়ে একটা আরও জীর্ণ জীনের কোট, চক্ষু কোটরাগত, চুলগুলিতে জট পড়িয়াছে, কতদিন যে স্নান হয় নাই, বোধ হয় কল্পনাও করা যায় না!

—এ কী অবস্থা আপনার কার্তিক দা?

কার্তিকবাবু অকস্মাৎ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, কী ভায়া, চিনতে পেরেছ তা হ'লে? কোথায় যাচ্ছ? অফিসে? যাও যাও!···আমাকেও যেতে হবে এখুনি—

অমল প্রশ্ন করিল, কোথায় যেতে হবে?

কোথায়? কার্তিকবাবু যেন আকাশ হইতে পড়িলেন।—কোথায়? দাঁড়াও, নোট করা আছে ডায়েরীতে, দেখে নিই।

তাহার পর ব্যস্তভাবে ছেঁড়া পকেটের মধ্যে আঙ্গুল চালাইয়া দিয়া কহিলেন, ঐ যা, কোথায় পড়ে গেছে নোটবুকটা! আচ্ছা, যাও তুমি; আমি একবার লালবাজারে খোঁজ ক'রে আসি ডায়েরীটা পেয়েছে কিনা!

এ যে একেবারে উন্মাদ অবস্থা!···অমলের চোখে জল আসিয়া পড়িল। সে কোন মতে চোখের জল চাপিয়া কহিল, কার্তিকদা, আপনার শরীর মোটে ভাল নেই, দিনকতক দেশ থেকে ঘুরে আসুন। আর এখন একবার বাসায় যান—

কার্তিকবাবু আবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ভাবছ আমি পাগল হয়ে গেছি, না? তা তোমারই বা দোষ কি, সবাই ভাবছে। এখন টাকা হাতে নেই, সবাই পাগলই ভাববে। রোসো, টার্ফক্লাবের চেকখানা হাতে পাই আগে, আবার সবাই এসে পায়ে তেল দেবে—

বলিয়াই তিনি দ্রুতপদে ধর্মতলার দিকে হাঁটিতে শুরু করিলেন। অমলও কোঁচার খুঁটে চোখ মুছিয়া অফিসের দিকে চলিল। সময় থাকিলে সে জোর

করিয়া কার্তিকবাবুকে মেসে পৌছাইয়া দিয়া আসিত, কিন্তু এখন এমনিই দেরী হইয়া গেছে।···এই লোকটি একদিন তাহার কী যে উপকার করিয়াছিল, তাহা কোন দিন সে ভুলিতে পারিবে না—

কিন্তু খানিকটা চলিবার পরই আবার পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল কার্তিকবাবুই দৌড়াইতে দৌড়াইতে আসিতেছেন। কাছে আসিয়া চুপি চুপি ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন, ছ'টা টাকা দিতে পারিস্ ভাই, অনেকদিন মাঠে যাই নি; ঢোকার খরচ আর তিনটে টাকা টোট্—বেশী নয়! পারবি না?··· আচ্ছা থাক্—

বলিয়াই তিনি যেমনভাবেই আসিয়াছিলেন, তেমনিভাবে ছুটিতে ছুটিতে চলিয়া গেলেন।

অমল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে আবার অফিসের পথ ধরিল।

২১

অমলের বিবাহের দিন আসন্ন হইয়া আসিল। মধ্যে আর একটি রবিবার বাকী, তাহার পরের রবিবারেই বিবাহ। ইন্দুকে সে চিঠি লিখিয়াছিল, ইন্দু বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া জবাব দিয়াছে, কিন্তু সে বা কমলা আসিতে পারিবে না, সে কথাও জানাইয়াছে। কারণ বিভাসবাবুর নাকি ভীষণ বাত বাড়িয়াছে, এখানে দ্বিতীয় লোক নাই, ইস্কুল ছাড়িয়া যাওয়া অসম্ভব।

অর্থাৎ একমাত্র তাহার যে বন্ধু, যাহার আগমন সে একান্তমনে চায়, সে-ও তাহার বিবাহে উপস্থিত হইতে পারিবে না। বিবাহ সম্বন্ধে যত স্বপ্ন সে দেখিয়াছিল তাহার সবগুলিই ত প্রায় বাস্তবের রূঢ় আলোকে মিলাইতে বসিয়াছে, শেষটা কি হইবে কে জানে!···ক্রমশঃ তাহার উৎসাহ যেন কমিয়া আসিতেছে।

শনিবার সে এই কথাগুলিই ভাবিতে ভাবিতে অফিস হইতে বাহির হইতেছে

এমন সময় আর একটি পরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। লালবাজারের কাছাকাছি আসিয়া দেখিতে পাইল চীৎপুরের মোড়ের কাছে কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত-ভাবে দাঁড়াইয়া আছেন পাটনার ভুবনবাবু। সে তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই ভুবনবাবু একেবারে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন।—এই যে বাবা অমল। কেমন আছ, কি করছ আজকাল! তোমাকে দেখে বড় আনন্দ হ'ল। ইস্কুলে কাজকর্মের মধ্যে একটু ফাঁক পেলেই প্রায় তোমার কথা ভাবি। কি যে হ'ল, কেনই বা অমন হঠাৎ চ'লে এলে কিছুই বুঝতে পারলুম না, ওঁকে জিজ্ঞাসা করলেও উনি কোন জবাব দেন না, খালি ঘাড় নাড়েন।···তা কি করছ আজকাল?

কমল অফিসের নাম করিয়া কহিল, ঐখানে চাকরী করছি। আপনাদের সব খবর কি? কেথায় এসেছিলেন?

ভুবনবাবু কহিলেন, আমাদের খবর ত মোটের ওপর ভালই ছিল—হঠাৎ—হ্যাঁ, ভাল কথা, জ্যোৎস্নার এই গত বৈশাখে বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। জামাই বর্ধমানে থাকেন, সরকারী ডাক্তার। ওকে আর উনি কিছুতেই ইস্কুলে যেতে দিলেন না, কাজেই বিয়ের চেষ্টা দেখতে হ'ল। মেয়েদের এমনি বাড়িতে বড় ক'রে রেখে দেওয়া ভাল না। তা জামাইটিও বেশ মনের মত পেয়েছি—

কথা কহিতে কহিতে যেন খেই হারাইয়া ফেলিয়া ভুবনবাবু চুপ করিয়া গেলেন। তখন অমলই কহিল, কলকাতায় এসেছিলেন কি ওদের দেখতে?

হঠাৎ যেন আলো দেখিতে পাইয়া ভুবনবাবু কহিলেন, না, ঠিক ওদের দেখতে নয়, ইস্কুলের একটু কাজও ছিল। কতকগুলো সায়েন্টিফিক্ এপারেটাস্ দরকার কিনা—নিজে দেখে শুনে কেনাই ভাল, বুঝলে না, নইলে শুধু ক্যাটলগ দেখে অর্ডার দিলে বড় ঠকতে হয়। আমাদের ওখানকার অন্য সব হেডমাষ্টাররা তাই দেন বটে, কিন্তু আমি ও পছন্দ করি না।···হ্যাঁ, কি বলছিলুম, অর্ডার দেওয়া আমার হয়ে গেছে, যাবার সময় একবার বর্ধমানে নেমে মেয়েটাকে দেখে যাব সেই ইচ্ছেই ছিল। সেই জন্যে একঘর বাজারও ক'রে ফেলেছি এমন সময় দেখ না এই বিপত্তি!

উদ্বিগ্নভাবে অমল কহিল, কী হয়েছে? কোন অসুখ-বিসুখ—

ভুবনবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, না না, অসুখ-বিসুখ কেন হবে। ইস্কুল থেকে আমাদের জয়েণ্ট হেডমাষ্টার মশাই তার করেছেন যে ক্লাস টেনের একটি ছেলের সঙ্গে আমাদের পণ্ডিত মশাই-এর নাকি মারামারি হ'য়ে গেছে।···ছি, ছি, দেখ দেখি বাবা কি কেলেঙ্কারী। এর পরে পাটনায় আমি কি ক'রে মুখ দেখাব বল দেখি। আমার স্কুলে কখনও ত এ-রকম হয় না।···আমি যেন লজ্জায় মরে যাচ্ছি!

নিশ্চিন্ত হইয়া অমল কহিল, ও ইস্কুলের কাজ! তা সে-ত আপনার সোমবার পৌছুলেই হবে। আপনি আজ বর্ধমানে নেমে কাল সকালেও ত রওনা হ'তে পারেন।

ভুবনবাবু কহিলেন, সোমবার পৌছব? কি বলছ তুমি! আমাকে এই মুহূর্তে যেতে হবে। সে ছেলের গার্জেনের সঙ্গে দেখা ক'রে, পণ্ডিতকে ডাকিয়ে কাল সকালের মধ্যে এর একটা হেস্তনেস্ত না করলে চলে কখনও? কালকের মধ্যে ষ্টেটমেণ্ট তৈরী ক'রে টাইপ করিয়ে মেম্বারদের কাছে পাঠাতে হবে না? ছেলেটাকে দিয়ে এ্যাপলজি করাতে হবে, পণ্ডিতের ষ্টেটমেণ্ট চাই, ওদের আণ্ডারটেকিং চাই—এর ঝামেলা কি কম!···কত বড় দায়িত্ব আমার মাথার ওপর তা ভুলে যাচ্ছ? সোমবারের আগে আমাকে ক্লীন হ'তে হবে যে!

তা বটে! অমল বুঝিল যে একটি কেন, শত কন্যার আকর্ষণও আর তাঁহাকে ইস্কুল হইতে দূরে রাখিতে পারিবে না। সে অপরাধীর মত মাথা হেঁট করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, তা বাজার-হাটগুলো কি করবেন? সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন?

তাই ত ভাবছি! সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাওয়া বড্ড ঝঞ্ঝাট, তা ছাড়া মেয়েটার জন্যে কিনলুম—

অকস্মাৎ তাঁহার চোখ-মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অমলের হাত দুইটা ধরিয়া কহিলেন, একটা উপায় আছে বাবা, যদি তুমি রাজী হও! তোমার ত

আজ শনিবার, একবার যদি বর্ধমানটা ঘুরে আসতে পার ত আমার বড্ড উপকার হয়!

কী সর্বনাশ!

অমল ঘামিয়া উঠিল। জ্যোৎস্নার সহিত সাক্ষাৎ করা! সে যে তাহার পক্ষে অসম্ভব! অথচ সে কথা ভুবনবাবুকে বলাই বা যায় কি করিয়া!...

এ ধারে যে লোকটি একদিন তাহাকে নিরন্ন অবস্থায় আশ্রয় দিয়া আদর-যত্নেই রাখিয়াছিল তাহার বিশেষ উপকার হয় জানিয়াও চুপ করিয়া থাকা যায় না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া সে এমনই বিহ্বল হইয়া গেল যে পাশ কাটাইবার মত একটা কৈফিয়তও খুঁজিয়া পাইল না।

ভুবনবাবু অবশ্য তাহাকে বিশেষ অবসরও দিলেন না, তাহার হাতটা ধরিয়া টানিতে টানিতে কহিলেন, তাহ'লে সেই কথাই ভাল। চল একটা ট্যাক্সি নিই, আমার হোটেল থেকে মালপত্রগুলো তুলে নিয়ে এই চারটের এক্সপ্রেসেই রওনা দিই। কেমন?...তোমার বাসায় কেউ আছেন না কি, খবর দিতে হবে?

অমল শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, না। তাহার পর কতকটা মন্ত্রমুগ্ধের মতই ভুবনবাবুর পিছু পিছু ট্যাক্সিতে চড়িল, তাঁহার হোটেলে গিয়া তদ্বির করিয়া মালপত্র নামাইল, এবং সেই গাড়ীতেই শেষ পর্যন্ত হাওড়া ষ্টেশনেও পৌছিল; কিন্তু ভুবনবাবু এমনই প্রবলভাবে তাহার সম্মতিকে অনুমান করিয়া লইলেন যে সে এই সমস্ত সময়টার মধ্যে একবারও তাঁহাকে কথাটা জানাইবার অবকাশ পাইল না যে জ্যোৎস্নার কাছে যাওয়া তাহার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া ঘটনাগুলি এতই দ্রুত ঘটিয়া গেল যে ইহার মধ্যে সে একটা ভাল রকম কৈফিয়ৎও খুঁজিয়া পাইল না।

একেবারে ট্রেনে বসিয়া সে হাঁফ ছাড়িল। অবশ্য ভুবনবাবু তখনও তাহাকে বিশেষ কিছু বলিবার মত ফাঁক দিলেন না, নিজেই অনর্গল স্কুলের কথা গল্প করিয়া যাইতে লাগিলেন। তবে সে দিকে বিশেষ কান না দিয়া ব্যাপারটা একটু ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাইল বটে। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া শেষকালে যখন বর্ধমানের

কাছাকাছি গাড়ী আসিয়া পড়িয়াছে, তখন সে স্থির করিয়া ফেলিল যে দূর হইতে কুলীকে বাড়ীটা দেখাইয়া দিয়া কুলীটা বাড়ীতে ঢুকিয়াছে দেখিয়াই সে সরিয়া পড়িবে, জ্যোৎস্নার সহিত দেখা করিবে না। ভুবনবাবুর চিঠিখানা সে কুলীর হাতেই দিয়া দিবে—সুতরাং জ্যোৎস্নার বুঝিতে কিছুই অসুবিধা হইবে না।

এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়া এতক্ষণে সে একটু সুস্থ হইল এবং বর্ধমানে গাড়ী পৌঁছিতে বেশ প্রফুল্ল মুখেই ভুবনবাবুকে প্রণাম করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। তাহার পর মুটের মাথায় মাল চাপাইয়া সে ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়াই চলিল, ভুবনবাবু বাসার ঠিকানা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, বাসা কাছেই—খুঁজিয়া বাহির করিতেও দেরী হইল না।

তখন সন্ধ্যার বড় বেশী দেরী নাই, আলো ঝাপ্‌সা হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং সে সাহস করিয়া কাছে গিয়া কুলীকে বাড়িটা দেখাইয়া দিল এবং কি কি বলিবে সে, সে সম্বন্ধে ভাল রকম নির্দেশ দিয়া আবার ষ্টেশনের রাস্তা ধরিল। দূর হইতে শুধু চাহিয়া দেখিল যে কুলীটা বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেছে।

কিন্তু একটু পরেই পিছন হইতে ডাক শুনিয়া ফিরিতে হইল, দেখিল একটি ভদ্রলোক তাহাকেই ডাকিতে ডাকিতে ছুটিয়াছেন।

'মাষ্টার মশাই! মাষ্টার মশাই!'

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড তখন জন-বিরল, সুতরাং সে 'মাষ্টার মশাই', যে অমলই, সে বিষয়ে সংশয়মাত্র রহিল না। সে দাঁড়াইয়া গেল—এবং ঘামিয়া উঠিল। একটু পরেই ভদ্রলোকটি হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বেশ সুশ্রী চেহারা, ঈষৎ স্থূল, বয়শ ত্রিশের কাছেই। অমল অনুমানে বুঝিল যে, ইনিই ভুবনবাবুর ডাক্তার জামাতা।

ডাক্তারবাবু ঠাণ্ডাতেও ঘামিয়া উঠিয়াছিলেন, ঘাম মুছিতে মুছিতে এবং দম লইবার বৃথা চেষ্টা করিতে করিতে কহিলেন, বা বেশ লোক ত আপনি! কুলীর হাতে মালগুলো পাঠিয়ে দিয়ে চুপিচুপি স'রে পড়ছিলেন! চলুন, চলুন—

অমল একটা ঢোঁক গিলিয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, এই জন্মে আপনি ছুটতে ছুটতে এলেন ?

না এসে কি করি বলুন! যা কাণ্ড আপনার। আমি না ছুটলে আপনার ছাত্রীই ছুট্‌ত। সে জানালা দিয়ে আগেই আপনাকে দেখতে পেয়েছিল—

এই ঝাপ্‌সা আলোতেও সে চিনতে পারলে আমাকে ? অমল প্রশ্ন করিল।

ডাক্তার সগর্বে জবাব দিলেন, পারবে না। ভারী সাফ্‌ চোখ মশাই! কিচ্ছুটি নজর এড়াবার জো নেই—

অগত্যা অমলকে ফিরিতে হইল। চলিতে চলিতে ডাক্তারবাবু কহিলেন, বলতে নেই মশাই, কিন্তু ছাত্রী আপনার চৌখস্‌ একেবারে! বয়স ত বেশী নয়, কিন্তু একলা এখানে এসে আছে, সমস্ত সংসার ওর হাতে, একেবারে পাকা গিন্নীর মত চারিদিকে নজর রেখে চালায়। আমাকে মশাই কিচ্ছুটি ভাবতে হয় না, শুধু টাকাটা এনেই খালাস—

বলিয়া অকস্মাৎ কি কারণে হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

অমল কহিল, এখানে আপনি একলাই থাকেন বুঝি ?

ডাক্তার জবাব দিলেন হ্যাঁ, কি করি বলুন, আমার আবার বদ্‌লীর চাকরী বাবা-মা বুড়োমানুষ, ওঁদের ঘোরাঘুরি করে পোষায় না। তাছাড়া ছোট ভাইদেরও পড়াশুনোর অসুবিধে হয়। তাঁরা দেশেই থাকেন। তা মশাই, শুনলে অবাক হয়ে যাবেন, আমাদের দেশের অত পাজী লোক ত, কিন্তু যেকদিন ও শ্বশুর-ঘর করেছে তাহাতেই সবাই ধন্যি-ধন্যি! বলতে নেই, স্ত্রীভাগ্যি আমার ভালই! হা-হা-হা!

ভদ্রলোক পত্নীগর্বের উল্লাসে যত স্ফীত হইয়া উঠিতেছিলেন অমল ততই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িতেছিল—তাহার দুই কান আগুন হইয়া উঠিতেছিল, যত লজ্জা যেন তাহারই। ঠাণ্ডার দিনেও তাহার ভিতরের গেঞ্জি ঘামে ভিজিয়া সপ্‌সপে হইয়া উঠিল।

বেশী দূর সে যাইতে পারে নাই, সুতরাং শীঘ্রই বাসার কাছে আসিয়া পড়িল। ডাক্তার গলা খাটো করিয়া কহিলেন, আপনি এলেন একরকম ভালই হ'ল, বুঝলেন

মাষ্টার মশাই! কেন না ভালমন্দ কিছু রান্না হবে।…হা-হা-হা! বলতে নেই মশাই, রাঁধে যা, এতখানি বয়সে আমি অমন চমৎকার রান্না খাইনি। আপনিও খাবেন ত, খেয়ে বলতে হবে যে ডাক্তার যা বলছিল তা ঠিক!

ততক্ষণে তাহারা বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। জ্যোৎস্না দ্বারের কাছেই অপেক্ষা করিতেছিল, ভিতরে পা দিতেই সে মাথার কাপড়টা আর একটু টানিয়া দিয়া হেঁট হইয়া প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল। তাহার পর ঈষৎ নীচু গলায় অনুযোগের সুরে বলিল, ছি, ছি, কী লোক আপনি বলুন ত! অমন ক'রে চুপি চুপি পালিয়ে যাচ্ছিলেন যে বড়!…ভাগ্যিস্ আপনাকে ধরতে পারলে—

কিন্তু অমলের সেদিকে কান ছিল না। সে অবাক্ হইয়া, এমন কি বোধ হয় একটু অভদ্রভাবেই, জ্যোৎস্নারই দিকে চাহিয়াছিল! মাত্র বছর-দুই আগে সে যাহাকে দেখিয়া আসিয়াছিল তাহার কি কোন চিহ্নই নাই! এ যেন সম্পূর্ণ নূতন মানুষ। যৌবন কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে, সুতরাং তাহাকে যে অধিকতর সুশ্রী দেখাইবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই, কিন্তু বিস্মিত হইল সে আরও অন্য কারণে। কোথায় গেল তাহার উগ্র ঔদ্ধত্য, কোথায় বা গেল তাহার চাপল্য, এমন একটি সুকুমার সলজ্জ ভাব তাহার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া বিরাজ করিতেছে যে, সেই কল্যাণী মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া অমল চোখের নিমিষে মুগ্ধ না হইয়া পারিল না। ডাক্তারবাবু সত্যই বলিয়াছিলেন, যেন কোন্ সোনার কাঠির স্পর্শে রাতারাতি সে বালিকা হইতে নারীতে রূপান্তরিত হইয়াছে, প্রেয়সী হইবারও পূর্বে সে গৃহিণী হইয়া উঠিয়াছে। এই যে কমণীয় শ্রী, এ ত পরিপূর্ণ রমণীত্বেরই আভাস দিতেছে।

বোধ করি তাহার মুগ্ধনেত্রের দিকে চাহিয়াই জ্যোৎস্না সহসা লাল হইয়া উঠিল, কিন্তু সে মুহূর্ত মাত্র। পরক্ষণেই নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইয়া কহিল, আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।…কী কাণ্ড!

বাড়িটা ছোট এবং একতলা। কতকটা বাংলোর মতন। ভিতরের বারান্দায় দুই-তিনটা বড় বড় বেতের চেয়ার পাতা ছিল, সেইগুলি দেখাইয়া সে তেমনি চাপা গলাতেই কহিল, বসুন ঐখানে লক্ষ্মীছেলের মত, আমি হাত-পা

"ধোবার জল আনছি। চায়ের জল চাপানো আছে, সে বোধ হয় এতক্ষণ ফুটে ফুটে মরে গেল—

সে ত্বরিত-লঘু গতিতে নামিয়া গেল। সেই দিকে চাহিয়া প্রদীপ্তমুখে ডাক্তার কহিলেন, দেখছেন ত, মাষ্টার মশাই, আপনার সে ছোট্ট ছাত্রীটি আর নেই—পাকা গিন্নী হ'য়ে গেছ একেবারে। বলতে নেই মশাই, আদর অভ্যর্থনা-লৌকিকতায় কোথাও এককোঁটা খুঁত পাবেন না।

একজন ঝি উঠানের কোণে কলতলায় বসিয়া কি কাজ করিতেছিল, সে তাড়াতাড়ি গাড়ু ও গামছা লইয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু জ্যোৎস্না তাহার হাত হইতে গাড়ুটা কাড়িয়া লইয়া কহিল, তুই যা, আলোগুলো সব জেলে দিয়ে চৌকাঠে জলটা দিয়ে দে। আর অমনি শাঁখটা বাজিয়ে দিস; আমার আজ আর সময় হবে না।

সে গাড়ুটা ও গামছাটা বারান্দার ধারে নামাইয়া কহিল, ও হরি এখনও বুঝি জুতোই খোলা হয় নি—

বলিয়াই বিদ্যুৎবেগে—অমল ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝিবার কিম্বা বাধা দিবার পূর্বেই,—হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া জুতার ফিতা খুলিতে শুরু করিয়া দিল। অমল বিষম বিব্রত হইয়া বাধা দিতে গেল, কিন্তু বাধা দেওয়াও মুস্কিল। স্বামীর সামনে পরস্ত্রীর হাত ধরিয়া টানাটানি করা সঙ্গত হইবে কি না ভাবিয়া না পাইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া নিজের পা-টাই চাপিয়া ধরিতে গিয়া জ্যোৎস্নার সহিত গেল সজোরে মাথাটা ঠুকিয়া।

জ্যোৎস্না তিরস্কারের সুরে অথচ তেমনি চাপা গলাতেই কহিল, কেন মিছিমিছি ছেলেমানুষি করছেন বলুনত ত, চুপ ক'রে ব'সে থাকুন। দিলেন ত আমার মাথাটা ঠুকে, তারপর শিঙ্ বেরোক্ আর-কি!

অগত্যা অমলকে হার মানিতে হইল। ডাক্তারবাবু পরমপুলকিত হইয়া কহিলেন, কেমন মশাই, জব্দ করেছে ত! হার মানতেই হবে, ও আমি জানতুম। তার চেয়ে চেপে যান মশাই, যা বলে শুনে যান্—

জ্যোৎস্না কোপ-কটাক্ষে স্বামীর দিকে চাহিয়া কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, ঢের

হয়েছে। এখন আর এক কাপ চা খেয়ে চট্ ক'রে একটু মাংস কিনে আন দিকি, আর ভাল মিহিদানার অর্ডার দিয়ে এস। 'খাস্-খাস্' তৈরি ক'রে দেয় যেন—

জুতা খোলা হইলে সে গাড়ুটা লইয়া আসিয়া সেইখানেই অমলের পা ধোয়াইয়া দিল, তাহার পর কপালে ঘাড়ে জল-হাত বুলাইয়া দিয়া গামছা করিয়া মুখ হাত পা পর্য্যন্ত মুছাইয়া দিল। অমল বাধা দিতে পারিল না, মনের সঙ্কোচও তাহার যেন কতকটা কমিয়া আসিয়াছিল জ্যোৎস্নার এই মূর্তি দেখিয়া, সুতরাং সে বাধা দিবার আর চেষ্টাও করিল না।

ঘরের ভিতর হইতে স্বামীরই একটি ধোয়া গেঞ্জি আনিয়া অমলের হাতে দিয়া কহিল, যে রকম ঘেমেছেন, নিশ্চয়ই গেঞ্জি ভিজে গেছে, ভিজে জামা এখনকার দিনে প'রে থাকলে অসুখ করবে। জামাটা খুলে ওটা ছেড়ে ফেলুন, ততক্ষণ আমি জলখাবার নিয়ে আসি—

এই বলিয়া সে রান্না ঘরের দিকে চলিয়া গেল। ডাক্তার পত্নীগর্বে স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলিয়া অমলের পাঁজরায় একটা খোঁচা দিয়া কহিল, দেখছেন কী সাফ চোখ! নজরে কিচ্ছুটি এড়াবার জো নেই! বেশ আছি দাদা, বুঝলেন, বলতে নেই, আমি নিজের সম্বন্ধে কিছু ভাবিই না, যা করবার আপনার ঐ ছাত্রীই করে।

ঝি সন্ধ্যা দিয়া বোধ হয় জ্যোৎস্নারই নির্দেশ মত ছোট একটা টিপয় সামনে রাখিয়া গেল। একটু পরেই জ্যোৎস্না নিজে একটা ট্রেতে করিয়া দুই ডিস খাবার ও দুই কাপ চা লইয়া আসিয়া পরিপাটি করিয়া সামনে সাজাইয়া দিল। লুচি, হালুয়া, রসগোল্লা, আলু ভাজা, নিম্‌কি, আরও কত কি—

ডাক্তার প্রথমেই একটা আস্ত রসগোল্লা মুখে পুরিয়া কহিলেন, সব ঘরে তৈরি মশাই! একটিও বাজারের নয়।

বিস্মিত হইয়া অমল কহিল, কিন্তু এ সব কি যাদু মন্ত্রে হ'ল নাকি?

হা হা করিয়া ডাক্তার হাসিয়া উঠিলেন কিন্তু জবাব দিলেন না। জ্যোৎস্না ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, কী আদিখ্যেতা করো!···মন্তরে হবে কেন, উনিও যে

এই এলেন। জলখাবার তৈরিই ছিল। আর রসগোল্লাত আপনিই নিয়ে এলেন!

সে অমলের ভিজা গেঞ্জিটা লইয়া কলঘরে চলিয়া গেল এবং কাচিয়া আনিয়া দালানের আলনাতে শুকাইতে দিয়া কহিল, তুমি চট্ করে বাজারটা ঘুরে এস, আবার যেন কোথাও গল্প করতে ব'স না।···আর আপনি জল খেয়ে নিয়ে আসুন ঐ রান্নাঘরের সামনে বসবেন, আমি কাজ করতে করতে বাবার গল্প শুনব।

ডাক্তার আদেশ পাইবা-মাত্র তাড়াতাড়ি চা শেষ করিয়া বাজারের দিকে ছুটিলেন। একটা চাকরও আছে, সে বোধ হয় বাহিরে কোথাও আড্ডা দিতেছিল, এখন গৃহিণীর ধমক খাইয়া ব্যস্ত হইয়া ঝাড়ন লইয়া বাবুর সহিত বাজারে ছুটিল। আর অমলও জলযোগ শেষ করিয়া শেষ রান্নাঘরের সম্মুখের দাওয়ায় একটা বেতের মোড়াতে গিয়া বসিল।

২২

ঝি ওধারে কাজে ব্যস্ত রান্নাঘরের মধ্যে জ্যোৎস্না এবং বাহিরে সে। নির্জনে দেখা তাহাদের এই প্রথম! কিসের একটা সঙ্কোচে অমল আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। তাহার বুকও যেন একটু একটু কাঁপিতে লাগিল।

জ্যোৎস্না ভিতর হইতে তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বোধ হয় তাহার অবস্থাটা অনুমান করিতে পারিল, সে তাড়াতাড়ি কতকটা সহজ হইবার জন্য কহিল, তারপর, বাবার সঙ্গে কোথায় দেখা হ'ল?

অমল আনুপূর্বিক সমস্ত খুলিয়া বলিল। কথা কহিতে কহিতে সত্যই সে ক্রমে সুস্থ হইয়া উঠিল। সঙ্কোচ এবং সেই অজ্ঞাত ভয়, দুটাই কাটিয়া গেল।

জ্যোৎস্না হাসিয়া কহিল, বাবাকে ত চেনেনই। চিরকালই ওঁর ঐ একরকম গেল। ইস্কুল আর ইস্কুল। ইস্কুলের কাজে ওঁর ছেলেমেয়ে কেউ নেই। আপনার

সঙ্গে দেখা হ'ল তাই, নইলে জিনিসপত্রগুলো ফেলে দিতেন সেও ভাল, তবু এখানে নামবার কথা ভাবতেও পারতেন না।

ইহার পর উভয়েই কিছুক্ষণ চুপচাপ। জ্যোৎস্না হেঁট হইয়া কি একটা রান্না চাপাইতেছিল, মিনিট কয়েক কথা কহিবার অবসরই পাইল না। অমলও বেতের মোড়াটার উপর নড়িয়া-চড়িয়া বসিল। কিন্তু উঠিয়া যাইবে কি না ঠিক বুঝিতে পারিল না। উঠিয়াই বা কোথায় যাইবে! অগত্যা বসিয়াই রহিল।

রান্নাঘরের দাওয়ায়, ছাদে, ওধারের গা আলমারীটায় চোখ ঘুরিয়া ঘুরিয়া আবার একসময় জ্যোৎস্নার দিকেই ফিরিয়া আসিল। তখন উনানে গন্‌গনে আঁচ, তাহারই একটা জোর আভা আসিয়া পড়িয়াছে জ্যোৎস্নার মুখে। সেই লাল আলোতে জ্যোৎস্নার আতপ্ত মুখের যতটুকু দেখা গেল সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া অমল যেন অকস্মাৎ মুগ্ধ হইয়া গেল। নাক, চোখ, ওষ্ঠ, কপোল যতটা তাহার দিকে ফেরা ছিল সবগুলিই যেন অত্যন্ত সুকুমার এবং সুশ্রী। সুন্দর ললাটের সমস্তটাই ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত জড়াইয়া কয়েকটি অবাধ্য চুল, আর তাহারই মধ্যে রক্তবিন্দুর মত শোভা পাইতেছে একটি ছোট্ট সিন্দুরের টিপ— সবটা জড়াইয়া তাহার চোখে কেমন একটা মোহের সৃষ্টি করিল।...সুগোল, যৌবনপুষ্ট শুভ্র হাতখানা ব্যস্ত হইয়া নড়িতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আগুনের আভা ও বিদ্যুতের আলো ছুটাছুটি করিয়া যেন সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিয়াছে। জ্যোৎস্না যে সুন্দরী, সত্যকার রূপসী, তাহা এই সে প্রথম সহসা উপলব্ধি করিল!

অথচ একদিন, একদিন কেন বোধ হয় আজিকার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত, এই মেয়েটিকে সে বরাবর অবহেলাই করিয়া আসিয়াছে। তাহার স্বভাবকে ত সে ঘৃণ্য করিয়াছেই, রূপটার কথা কোনদিন চিন্তা পর্যন্ত করিয়া দেখে নাই। অথচ আজ সেই মেয়েটিই তাহার রূপে ও ব্যবহারে এমন মোহের সৃষ্টি করিল কেমন করিয়া। এ কি শুধু বিবাহেরই ফল? বিবাহের পরে কি এম্‌নি করিয়া সব মেয়েরাই বদ্‌লাইয়া যায়? একি সেই বৈদিক যাদুমন্ত্রেরই প্রভাব, না পুরুষের বাসনার সোণার কাঠির স্পর্শ!

মিনিট কয়েক পরে কড়ায় জল ঢালিয়া জ্যোৎস্না অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত হইয়া ফিরিতেই অমলের মুগ্ধ দৃষ্টির দিকে চোখ পড়ায় আরও লাল হইয়া উঠিল। বাঁ হাতে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিয়া অকারণে আবার কড়া-খুন্তী লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল! তাহার পর কণ্ঠস্বরকে প্রাণপণ চেষ্টায় সহজ করিয়া লইয়া কহিল, আপনি এখন কি করেন মাষ্টার মশাই? কিছু মনে করবেন না, চিঠিতে বাবা আপনাকে নিয়ে খুব উচ্ছ্বাস করেছেন বটে কিন্তু কাজের কথা কিছুই লেখেন নি!

অমল আগেই লজ্জিত হইয়া চোখ নামাইয়া ছিল। এখন কথা কহিতে গিয়া যেন গলাটাও কাঁপিয়া গেল। সে সেইভাবেই জবাব দিল, তার কারণ যে তিনি আমার সম্বন্ধে নিজেই বিশেষ কিছু জানেন না। জিগ্যেস করবার সময় কোথায় পেলেন বলো?

তাহার পর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, আমি অনেক চেষ্টায় এই মাস কতক হ'ল একটা বিলিতি অফিসে চাকরী পেয়েছি।

জ্যোৎস্না বোধ হয় প্রশ্নটা করিয়া ফেলিয়া কিছু অপ্রস্তুত হইয়াছিল, সেও নতমুখে কহিল, দেশ থেকেই যাওয়া আসা করেন, না কলকাতাতে থাকেন?

অমল জবাব দিল, না, দেশ থেকে আনাগোনা করা চলে না। অনেক খরচা, সময়ও লাগে বেশী। কলকাতাতেই একটা ছোট্ট ঘর ভাড়া ক'রে থাকি।

জ্যোৎস্না কহিল, আর কে থাকেন সেখানে?

ম্লান হাসিয়া অমল কহিল, আর কেউই থাকেন না। আমার একজন বন্ধু থাকতেন আগে, এখন তিনিও থাকেন না।

জ্যোৎস্না সব ভুলিয়া মাথা তুলিয়া প্রশ্ন করিল, তাহ'লে খাওয়া দাওয়া?

নিজে রেঁধে খাই। যেদিন পারি না, সেদিন হয় বাজার, নয় উপোষ ভরসা!

ইস্!......ব্যথিত নেত্রে জ্যোৎস্না কহিল, তাহ'লে ত বড্ড কষ্ট হয় আপনার!

অমল শুধু একটু হাসিল, জবাব দিল না।

এই সময়ে ডাক্তারবাবু সোরগোল করিতে করিতে ঢুকিলেন। পিছনে চাকরের হাতে মাংস, আরও মাছ, বাজার। নিজের হাতে দই, মিষ্টান্ন। সবগুলি উঠানে

নামাইয়া কহিলেন, অর্ডারি মাল কিছু ছিল, মানে মিহিদানা—নিয়ে এসেছি, বুঝেছ ? আর কিছু অর্ডারও দিয়েছি।······আর দেখ, তুমি রান্না-বান্না সারো ততক্ষণ ; মাষ্টার মশাইকেও দেখতে হবে তোমাকেই—আমি একটু বাইরে যাচ্ছি।

জ্যোৎস্না কহিল, তার মানে, এখন আবার কোথায় চললে ?

ডাক্তার পাঞ্জাবীটা খুলিয়া কোটটা গায়ে চড়াইতে চড়াইতে কহিলেন, কী করব বল দেখি, 'এস-ডি-ও'র মেয়ের অসুখ, ডেকে পাঠিয়েছে, না গেলেই নয়।········· আপনি কিছু মনে করবেন না মাষ্টার মশাই, আমি যাব আর আসব—ঘণ্টাখানেকও লাগবে না। ওরে, ব্যাগটা নে—

চাকরের হাতে ব্যাগটা দিয়া ব্যস্তভাবে তিনি বাহির হইয়া গেলেন, দ্বারের কাছাকাছি গিয়াও একবার মুখটা বাড়াইয়া কহিলেন, কিছু মনে করবেন না, বুঝলেন ? অবিশ্যি উনি যখন আছেন, সামনে বলতে নেই, অতিথি সৎকারের ত্রুটি হবে না। তবে আমারও বড় অন্যায় হ'লো। কিন্তু চাকরী, বোঝেন ত ?···

এত দ্রুত হাঁপাইতে হাঁপাইতে তিনি কথাগুলি কহিয়া গেলেন যে, অমলের আর অভয় দিবার অবসর হইল না, সে চুপ করিয়াই রহিল। একটু পরে জ্যোৎস্না কহিল, মেয়েটা আজ তিন দিন ধরে জ্বরে ভুগছে। বোধ হয় বাঁকাই দাঁড়াবে, উনি কালকেই বলছিলেন।

অমল প্রশ্ন করিল, এসব ব্যাগার ত ?

ঠিক ব্যাগার নয়, টাকা দেয়, তবে এসব জায়গায় খাটুনী বেশী। যতই উনি বলে যান 'যাব আর আসব', দুটি ঘণ্টার আগে ছাড়া পাবেন না। এই এক অসুবিধে এ কাজের, রাত নেই, দুপুর নেই, ডাকলেই যেতে হবে।

অমল কহিল, তাহ'লে তোমার ত বড় কষ্ট হয়! রাতবিরেতে একলা থাকতে হয় ত ?

কি আর করছি বলুন! একটু হাসিয়া জ্যোৎস্না জবাব দিল, তবে ঐ ঝিটা থাকে বাড়িতেই, তা ও যা হাবা-গোবা, থাকাও যা, না থাকাও তা!

ইহার পর মাংস বাছা, ঝিকে বাটনা দেখাইয়া দেওয়া, কুটনা কোটা

প্রভৃতি কাজে অনেকটা সময় কাটিয়া গেল। মধ্যে মধ্যে দুই-একটা খুচরা প্রশ্ন দুজনেই করে, অপর পক্ষ জবাব দেয়। অমল প্রশ্ন করে জ্যোৎস্নার ভাই বোনের কথা। জ্যোৎস্না প্রশ্ন করে তাহার কলিকাতার বাসা সম্বন্ধে। হঠাৎ এক ফাঁকে সে কহিল, বিয়ে করেছেন আপনি ?

অমল সংক্ষেপে কহিল, না। আসন্ন বিবাহের সংবাদটা দিতে কে জানে কেন, কোথায় যেন বাধিল।

সে মুগ্ধ নেত্রে বসিয়া দেখিতেছিল জ্যোৎস্নার গৃহিণীরূপ। কতখানি শ্রদ্ধা, কতখানি আগ্রহের সহিতই না এই কাজগুলি সে করিয়া যাইতেছে ! এত নৈপুণ্যই বা তাহার আসিল কোথা হইতে! রাজবালার সেই ক্লান্ত স্বর ও অবসন্ন অবস্থার কথা আজও মনে পড়িলে অমলের হাসি পায়। অথচ এ মেয়েটি যেন একসঙ্গে দশটি হাত বাহির করিয়া খাটিতেছে—কোথাও তাহাতে ক্লান্তির চিহ্নমাত্র নাই। চারিদিকেই দৃষ্টি, প্রত্যেকটি কাজ যাহাতে নিপুণভাবে সম্পন্ন হয়, সে সম্বন্ধে কত সতর্ককতা !

শেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে কহিল, এত সব কোথা থেকে শিখ্‌লে ? ওখানে ত কিছুই করতে না !

ঝি তখন কলঘরে, তবুও গলা খাটো করিয়া জ্যোৎস্না জবাব দিল, এসব কি আর আলাদা ক'রে শিখতে হয়, করতে করতেই শেখা হ'য়ে যায়। আমার সংসার, আমারই স্বামী, তাঁর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব খাবে, সেটা যদি আমি ভাল ক'রে না করি তাহ'লে কে করবে বলুন ত ! যতই ঝি-চাকর থাক, এসব কাজ কি ভাড়াটে লোক দিয়ে হয় ? পাটনায় থাকতে দেখেছি ত কোনদিন যদি মা নিজে হাতে কিছু করেন ত বাবার আহ্লাদের সীমা থাকে না ! অত ভুলো মানুষ, কিন্তু খেতে বসলে মায়ের হাতের রান্না মোনোটা মুখে পড়লেই ঠিক টের পান !

তাহার পর একটু থামিয়া কহিল, ওখানে আমার শাশুড়ীও কোন দিন কিছু করতে দেন নি, এখানেও ইনি বামুন চাকর ঠিক ক'রে তবে আমাকে এনেছিলেন। কিন্তু দুদিন থেকেই দেখলুম যে সে রান্না কেউ মুখে দিতে পারে না। একে উনি

একটু খেতে বেশী ভালবাসেন, তায় ঐ অখাদ্য ব্যাপার, অর্ধেক দিন ওঁকে উপোষ ক'রে থাকতে হ'ত। হপ্তাখানেক দেখে একদিন দিলুম ঠাকুরকে জবাব দিয়ে— উনি শুনে ভেবে অস্থির, আমারও একটু ভয় হয়েছিল প্রথমে, কিন্তু দেখলুম যে সব ঠিকই চলল, কোন অসুবিধা হ'ল না। আর তা ছাড়া কি নিয়ে থাকি বলুন ত, এই একলা একলা? সবই যদি ঝি-চাকরে করবে ত আমি করব কি? হয় বই নিয়ে বসে থাকতে হয়, নইলে বোনা। আমি আবার ঐ ছাইভস্ম বোনা দুচোখে দেখতে পারি না। এখানে সব দেখি বড় অফিসারদের বৌ-রা, খালি ব'সে ব'সে মোটা আর কদাকার হচ্ছেন অথচ কেউ ন'ড়ে ঘাস খাবেন না। কাজের মধ্যে ত কার্পেটের ওপর আঁকাবাঁকা জোবড়া ছবি তোলা,—সেগুলোর নীচে বড় বড় ক'রে "Dog" কিংবা "কালীয় দমন" লেখা না থাকলে বোঝবার যো নেই কোন্‌টা "কুকুর" আর কোন্‌টা "কালীয় দমন"!

কথার ফাঁকে ঝি আসিয়া পড়িয়াছিল, সে কহিল, বৌদির আমার কি হাতে পায়ে কাজ লাগে দাদাবাবু? নিজের পঞ্চাশ রকমের খাটুনী-ত আছেই, তার ওপর যদি আমার একটু শরীর খারাপ হ'ল ত আমার সব কাজগুলো পর্যন্ত নিজে করবে, আমাকে নড়তে দেবে না—বৌদি আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী ঠাকরুণ!

বাধা দিয়া লজ্জিত কণ্ঠে জ্যোৎস্না কহিল, আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে হরির মা, তোমাকে আর ব্যাখ্যা করতে হবে না।

তাহার পর কহিল, এবারে উনুনে কয়লা দেব যে মাষ্টার মশাই, এখানে ধোঁয়া হবে। আপনি দালানে গিয়ে একটু বসুন, আমি মাংসটা চড়িয়েই আসছি। কিংবা দালানে ব'সে আর দরকার নেই, ঠাণ্ডা লাগবে, আপনি একেবারে ঘরে গিয়েই বসুন—

অমল উঠিয়া পড়িল। কিন্তু ভিতরের দালানে বা ঘরে কোনখানেই বসিল না, ঘরের মধ্য দিয়া একেবারে বাহিরের বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানেও কয়েকটি বেতের চেয়ার পাতা, বেশ নির্জন এবং অন্ধকার—সামনে দুই একটা ফুলের গাছও আছে। একটা পুষ্পিতা রজনীগন্ধার শীষ হইতে চমৎকার গন্ধ বাতাসে

ভাসিয়া আসিতেছিল—সুন্দর স্নিগ্ধ নির্জনতা, শরীর এবং মন দুইই জুড়াইয়া গেল। তাহার সমস্ত চৈতন্যকে যেন জ্যোৎস্না ইতিমধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে, সে-মোহ কাটাইয়া প্রকৃতিস্থ হইতে গেলে এমনি নির্জনতাই দরকার! সে ক্লান্তভাবে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া চোখ বুজিল।

কিন্তু এখানে আসিয়াও সে জ্যোৎস্নার কথাই ভাবিতে লাগিল। আশ্চর্য, অদ্ভুত মেয়েটি! তাহার সমস্ত মন শ্রদ্ধায় বার বার এই মেয়েটির পায়ের কাছে অবনত হইতে লাগিল। এই মেয়েটিকে সে ইতিপূর্বে মনে মনে কতই না গালি দিয়াছে, কত অশ্রদ্ধাই না করিয়াছে। অথচ আজ! বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের আঘাতে তাহার মন যেন আজ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে, পূর্বেকার অশ্রদ্ধা যেন সমস্ত এক সঙ্গে ভীড় করিয়া অনুশোচনার রূপে তাহার মনে ফিরিয়া আসিতে শুরু করিয়াছে! কিছু পূর্বে স্ত্রী সম্বন্ধে ডাক্তারবাবুর উচ্ছ্বাস শুনিয়া সে হাসিয়াছিল, এখন সে বুঝিতে পারিল যে এক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস না করাই অসম্ভব।…

জ্যোৎস্নার কথা ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন চলিয়া গেল নিজের বিবাহে। মনে হইল, পারুল সম্বন্ধে তাহার মনে যে খুঁত আছে সেটা হয়ত নিতান্তই তাহার নিজের অজ্ঞতা, বিবাহের পূর্বে মেয়েরা যেমনই থাক্—বিবাহের পরে সমস্ত ত্রুটি ঢাকিয়া যায় নিশ্চয়ই!

বিবাহের পরে পারুল কেমন হইবে, কল্পনা করিতে করিতে এক সময় দেখিল যে তাহার সে ধ্যানমূর্তির মধ্যে কখন পারুল অন্তর্হিত হইয়াছে—সেখানে কমলা ও জ্যোৎস্নায় মিলিয়া এমন একটা স্বপ্ন রচিত হইয়াছে যে, তাহাকে মনে মনেও ভালো করিয়া দেখিতে গেলে সে মিলাইয়া যায়, অথচ অনুভব করিতে বাধে না। হাওয়ার মতই অধীর, হাওয়ার মতই লঘু, দখিনা হাওয়ার মতই মিষ্ট সে স্বপ্ন!

তাহার এই অর্ধজাগ্রত অবস্থাতে কতটা সময় কাটিয়া গেল তাহা সে বুঝিতে পারিল না. মনের অনেকখানি আশা ও বাসনা দিয়া রচিত এক মধুর স্বপ্ন হইতে যখন সে দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে জাগিয়া উঠিল, তখন দেখিল যে জ্যোৎস্না ঠিক তাহার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতিমধ্যে সে সমস্ত রান্না শেষ করিয়া ফেলিয়াছে,

আগেকার কাপড়টা বদলাইয়া কিছু কিছু প্রসাধনও করিয়া আসিয়াছে বোধ হয়, কারণ তাহারই একটা মৃদু সুগন্ধ অকস্মাৎ নাকে আসিয়া অমলকে পূর্ণজাগ্রত করিয়া তুলিল।

জ্যোৎস্না প্রশ্ন করিল, অমন নিঃশ্বাস ফেললেন যে?

তাহার পরই তাহার একখানা ঠাণ্ডা হাত অমলের ললাটের উপর রাখিয়া কহিল, ইস্, মাথা আপনার কি গরম! যেন আগুন ছুটছে, জ্বর-টর হয়নি ত?

অমল হাত বাড়াইয়া তাহার দুইখানা হাতই মাথার উপর চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না। ও আমার ছেলেবেলা থেকেই আছে, একমনে ব'সে কিছু ভাবলেই কান-মাথা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু তুমি কি আবার এত রাত্রে গা ধুয়ে এলে?

জ্যোৎস্না জবাব দিল, হ্যাঁ, রান্নার পর গা না ধুলে বিশ্রী লাগে···কিন্তু আপনি একমনে এত কি ভাবছিলেন বলুন ত?

জ্যোৎস্নার কণ্ঠস্বরে কোথায় যেন একটু ক্ষীণ আগ্রহের সুর ফুটিয়া উঠিল।

অমল একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া জবাব দিল, কে জানে, হয়ত তোমার কথাই ভাবছিলুম।···বোসো।

জ্যোৎস্না তাহার পাশের চেয়ার খানাতেই আসিয়া বসিল। সে একখানা আশমানী রঙের ঢাকাই শাড়ী পরিয়া আসিয়াছিল, তাহারই নূতন জরিগুলার উপর দূর রাস্তার আলো আসিয়া পড়িয়া ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল। সেই দিকে চাহিয়া অমল চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। পাছে নূতন করিয়া নেশা লাগে এই ভয়ে সে কিছুতেই ভালো করিয়া জ্যোৎস্নার মুখের দিকে চাহিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ বসিয়া থাকিবার পর অমল আস্তে আস্তে কহিল, তোমার কাছে আমার একটা মাপ চাইবার আছে জ্যোৎস্না—

ঠিক তেমনই মৃদুকণ্ঠে, যেন স্বপ্নজড়িত স্বরে জ্যোৎস্না জবাব দিল, কী বলুন ত?

অমল আর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, তোমার প্রতি আমি বড় অবিচার করেছিলুম, মনে মনে তোমাকে বড়ই অবজ্ঞা করতুম। তুমি আমাকে মাপ করো।

জবাব দিতে গিয়া জ্যোৎস্নার গলা কাঁপিয়া গেল। সে প্রাণপণে কণ্ঠস্বর সংযত

করিয়া কহিল, কিন্তু কিচ্ছু দোষ ত আপনি করেন নি। আমি বাস্তবিকই বড় ছোট ছিলুম যে! আপনিই ত আমার গুরু, আমাকে অপমানের চাবুক মেরে বুঝিয়ে দিলেন মানুষের কি হওয়া উচিত।

এই বলিয়া সে গলায় আঁচল দিয়া অমলকে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইল। তাহার পর কহিল, যেদিন আপনি বাঁকীপুর থেকে চ'লে গেলেন সে-দিন যে আমার কি ক'রে কেটেছে তা বলতে পারব না। আমার জন্যই আপনাকে পথে বেরোতে হ'ল—হয়ত পথে পথেই ঘুরতে হচ্ছে, হয়ত বা কোথাও আশ্রয় পান নি—একথা যতই মনে পড়ে, ততই যেন বুকের ভেতরটা কে মুচড়ে ধরে। সেদিন সারারাত কেঁদে কেঁদেই কেটেছে!···যদি কোনদিন পারেন ত আপনিই আমাকে ক্ষমা করবেন।

অমল তাহার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুপি চুপি কহিল, ও কথা এখন থাক—

তাহার পর তেমনি করিয়াই দুজনে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। জ্যোৎস্নার হাত-খানা অমলের দৃঢ়বদ্ধ মুঠির মধ্যে ঘামিতে লাগিল। সে হাত ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টাও করিল না, কিংবা আর কথাও কহিল না। নির্জন নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে পাশাপাশি বসিয়া গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত দুইজন শুধু দুইজনের সঙ্গ অনুভব করিতে লাগিল—যতক্ষণ না ডাক্তারবাবু ফিরিয়া আসিলেন।

২৩

পরের দিন সকালেই অমল কলিকাতা যাত্রা করিল। জ্যোৎস্না রবিবার দিনটা থাকিয়া যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিল, ডাক্তারবাবুরও যথেষ্ট অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে রাজী হইল না ভয়ে। ভয় তাহার জ্যোৎস্নাকেই, পাছে এখানে বেশীক্ষণ থাকিলে নেশা লাগে! জ্যোৎস্নার মোহ তাহাকে আচ্ছন্ন করিবার পূর্ব্বেই সে চলিয়া যাইতে চায়।

ডাক্তারবাবু ষ্টেশনে তুলিয়া দিতে আসিয়াও বারবার বলিতে লাগিলেন, এমন গেরো হ'ল যে, কাল রাত বারোটার আগে ছুটীই পেলুম না। না হ'ল আপনার সঙ্গে আলাপ করা ভাল ক'রে, আর না হ'ল একটু ভাল রকম খাওয়া-দাওয়ার যোগাড় করা, ভারী অন্যায় হ'য়ে গেল!

অমল কহিল, আপনার সঙ্গে ভাল ক'রে আলাপ করা হ'ল না, সে দুর্ভাগ্য আমারই। তবে আদর-যত্নের কোন ত্রুটী হওয়া যে সম্ভব নয় আপনার স্ত্রীর কাছে, সে-ত আপনিই ভাল জানেন!

ডাক্তারবাবুর মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন, তা অবিশ্যি বটে। বলতে নেই, ওর আদর অভ্যর্থনায় ভুল ধরবে, এমন লোক এখনও জন্মায় নি।... তা যাই হোক মাষ্টার মশাই, আপনি কিন্তু একেবারে ওকে ভুলে যাবেন না। বড্ড একলা থাকে, তবু আপনারা এলে দুদিন কাটে ভাল। বিশেষ ক'রে আপনাকে ও বড্ডই শ্রদ্ধা করে। আপনার আঁক কষে দেওয়া, নাম লিখে দেওয়া খাতাগুলো এখনও ওর বাক্সে আছে—

ট্রেন আসিয়া পড়িল। অমল ডাক্তারবাবুর হাত দুইটি ধরিয়া তাঁহাকে বিশেষ ধন্যবাদ জানাইয়া ট্রেনে উঠিয়া পড়িল। তাহার পর ট্রেন ছাড়িয়া দিতে একটা জানালায় মাথা রাখিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, খুব বাঁচিয়া গেলাম! জ্যোৎস্নার জীবন সুখী হউক, সার্থক হউক—আমার দ্বারা তাহার এমন সোনার সংসারের কোন অনিষ্ট না হয়। যে স্বর সে প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে তাহাকে আর নূতন করিয়া জাগাইয়া লাভ নাই—

কিন্তু কলিকাতাতে আসিয়া দেখিল যে জ্যোৎস্না একটি খুব বড় অনিষ্ট তাহার করিয়াছে; সে আর কোন কাজেই মন দিতে পারে না। অবাধ্য মনকে যতই শাসন করে, ততই কখন্ আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া সে জ্যোৎস্নার কাছে আসিয়াই উপস্থিত হয়। অফিসের খাতা খুলিয়া রাখিয়া অন্যমনস্ক হইয়া কী ভাবে, অন্য বাবুরা ঠাট্টা করেন। শেষে জোর করিয়া সে নিজের বিবাহের কথা ভাবে, পারুলকে চিন্তা করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন মনটা আড়ষ্ট হইয়া ওঠে।

কমলার মত কি জ্যোৎস্নার মত করিয়া তাহার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই পারুল নানা কাজে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, একথাটা যেন কিছুতেই কল্পনা করা যায় না, কেমন যেন স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়। অবশেষে কোন এক সময়ে, সে আশ্চর্য হইয়া লক্ষ্য করে, পারুলকে বাদ দিয়া সে সোজাসুজি কমলা বা জ্যোৎস্নাকেই স্বপ্ন দেখিতে শুরু করিয়াছে। ইহা পাপ, মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, ইহার মধ্যে ভবিষ্যৎ অশান্তির বীজ লুকানো আছে—এই সব বলিয়া মধ্যে মধ্যে সে মনকে শাসন করিতে বসে, কিন্তু ফল হয় না—

মঙ্গলবার পর্যন্ত দেখিয়া সে অফিসে বসিয়াই ইন্দুকে এক দীর্ঘ পত্র লিখিল। লিখিল, 'বিয়ের সমস্তই ঠিক, কিন্তু মনে যেন কোন উৎসাহ পাচ্ছি না। এখন বন্ধ করতে গেলেও কেলেঙ্কারী বাধবে। অথচ কী করি ভেবে পাচ্ছি না। আপনারা কি কোন রকমেই আসতে পারেন না? আপনারা এলে তবু একটু বল পাই।'

জবাব আসিল বৃহস্পতিবার দিনই। চিঠির উত্তর ইন্দু দেয় নাই, দিয়াছে কমলা! সে লিখিয়াছে—

'উনি আমাকেই জবাব দিতে বললেন! বললেন, এ ব্যাপার নাকি আমারই বেশী ক'রে বোঝা উচিত।···আপনি কেন মিছিমিছি ভয় পাচ্ছেন? আপনাকে যে পাবে, তার ত জন্ম জন্মান্তরের সৌভাগ্য—সে কি তা বুঝবে না বলতে চান? আর সে তা বুঝলেই আপনাকে সুখী করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করবে। এই চেষ্টাই যে মেয়েমানুষের সব কিছু সুখ-শান্তি। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, সে আপনাকে শান্তি দিতে পারবে নিশ্চয়ই।

যাওয়ার কথা যা লিখেছেন, এখন ত তার কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছি না। বিভাসবাবুর ভয়ানক অসুখ, তিনি স্কুলের ভার আপনার এই দুই বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছেন—এক্ষেত্রে যাওয়া মুস্কিল। তবে যদি কোন মতে যাওয়া সম্ভব হয়, শেষ পর্যন্ত বৌভাতের দিনও গিয়ে উপস্থিত হবো, এ আপনি নিশ্চয় জানবেন। কিচ্ছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

চিঠিখানা পাইয়া ভরসা কিছুই পাইল না সত্য কথা, কিন্তু তবু যেন খানিকটা নিশ্চিন্ত হইল।

অফিসে কিছু জানাইবে কিনা, ক'দিন ধরিয়াই ভাবিতেছিল। শেষে ভাবিয়া দেখিল যে পরে অন্য লোকের মুখে শোনা অপেক্ষা আগে তাহার মুখে শোনাই শ্রেয়। সে সেই দিনই ছুটির পর বড়বাবুর টেবিলের কাছে গিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু মুখ তুলিয়া কহিলেন, কি বাবা অমল?

ইদানীং তিনি তাহার সঙ্গে খুব স্নেহের স্বরেই কথা কহিতেন। অমল মাথাটা একটু চুলকাইয়া লইয়া কহিল, আপনার কাছে একটা অনুমতি নেবার আছে—

তিনি জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। অমল প্রায় মরিয়া হইয়াই বলিতে শুরু করিল, এবার ছুটি নিয়ে বাড়ী গেলে বাবা আমাকে বিয়ে করবার জন্য বড্ড ধ'রে পড়েছেন। আমি অবিশ্যি কিছুতেই রাজী হইনি, কিন্তু তাঁদেরও যে খুব কষ্ট হচ্ছে এ-ও সত্য কথা। বাবা একেবারেই অথর্ব হয়ে পড়েছেন, চোখে দেখতে পান না; ভাই-বোনরাও খুব ছোট। সংসারে লোকের অভাব খুবই—। তার ওপর বাবা বলছেন যে, যে মেয়েটি তিনি দেখেছেন তাকে আমি বিয়ে করলে তার ভায়ের সঙ্গে আমার এক বোনেরও বিয়ে দেওয়া চলতে পারে।

সে চুপ করিয়া গেল। বড়বাবু কতকটা শুষ্কস্বরেই কহিলেন, তা আমার কাছে কিসের অনুমতি?

তাঁহার সে কণ্ঠস্বরে অমল দস্তুর মত ভয় পাইয়া গেল। তবু কোনমতে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল, আমার আর মাথার ওপর কে আছে বলুন আপনারা একটু স্নেহ করেন, আপনারা ছাড়া উপদেশই বলুন আর পরামর্শই বলুন আর কে দিতে পারে?

অপেক্ষাকৃত নরম স্বরে বড়বাবু জবাব দিলেন, তা বটে!

তাহার পরই কিন্তু যেন উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন, ভাগ্যিস্ কলেজে বেশী লেখাপড়া করোনি, তাই আমাদের কাছে পরামর্শ চাওয়ার যে দরকার আছে একথাটা মানলে! কিন্তু ঐ সব গ্রাজুয়েট ছোকরাবাবুরা যদি একথা শুনতে পায় ত তোমার গায়ে ধুলো

দেবে। ওরা বলে, বড়বাবু আছে, অফিসেই আছে, বাড়ির কথায় কি ? একেবারে ডোণ্ট কেয়ার—বুঝলে না ! ঐ যে নকুল, বোশেখ মাসে বিয়ে করলে তা আমাদের জানালে না পর্য্যন্ত ! অফিসের বন্ধুবান্ধবদের পরে একদিন খাওয়ালে তাও আমাকে একবার বলা দরকার বিবেচনা করলে না !···তা তুমিও আর ইতস্তত ক'র না, বুঝলে ? কিন্তু এ মাসে আর বিয়ের দিন কৈ ?

অমল কহিল, এই আসছে রবিবার শেষ দিন—

বড়বাবু যেন লাফাইয়া উঠিলেন, আর তুমি এখনও এখানে ? যাও, যাও, আজই বাড়ি চলে যাও, আমি কাল থেকেই এক সপ্তার ছুটি দিলুম তোমাকে। গিয়ে সব ঠিকঠাক ক'রে ফেলগে। অত ভাবলে কি চলে ? পুরুষস্য ভাগ্যম্—তা ছাড়া তোমার স্ত্রীও-ত একটা বরাত নিয়ে আসবে গো !

অমল কহিল, কিন্তু মাইনে যে পাই মোটে তিরিশটি টাকা, বড্ডই ভয় করে—

বড়বাবু কহিলেন, পনেরো টাকা ! বুঝলে, আমি যখন বিয়ে করেছি তখন পনের টাকা মাইনে পাই আমি। তাতে কি ? ও সব ঠিক হয়ে যাবে—। বরং এক কাজ করো না কেন, তোমার ত বিকেলে সময় থাকে, আমার ছোট দুটো ছেলেমেয়েকে, আর নাতিটাকে পড়াও না কেন ? অবিশ্যি বেশী দিতে পারব না বটে—

তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া অমল কহিল, আপনার ছেলেমেয়েকে পড়াবো তার জন্যে টাকা নেবো ?···না না ও কথা বলবেন না, আমি যাব নিশ্চয়ই—

কৃত্রিম ধমক দিয়া বড়বাবু কহিলেন, তুমি থাম হে ছোকরা, জ্যাঠামি করতে হবে না।···টাকা, আমি পুরানো মাস্টারকে ছ'টাকা দিতুম, তা তোমাকে না হয় পুরোপুরি আট টাকা করেই দেবো।···তোমার খরচ যা বাড়বে তার ব্যবস্থা ক'রে দিলুম, আর কি ? তা ছাড়া, সুবিধে পেলেই আমি ওদিকের ব্যবস্থাও ক'রে দেবো এখন—। তুমি এখন যাও, আজই যাতে রাত্তিরের গাড়ীতে বাড়ী যেতে পারো, তার ব্যবস্থা করোগে। ছুটির একটা দরখাস্ত দিয়ে যেও, আর কিছু ভাবতে হবে না।

অমল হেঁট হইয়া একেবারে তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি 'থাক্ থাক্ হয়েছে, কর-কি ছোকরা', বলিয়া যথারীতি বাধা দিলেন, তাহার পর মনিব্যাগ হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া কহিলেন, যাবার সময় বৌমার জন্যে একটা রূপোর সিঁদুর কৌটো কিনে নিয়ে যেও বুঝলে। নাও, নাও, আমার কথা অমান্য করতে নেই—

সেখান হইতে দেবেশবাবুর টেবিলে গিয়া তাঁহাকেও চুপি চুপি কথাটা জানাইল, সঙ্গে সঙ্গে অপরকে জানাইতে বারণ করিয়া দিল। দেবেশবাবুর ছোট ছোট চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, থাবার মত তাঁহার ডান হাতখানা দিয়া প্রবল এক ঝাঁকুনি দিয়া কহিলেন, ভালই হ'ল মাষ্টার, ঘুরে ত ঢের দিন বেড়ালে, এইবার সংসারী হওগে। আর বড়বাবুর সুনজরে যখন পড়েছ তখন আর চিন্তা কি, মাইনে বাড়তে বেশী দেরী হবে না।

তাহার পরই তিনি তাহাকে বসাইয়া চট করিয়া পাশের টেবিলে চলিয়া গেলেন, সেখানে এক বাবুর কাছ হইতে দুইটা টাকা ধার করিয়া আনিয়া তাহার হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিলেন, তোমার জন্য একখানা ধোয়া কাপড় কিনে নিও, আইবুড়ো ভাতের কাপড়! যেতে আমি পারবোনা, শালা ছোট সাহেবের ষ্টেটমেণ্ট তৈরী হয়নি এখনও, একটি বেলার ছুটি দেবে না। মোদ্দা, কাপড়টা কিনে নিও মাষ্টার ঠিক, নইলে মনে বড় দুঃখ করব।

২৪

দুই একটা খুচরা বাজার সারিয়া লইয়া পরের দিন সকালের গাড়িতেই অমল দেশে গেল। আয়োজন সামান্য, সুতরাং হৈ চৈ বিশেষ কিছু নাই। তবু দূর-সম্পর্কের দুই একজন আত্মীয় ইতিমধ্যে আসিয়া হাজির হইয়াছেন বলিয়া অনেক দিন পরে বাড়ি যেন একটু সরগরম হইয়া উঠিয়াছে। তাহার মায়ের যাহা কিছু ছিল সব

বিক্রয় করিয়া বোনের দুইটি অলঙ্কার তৈয়ারী হইয়াছে, গৃহের সামান্ত সংস্কার হইয়াছে এবং এই সব খরচ চলিতেছে। হরনাথবাবু চুপি চুপি শুনাইয়া দিয়াছেন যে পুঁটির বিবাহের ও তাহার বৌভাতের দিনের খাওয়ার খরচা খুব কম করিয়া সারিলেও একশ' টাকা পড়িবে এবং সেই টাকাটা বোধ হয় ধার করিতে হইবে। তাঁহার পুরাতন মনিব অর্থাৎ ইস্কুলের সেক্রেটারী ও গ্রামের জমিদার কিছু দিবেন বলিয়াছেন, কিন্তু সে যে কত তাহা এখনও জানা যায় নাই। মেজ ভাই যেখানে কাজ করে সেই সরকার বাবুরাও বোধ হয়া গোটা-দশেক টাকা দিবেন আশা করা যাইতেছে। বাকী যাহা লাগিবে তাও তাঁহারাই ধার দিবেন, খোকার মাহিনা হইতে মাসে মাসে কাটা যাইবে।

প্রায় ভিক্ষা করিয়াই বিবাহ করা! অপমানে অমলের কান-মাথা আগুন হইয়া ওঠে, কিন্তু নীরবেই তাহা পরিপাক করে, উপায় কি ?……

আর একটি দিন আছে মাত্র, কিন্তু তবু কে জানে কেন মনে উৎসাহ আসে না। সে নির্জনে ঘুরিয়া বেড়ায়, বাগানে বা মাঠে। কোন কাজেই যোগ দিতে পারে না। সধবা স্ত্রীলোক দরকার বলিয়া এক পিসতুতো বোনকে আনা হইয়াছে, সে ঠাট্টা করিয়া বলে, কী দাদা, সুন্দরী বউ আসবে ব'লে কি এখন থেকেই আমাদের ত্যাগ করলে ?

অমল হাসিবার চেষ্টা করে, কিন্তু না ফোটে হাসি, আর না দিতে পারে জবাব। তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়া একটা আমগাছের তলায় মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়ে।

দুপুর বেলা নাগাদ মেজ ভাই আসিয়া কাছে বসিল। কহিল, দাদা, বাবা বলছিলেন যে, ওর কি মেয়ে পছন্দ হয় নি ? সবাই ত বলছে সুন্দর মেয়ে, তবে অমন ভাবে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কেন ?

অমল তাড়াতাড়ি জবাব দিল, না, না, সে সব কিছু নয়! একে খরচা বাড়ল, তায় ধার-দেনা হ'ল—কত রকম ভাবনা হয় বুঝিস্ ত!

সেও ঘাড় নাড়িয়া জবাব দিল, তা বটে। আমার মাইনেতে ত এখন পাঁচ-ছ মাস হাত দেওয়াই যাবে না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অমল কহিল, তুই এদের চিনতিস্ ভাল ক'রে ?

বিমল জবাব দিল, কাদের? বৌদিদের?

অমল ঘাড় নাড়িল। বিমল কহিল, চিনতুম বৈকি। ওদের বাড়িতে আমি কতবার গেছি। বুড়ীর বর হবে যে শান্তিপদ, ওর কাছে পড়া ব'লে নিতে যেতুম আগে।···বৌদি বেশ সুন্দরই হবে দাদা, তুমি কিচ্ছু ভেবো না।

লজ্জায় অমল লাল হইয়া উঠিল! কহিল, দূর! সে কথা কে জিগ্‌গেস করছে। কেমন কুটুম্ব হবে তাই ভাবছিলুম। ওরা লোক কেমন?

বিমল অত বোধ হয় কোন দিন ভাবিয়া দেখে নাই। সে খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, লোক ভালই হবে, খারাপ হবে কেন?

অমল আর কথা কহিল না। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া বিমলও উঠিয়া গেল। যাক্—মেয়ে খুব সুন্দরী না হইলেও ভালই দেখিতে! নিজের দেখার অপেক্ষা এ সব ব্যাপারে বাহিরের লোকের কথাতেই যেন ভরসা পাওয়া যায় বেশী। যত দুঃখের আঘাতই পাক্ তবু অমলের বয়স কাঁচা, সুন্দরী বধূ আসিতেছে একথা বার বার শুনিলে, এ বয়সে যে কোন অবস্থাতেই লোভে মন দুলিয়া ওঠে। তাহারও মন, দুলিয়া কাঁপিয়া উঠিল। অনেকদিন আগে পারুলকে দেখিয়াছে, তাও ভাল করিয়া চাহিতে পারে নাই, সুতরাং চেহারাটার স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তবু যতটা মনে পড়ে তাহারই উপর নির্ভর করিয়া কল্পনায় একটা মূর্তি গড়িয়া লইল।

এতক্ষণে তাহার বিবাহের নেশা লাগিয়াছে। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। অপরাহ্ণ বেলায় মাইল দুই মাঠ পার হইয়া ক্ষীণকায়া নদীর ধারে উপস্থিত হইল এবং সেখানে বহু রাত্রি পর্যন্ত নির্জনে বসিয়া ভাবিতে লাগিল পারুলের কথা···। পারুলও হয়ত তাহার কথা ভাবিতেছে, তাহাকে সেও কি একবার চুরি করিয়া দেখিয়া লয় নাই? কে জানে পছন্দ হইয়াছে কি না! তবে ছেলে বেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছে যে চেহারাটা তাহার মন্দ নয়, বরং অনেকে ভালই বলিয়াছে। হয়ত পারুলের অপছন্দ হয় নাই, হয়ত বা সেও বিবাহ বাড়ির সহস্র গোলযোগের মধ্যে সখী ও আত্মীয়াদের অজস্র হাস্য পরিহাসের অবসরে অমলের কথাই ভাবিতেছে, ভাবিতেছে হয়ত যে অমলের ঠিক কতকটা পছন্দ হইল!

অমল আপন মনেই হাসিয়া উঠিল। দু'টি সর্বাধিক নিকট লোকের এই একই দুশ্চিন্তা—মজা মন্দ নয়!······তাহার মনে পড়িল ইন্দুর ফুলশয্যার পরের রাত্রির কথাটা। এমনিই হয়, দুটি লোকেরই পরস্পরকে ভালবাসিবার ইচ্ছা, সর্বস্ব অর্পণ করার ইচ্ছা, অথচ কি দুর্নিবার লজ্জা! সে কল্পনা করিতে লাগিল পারুলও অমনি লজ্জায় জড়ো-সড়ো হইয়া শয্যার এক পাশে বসিয়া আছে ঘাড় গুঁজিয়া, আর সে সাধ্য সাধনা করিতেছে কথা কওয়াইবার জন্য। সুন্দর ললাটের চন্দনবিন্দুগুলি স্বেদবিন্দুর সহিত মিশিয়া নিশ্চিহ্ন হইতে বসিয়াছে, তাহার হাতের মুঠার মধ্যে নরম ফুলের মত হাত দুইটি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, মুখে সলজ্জ হাসি একটুখানি, চোখ দুইটি নত। সেই দীর্ঘ পক্ষ্মের মধ্য হইতে এক একবার অপাঙ্গে চাহিয়া লইতেছে, কথা কহিবার ইচ্ছা কিন্তু কিছুতেই কথা ফুটিতেছে না। হয়ত বা এই ভাবেই ফুলশয্যার সেই অবশিষ্ট সামান্য রাত্রিটুকু কাটিয়া যাইবে, পারুলের কথা কওয়াই হইবে না।

কিন্তু তা না হউক, তাহাতে অমলের কিছুমাত্র ক্ষতি নাই—সেই সাধনাতেই তাহার বুক ভরিয়া যাইবে। বহুদিনের তৃষাতুর বক্ষ তাহার খুঁজিয়া পাইবে অমৃত!

অমল উত্তেজনায় স্থির থাকিতে পারিল না। উঠিয়া নদীর ধারে পায়চারি করিতে লাগিল।···পরের দিনও আবার তেমনি সাধ্য সাধনা করিতে হইবে, সেদিন কথা ফুটিবে, কিন্তু সে সামান্য দুই-একটা। তবু তাহাতেই রাত্রি ভোর হইয়া যাইবে, নিদ্রার অবকাশ মিলিবে না, পরের দিন আত্মীয়ারা আরক্ত চক্ষু ও নেত্রকোণের কালিমা দেখিয়া উপহাস করিবেন। সেই উপহাস আর তাহারই ফাঁকে ফাঁকে চুরি করিয়া চাওয়া, ছল করিয়া দুই জোড়া চোখের দৃষ্টি বিনিময়—এ ক'দিনের এইটুকু গোপন মধুই তাহাদের অবশিষ্ট জীবনের পাথেয় হইয়া থাকিবে।

এইটুকু সম্বল করিয়াই ইন্দু আর কমলা কি সুদূর পল্লীগ্রামে অতি সামান্য আয়েই সুখের সংসার পাতিয়া বসে নাই? নাই বা রহিল ভবিষ্যতের আশা এবং বর্তমানের স্বাচ্ছন্দ্য—ঐ অমৃতই তাহাদের অজেয় ও অমর করিয়া তুলিবে, ভুলাইয়া দিবে এ জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা!

২৫

সেদিন সারারাত্রি অমল ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারিল না। উত্তেজিত চিন্তার ফাঁকে ফাঁকে টুকরা টুকরাভাবে যেটুকু ঘুম হইল তাহাও কমলা জ্যোৎস্না ও পারুলের স্বপ্নে ভরিয়া রহিল। কিন্তু পরের দিন অতৃপ্ত নিদ্রা লইয়া উঠিলেও তাহার কোন গ্লানি বোধ হইল না, কারণ চোখে তখন দস্তুর মত রং ধরিয়াছে।

সেদিন আর তাহাকে মাঠে আশ্রয় লইতে হইল না। সে নানা কাজে ব্যস্ত হইয়া বাড়ীর মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল এবং কল্পনা করিতে লাগিল, যে এই বাড়ীরই কক্ষে কক্ষে তাহার সুন্দরী বধূ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, মুখে সলজ্জ হাসি, এবং আনতদৃষ্টি ক্ষণে ক্ষণে তাহার চোখের সহিত মিলাইয়া আবার নামিয়া যাইতেছে।

পারুলকে যে বিবাহের পরে খুবই সুন্দর দেখাইবে সে বিষয়ে আর তাহার সংশয়মাত্র ছিল না। যেটুকু খুঁত এখন চোখে পড়িতেছে তাহা বিবাহের পরে যে নিশ্চিহ্নভাবে ঢাকিয়া যাইবে, সে বিষয়েও সে নিশ্চিন্তই ছিল। জ্যোৎস্না ও কমলাকে তাহার চোখে সুন্দর লাগিয়াছে—সুতরাং সে এই কথাটাই ধরিয়া লইয়াছে যে, বিবাহের পরে সব মেয়েকেই সুন্দর দেখায়।

আসন্ন উৎসবের আভাসে বাড়ী মুখরিত। এই কয়টা দিন দারিদ্র্য তাহার ম্লান ছায়া লইয়া বিদায় লইয়াছে। বন্ধুবান্ধব কেহ তাহার নাই—এই গ্রামে যে-সব বাল্যবন্ধু তাহার ছিল, তাহাদের কাহারও সহিত সে আর মিশিতে পারে না—এই অভাবটা মধ্যে মধ্যে পীড়া দিতে থাকিলেও অমল ভাই বোনদের লইয়াই মাতিয়া উঠিয়াছিল। হাস্য-পরিহাসের জোয়ার আসিয়াছে, এমন কি হরনাথবাবুরও অথর্বতা যেন চলিয়া গিয়াছে। আসন্ন বিবাহের আনন্দে বুড়ীও চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার যে কৈশোর আসিয়াছে, একথাটা এই প্রথম অমল উপলব্ধি করিল। মোটের উপর সবটা মিলিয়া অমলের ভালই লাগিতেছিল।

জমিদারবাবুরা কুড়িটি টাকা দিয়াছেন, সরকারবাবুরা দিয়াছেন দশ টাকা তবু হরনাথবাবু সরকারদের গদী হইতে পুরা একশটি টাকাই ধার লইলেন, বলিলেন, এমন আনন্দের দিনে অত টেনেটুনে চালাতে পারব না। না হয় দু-দশ টাকা বেশীই ধার হবে!

তাঁহার এক প্রাক্তন ছাত্র আধ মণ মাছ দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে, সেই ভরসাতে তিনি লোকও নিমন্ত্রণ করিয়াছেন বিস্তর। দুই দিনই যে পরিমাণ লোক খাইবে তাহাতে ঐ মাছ এবং একশ' ত্রিশ টাকায় কুলাইবে কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, তবু অমল বাধা দিল না। তাহারও মন এই কয়দিনের জন্য যেমন সমস্ত দুর্ভাবনা ও দুঃখের উপরে উঠিয়াছে, উহারাও না হয় তেমনি ভুলুক অতীতের সব দুঃখ এবং ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা!

শনিবার রাত্রিও কাটিল খানিকটা হল্লা করিয়া এবং খানিকটা টুক্‌রা টুক্‌রা ঘুমে। অবশেষে শেষ রাত্রে তাহার পিসতুতো বোন সুহাস যখন দধিমঙ্গলের জন্য ডাকিয়া তুলিল তখন আর সে বিছানাতে ফিরিয়া গেল না, প্রথম উষার অস্পষ্ট আলোতে মাঠ পার হইয়া নদীর ধারে গিয়া উপস্থিত হইল।

সেখানে পায়চারী করিতে করিতে কত কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল। সেই প্রথম যৌবনে উন্নতির আশায় রাত্রের নিঃশব্দ অন্ধকারে গৃহ ত্যাগ, তাহার পর কলিকাতার বিভিন্ন মেসে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস অদৃষ্টের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ। তখনকার প্রতিটি দিনের সেই দারিদ্র্য ও উঞ্ছবৃত্তির কথা মনে পড়িলে আজও সে শিহরিয়া উঠে!···তাহার পর সেই সুদূর প্রবাসে যাত্রা করা—একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া সে মনে মনে বলিল, পারিলাম না, কিছুই করিতে পারিলাম না! এ জীবনে কোথাও কোন উন্নতি আমার অদৃষ্টে নাই। তাহার চেয়ে এই ভাল, পিতৃ-পিতামহের মত নিজের দারিদ্র্যের কাছে আত্মসমর্পণ করাই ভাল। এই সংসার, এই অভাব অনটনের মধ্য হইতেই যেটুকু মধু পাওয়া যায় সেইটুকুই ভাল······

বৃহস্পতিবার দিন অফিস হইতে বাহির হইয়া সে জ্যোৎস্নাকে একখানা চিঠি

দিয়াছিল। তাহার বিবাহের কথাটা সে যে অজ্ঞাত সঙ্কোচে তাহাকে জানাইতে পারে নাই তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তাহার শুভেচ্ছা প্রার্থনা করিয়াছিল। নিতান্তই একটা আকস্মিক আবেগের ফলে এই চিঠি লেখা—এবং সে জন্য তাহার লজ্জারও অবধি ছিল না। জ্যোৎস্নার সহিত পত্র-ব্যবহার করাও তাহার পক্ষে উচিত হইয়াছে কি না, এ প্রশ্নও মনে মনে খোঁচা দিতেছিল।

নদীর ধার হইতে আটটা নাগাদ বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, জ্যোৎস্নার নিকট হইতে উত্তর আসিয়াছে। ছোট চিঠি, আর তিনখানি দশ টাকার নোট।

চিঠিতে সে লিখিয়াছে—

মাষ্টার মশাই,

আপনার চিঠি পেয়ে যে কি আনন্দই হ'ল, তা লিখে জানাতে পারব না। আপনি যে সেদিন আমার কাছ থেকে পালিয়েই গেলেন তা আমি বুঝেছিলুম, আর সেই জন্যে মনে একটু কষ্ট ছিল। কিন্তু এখন আপনার চিঠি পেয়ে সব গ্লানি ধুয়ে মুছে গেল। বুঝলুম যে আপনি আমাকে সত্য-সত্যই মার্জনা করেছেন, নইলে এ চিঠি দিতেন না।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি এবার সুখী হোন—যথার্থ শান্তি পান। আপনাদের জীবন যেন নিষ্কণ্টক হয়।

একটি ভিক্ষা আছে। ত্রিশটি টাকা পাঠালুম, দয়া ক'রে ভাল দুটো চুণী বসানো দুল তৈরী ক'রে দেবেন আপনার বৌকে। সে দুল দুটো যেন তিনি বারো-মাস পরেন! যখনই তিনি কাজকর্ম্ম ক'রে বেড়াবেন, দুলগুলো নড়তে থাকবে আর সেই চুণীর লাল আভা তাঁর সুন্দর গালে প'ড়ে আরও ভাল দেখাবে। তখন কি একবার মনে পড়বে না জ্যোৎস্নার কথা? বিয়ে ক'রে ত আমাদের ভুলে যাবেনই মনে করিয়ে দেবার জন্যে তাই এত ফন্দী।

বড় ভয় হচ্ছে কিন্তু আপনার জন্যে। যে মন আপনার, যিনি আসছেন তিনি তার হদিশ পাবেন ত? শান্তি দিতে পারবেন ত? কে জানে!

যাক—চিঠির জবাব দিতে বলব না, এমন কি, আবার আসবেন, এ কথাও

বলব না। তবে সুদূর ভবিষ্যতে যদি কখনো কোন কারণে জ্যোৎস্নার কথা মনে পড়ে, তবে নিশ্চয় তার কাছে আসবেন, একটুও দ্বিধা করবেন না। এইটুকুই প্রার্থনা জানানো রইল।

নমস্কার নেবেন। ইতি— আপনার জ্যোৎস্না

অমল চিঠিখানি ও নোটগুলি সযত্নে জামার বুক পকেটে তুলিয়া রাখিল। জ্যোৎস্নার চিঠি পাইয়া আনন্দ হইল বটে, কিন্তু কোথায় যেন একটু বিষাদের সুরও বাজিতে লাগিল। কোথায় যেন একটা গোলমাল রহিয়াছে, সেই কথাটাই হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল !

বিবাহের সময় আসন্ন হইয়া আসিল। গোলমাল, লোকজন, কোথাও একটু কান্না তাহার মৃতা জননীর উদ্দেশে, পরক্ষণেই কোথাও পরিহাস! তাহারই মধ্যে এক সময় বরবেশে অমল গিয়া পাল্কীতে উঠিল। সে এক পথ দিয়া যাইবে, তবে অপর পথে আসিবে তাহার ভাবী ভগ্নীপতি।

বিবাহ বাসরে যখন পারুলকে আনা হইল তখন তাহার সমস্ত মন একাগ্র হইয়া উঠিল, কৌতূহলে, আশঙ্কায় ও আশায়। বহুদিন আগেকার দেখা, সে স্মৃতি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। কে জানে কেমন দেখিতে হইবে সে। কিন্তু কৌতূহলের অপেক্ষাও তখন লজ্জা প্রবল, শুভদৃষ্টির সময় প্রাণপণ চেষ্টাতেও যেন চোখ তোলা যায় না সে দিকে—

ওমা, এ কী বরগো, চোখ চায় না কেন। চাও, চাও, দেখ একবার মুখ তুলে—

বহু চেষ্টায় অমল চোখ তুলিল। পারুল কিন্তু তাহার আগেই চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিল, তাহার সহিত চোখোচোখি হইতেই ফিক্ করিয়া হাসিয়া চোখ নামাইল।

অকস্মাৎ যেন কে একটা চাবুক মারিল অমলকে। কোথায় যেন একটা রূঢ় আঘাতে তাহার স্বপ্নভঙ্গ হইয়া গেল। এ যেন বড় বেশী স্পষ্ট, বড় বেশী

প্রগল্‌ভ। ইহার মধ্যে সেই লজ্জাটি কোথায়, যাহা কুৎসিৎ মেয়েকেও রমণীয় করিয়া তোলে ?

সামান্য ব্যাপার! কিন্তু তবুও তাহার কাছে যেন সমস্তটা বিস্বাদ ঠেকিল। সে মনকে ধমক দিতে লাগিল, এ কিছু নয়, তোমারই দৃষ্টির ভ্রম। এ তোমার নিতান্তই বাড়াবাড়ি।

যাহাই হউক—বিবাহ বাড়ীর একটা মাদকতা আছে, যাহাতে বেশীক্ষণ দুশ্চিন্তা থাকে না। রেশমী সাড়ীর খসখসানি, কারণে অকারণে চাপা ও সশব্দ হাসি, চোখে চোখে কটাক্ষবিনিময়, ঠাট্টা বিদ্রূপ ও নানা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের মনেই নেশা লাগে। বিশেষত অমল বর, সেই উৎসবের সে-ই নায়ক, তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই সব কিছু—সুতরাং শীঘ্রই আশঙ্কা কাটাইয়া আশার দিকেই তাহার মন ঝুঁকিল। সে আবার উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যেটুকু আশঙ্কা থাকিতে পারিত, সেটুকুও চলিয়া গেল, যখন অপরের অন্যমনস্কতার ফাঁকে সে বারকতক পারুলের দিকে চুরি করিয়া চাহিয়া লইল! মুখে অবগুণ্ঠন, সেটা ভাল করিয়া দেখা গেল না বটে, তবে শুভ্র সুন্দর যে হাতখানি লাল বেনারসী কাপড়ের উপর পড়িয়াছিল তাহা সত্যই দেখিবার মত। না, সে ঠকে নাই।

সে নিশ্চিন্ত হইয়া দিদি-শাশুড়ীর সহিত রসিকতায় যোগ দিল। আজিকার রাত্রি জীবনে আর আসিবে না, এ রাত্রির সমস্ত আনন্দটা উপভোগ করিয়া লওয়া চাই।

২৬

পরের দিনকার অনুষ্ঠান শ্বশুরবাড়ি হইতে সারিয়া গৃহে ফিরিল সন্ধ্যার অল্প মাত্র আগে। কিন্তু ফিরিবার পথেও অমলের আর একটা খটকা লাগিল। ট্যাক্সী করিয়া যখন তাহারা ফিরিতেছে, সেই অল্প সময়ের মধ্যেই পারুল দুই তিনবার ফিস ফিস

করিয়া কি কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই চেষ্টাটা তাহার ভাল লাগে নাই, এ যেন তাহার স্বপ্নের সঙ্গে মেলে না।

কিন্তু তখন আর সেদিকে মন দিবার সময় ছিল না, পরের দিনই বৌ-ভাত ও ফুলশয্যা! তাহার আয়োজন করিতে করিতে গভীর রাত্রি হইয়া গেল, তাহার পর শুইবামাত্র ক্লান্তিতে তাহার চোখ বুজিয়া আসিল। কিছু ভাবিবার বা স্বপ্ন দেখিবার অবসরও পাইল না।

তবে পরের দিন সকাল হইতেই তাহার বার বার মনে পড়িতে লাগিল যে, সেদিনটা তাহার ফুলশয্যা। ফুলশয্যার কথা মনে হইলেই কমলা ও ইন্দুর কথা মনে পড়ে, কারণ আর কোন বিবাহের অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না, আর কোন ছবিও মনে আসে না। সে স্বপ্ন দেখে সেই চন্দনচর্চিত, স্বেদসিক্ত লজ্জাতুর একখানি মুখ, অর্ধনিমিলিত দৃষ্টি এবং মুখের একটি অপূর্ব লজ্জাজড়িত প্রসন্নভাব। স্বপ্ন দেখে কথা কওয়াইবার জন্য সেই একান্ত সাধাসাধি, বধূর প্রেমকে জয় করিবার সেই বাঞ্ছিত তপস্যা!···দেখে, আর আগ্রহে অধীর হইয়া ওঠে সেই পরম মুহূর্তটির জন্য। সমস্ত যৌবন তাহার দেহের মধ্যে উন্মুখ, চঞ্চল হইয়া ওঠে এক পরম প্রতীক্ষায়! অকারণে সে ছুটাছুটি করে!

সামান্য আয়োজন, বেশী দেরি হইবার কথা নয়, তবুও রাত্রি একটা বাজিল। তাহার পর নানা অনুষ্ঠান শেষ করিয়া যখন জীবনের দুর্লভতম আনন্দের সম্মুখীন হইল সে, তখন আরও এক ঘণ্টা কাটিয়া গিয়াছে, রাত প্রায় দুইটা। কিন্তু ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয়ারা যখন তাহাদের বিছানার উপর বসাইয়া রাখিয়া একে একে বিদায় লইলেন, তখনও বেশ পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তাঁহারা একেবারে চলিয়া গেলেন না, কাছাকাছি কোথাও অপেক্ষা করিতেছেন। নিঃশব্দ চাপা কৌতুকে বাতাস ভারী হইয়া আছে, এখনই সামান্য কারণেই তাহাতে বর্ষণ শুরু হইবে।

কপাট তাঁহারা ভেজাইয়া দিয়াই গিয়াছেন, কী করিয়া উঠিয়া গিয়া এখন সেটা একেবারে বন্ধ করা যায়, সেই কথাটা অমল ভাবিতেছে, এমন সময় চকিত হইয়া উঠিয়া সে দেখিল যে নববধূ নিজেই উঠিয়াছে। পারুল চট্ করিয়া উঠিয়া গিয়া

নিজেই দরজায় খিল লাগাইয়া দিল, তাহার পর পিলসুজ সুদ্ধ প্রদীপটা কোণে একটা তোরঙ্গের আড়ালে সরাইয়া রাখিয়া আসিল, যাহাতে বিছানার দিকটায় ছায়া পড়ে।

অমলের মনে হইল অকস্মাৎ যেন একটা হিমশৈত্য তাহার মাথা হইতে মেরুদণ্ড বাহিয়া নীচে নামিতেছে। নিমেষের মধ্যে সে যেন পাথর হইয়া গেল।

পারুল বিছানায় ফিরিয়া আসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, ওরা কেউ যায়নি, সব এখানে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আমিও তেমনি, আড়াল থেকে দেখা ওদের ঘুচিয়ে দিয়েছি।

তাহার পরই আবার একবার উঠিয়া তক্তপোশের নীচেটায় উঁকি মারিয়া কহিল, দেখি নীচে আবার কেউ সেঁধিয়ে বসে আছে কিনা!···না, কেউ নেই।

তাহার পর নিজের গলা হইতে ফুলের মালা ও গা হইতে ফুলের গহনাগুলি খুলিয়া একপাশে সরাইয়া রাখিল; বিছানাতেও কে ফুলের পাপ্‌ড়ি ছড়াইয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিতে দিতে কহিল, বিছানাতে আবার ফুল দেওয়া! দুচোক্ষে দেখিতে পারি না।

তাহার পর অমলকে উদ্দেশ্য করিয়া ঈষৎ চাপা স্বরে কহিল, অমন কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্ট হ'য়ে ব'সে রইলে কেন? মালা ফালা খোল।···আহা! লজ্জা দেখে আর বাঁচি না!

অমল ক্লিষ্টকণ্ঠে কহিল, না, মাথাটা বড্ড ধরেছে, শরীরটাও ভাল নেই।

পারুল জবাব দিল, বেশ। আজকের দিনেই তোমার মাথা ধরল?···আমার বরাত!

ইহারই জন্য এত স্বপ্ন দেখা, এক কল্পনা!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া অমল চাদর ও মালাটা খুলিয়া ফেলিয়া শুইয়া পড়িল। তাহার তখন সত্যই শোওয়া প্রয়োজন, তবে সে অন্য কারণে। পারুলও বেশ সপ্রতিভভাবে উঠিয়া আসিয়া পাশে শুইয়া পড়িল।

বাহিরে তখনও যে তরুণীর দল প্রথম মিলন-রজনীর রসালাপের মধু আস্বাদ করিবার লোভে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহা ভিতর হইতেই স্পষ্ট বোঝা যায়।

তাহাদের সেই শাড়ীর খসখসানি ও চাপা হাসির অতি মৃদু শব্দের দিকে কান পাতিয়া সে শুইয়া রহিল।

একটু পরেই পারুল তাহার গায়ে হাত দিয়া কহিল, তারপর, আমাকে সেখানে নিয়ে যাবে কবে?

বোধ হয় তখন সে কমলার কথা ভাবিতেছিল। চমকিয়া উঠিয়া কহিল, কোথায়?

কলকাতায়?···জ্যেঠাইমা বলছিল যে, এখানে ওদের লোকের অভাব, তাই তাড়াতাড়ি তোকে বিয়ে করছে। এইখানেই থাকতে হবে তোকে। আমি বলেছি যে, হঁ্যা, ব'য়ে গেছে আমার, আমার ব'লে কতদিনের সাধ কলকাতায় বিয়ে হবে!

অমল খানিকটা বাদে জবাব দিল, কিন্তু কলকাতায় যে বাসায় আমি থাকি সেখানে ত মেয়েছেলে নিয়ে গিয়ে রাখা যায় না। তা ছাড়া আমার এখন এমন অবস্থাও নয় যে আমি বড় বাসা ভাড়া করি—

পারুল বেশ একটু ঝাঁঝের সহিত কহিল, বেশ ত!···তুমি দিব্যি কলকাতায় থেকে মজা মারবে আর আমি এখানে তোমার ঐ চরচরে বুড়ো বাপের সেবা ক'রে দিন কাটাব। ভারী চমৎকার ব্যবস্থা!···ওসব বেশী দিন চলবে টলবে না ব'লে দিলুম, আমি তাহ'লে অনথ বাধাব!

অমলের নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া একটু পরে নিজেই আবার কহিল, তুমি কি রাগ করলে? না, তা নয়, তবে নতুন বিয়ে হ'লে কে আর বরকে ছেড়ে থাকতে চায় বলো? আমার নতুন বৌদিকে অমনি প্রথমে নতুনদা নিয়ে যেতে চায়নি, আফিং খাবার ভয় দেখাতে তবে নিয়ে গেল।···বোধ হয় দু-তিন মাস নতুনদা একলা ছিল, তাইতেই বৌদি রোজ একখানা ক'রে চিঠি লিখত। তবু কি শনিবার রবিবার নতুনদা বাড়ি আসত!

পরক্ষণেই সহসা নিবিড়ভাবে অমলকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, তুমিও কি শনিবারে বাড়ি আসবে ত?···

অমল অতি মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, চেষ্টা করব।

ওমা, ও আবার কি কথার ছিরি। নিয়েও যাবে না, আবার শনিবারেও আসবে না; তবে আমি থাকব কি ক'রে? সে হবে না, তাহ'লে আমি সত্যিসত্যিই গলায় দড়ি দোব—

আরও খানিকটা পরে কহিল, নতুনদা' ফি শনিবারে যখন বাড়ি আসত, তখনই যা হোক একটা না একটা কিছু বৌদির জন্য নিয়ে আসত। তুমি কি আনবে আমার জন্যে?

অমল কোন উত্তর দিল না। কিন্তু তাহাতে পারুলের উৎসাহ কিছুমাত্র কমিল না, সে কহিল, আমার বাবু অত বাজে জিনিস চাই না, তোমায় এমনি কিছু আনতে হবে না, তুমি বরং যত তাড়াতাড়ি পারো আমায় একটা আর্মলেট গড়িয়ে দিও, বেশ মিনের কাজ করা! আমার ভারি সখ—

অমল সহসা নড়িয়া চড়িয়া উঠিল। কহিল, আমার সত্যিই বড় মাথার যন্ত্রণা হচ্ছে। আমাকে একটু ঘুমোতে দাও।

পারুল অপ্রতিভ হইয়া কহিল, ও, তাইত বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে,···মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেব?

অমল তাড়াতাড়ি কহিল, না, না, তুমিও ঘুমোও! একটু চুপ ক'রে থাকলেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব এখন।

পারুল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল এবং বোধ করি একটু পরেই ঘুমাইয়া পড়িল। কিন্তু অমলের চোখে ঘুম আসিল না। তাহার সত্যই রীতিমত মাথার যন্ত্রণা শুরু হইয়াছিল। মনে হইতেছিল যেন মাথাটা ফাটিয়া যাইবে।

অনেকক্ষণ ছটফট করিবার পর সে আস্তে আস্তে খিল খুলিয়া বাহিরে আসিল। আড়ি পাতিবার দল তখন হতাশ হইয়া সকলে ঘুমাইতে গেছে। বাহিরে সব নিস্তব্ধ। নিস্তব্ধ এবং অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে অমল বহুক্ষণ নিঃশব্দে

পায়চারী করিল। কিন্তু বাহিরের সে অন্ধকারের অপেক্ষাও তাহার মনের অন্ধকার যেন আরও নিবিড়। তাহার যেন কোথাও কোন দিশা নাই, কোন আলোর রেখামাত্র নাই।

অকস্মাৎ অমলের মনে হইল যে, তাহার জীবনের সবটা একাকার হইয়া গিয়াছে। কোন অতীত নাই ভবিষ্যৎ নাই—এমন কি বর্তমানও নাই। এই একটা অপরিসীম শূন্যতা-বোধ যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল, মনে হইল নিঃশ্বাস এখনি বন্ধ হইয়া যাইবে।

সে ছুটিয়া ঘরে গিয়া তাহার জামাটা খুঁজিয়া গায়ে দিল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল জ্যোৎস্নার চিঠিখানা এখনও সেখানে আছে, তাহার সহিত টাকাগুলাও। সে আর দ্বিধা না করিয়া পুনরায় বাহির হইয়া পড়িল।

হরনাথবাবু তখন ঘুম ভাঙ্গিয়া পাইখানায় যাইতেছিলেন, অন্ধকারে পদশব্দ শুনিয়া কহিলেন, কে রে ওখানে ?

অমল কাছে আসিয়া কহিল, বাবা আমি।…………আপনাকে সেদিন বলিনি, অফিস থেকে খুব জরুরী চিঠি এসেছিল, আজই জয়েন করতে হবে। শুনলে সবাই হৈ-চৈ করতো ব'লে বলিনি, আমি এখনই কলকাতায় যাচ্ছি।

বিস্মিতকণ্ঠে হরনাথবাবু কহিলেন, কিন্তু এই ভোরের ট্রেণেই যাবি ? খেয়ে গেলে হ'ত না ?

না বাবা, সে মিছিমিছি অনেক জবাবদিহি করতে হবে, সবাই হয়ত পীড়াপীড়ি করবে—

অকস্মাৎ হরনাথবাবু গাড়ুটা নামাইয়া রাখিয়া তাহার হাত দুইটা চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, আমার কাছে লুকোসনি বাবা, সত্যি ক'রে বল্—বৌমাকে কি তোর পছন্দ হয়নি ?

অমল হেঁট হইয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া কহিল, না, না, সে সব ঠিক হ'য়ে যাবে বাবা, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না, তবে আজকে আমার না গেলেই নয়।

সে আর দাঁড়াইল না। দ্রুত বাহির হইয়া পড়িয়া মাঠের র
ধরিল।

ভোরের আর বিশেষ দেরি ছিল না, কিন্তু তখনও অন্ধকার তরল হয় না
দূরস্থিত নক্ষত্রের ম্লান আলোকে কোনমতে অস্পষ্টভাবে পথটা দেখা যায় মা
সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যেই অমল ষ্টেশনের দিকে চলিতে লাগিল।

শেষ